মহাত্মা গান্ধী

"প্রেমে বিদ্বেষকে জয় কর।"—গান্ধী।

শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

২য় সংস্করণ

শ্রাবণ, ১৩২৬।

কলিকাতা,

১৫ নং সিমলা লেনস্থ "রুদ্রপ্রিন্টিং ওয়ার্কসে"

শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত।

[মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

হাওড়া—পানিত্রাস হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা,—

(১) শ্রীবিধুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়,
৩৩।১, চূণাপুকুর লেন ; কলিকাতা।

(২) ইণ্ডিয়ান্ লাইব্রেরী,
২৪-এ, কলেজ ষ্ট্রীট ; কলিকাতা।

(৩) মোশ্লেম পব্লিশিং হাউস,
৩, কলেজ স্কোয়ার ; কলিকাতা।

(৪) বরেন্দ্র লাইব্রেরী,
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ; কলিকাতা।

(৫) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



মহাত্মা গান্ধী

জন্ম — ১৮৬৯, ২রা অক্টোবর

উৎসর্গ।

যাঁহার

আদর্শ চরিত্র

এই পুস্তকের মেরুদণ্ড

সেই

কর্ম্মবীর সত্যসন্ধ

মহাত্মা গান্ধীর

পবিত্র নামে

শ্রদ্ধার অঞ্জলিরূপে

ইহা

অর্পণ করিলাম।

গুণমুগ্ধ—

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

(লোকমান্য শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক লিখিত।)

শ্রীযুক্ত গান্ধীর জীবনের কর্ম্ম-প্রবাহ এখনও চলিতেছে ; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে প্রতি বৎসর নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ করা, কোন লেখকের পক্ষেই অসম্ভব নহে। তাঁহার জীবন-কথা কেন এত শিক্ষাপ্রদ এবং কেন অনুকরণীয়, ইহার কারণ আবিষ্কার করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। তিনি যে ইংলণ্ড হইতে ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া আসিয়াছেন, অথবা তাঁহার পিতা যে কোন সামন্ত রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে বিশেষত্ব নহে ; কারণ তাঁহার ন্যায় অনেকে ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া আসিয়াছেন— আরও অনেকের পিতা তাঁহার পিতার ন্যায় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এদেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রতিভাবান মনীষী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-পত্র পাইয়াছেন। ইতিহাস, ভূগোল বা বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ, বিচার-বুদ্ধির স্ফুরণ সাপেক্ষ। গত দেড়শত বৎসর যাবৎ অসংখ্য ভারতবাসী বিদ্বান বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য চিন্তা, আদর্শ, সমাজগঠন ও সামাজিক রীতি-নীতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে, বুদ্ধিমানের মত যুক্তিযুক্ত পন্থাবলম্বন করিয়া প্রভূত বিচার-দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে এইরূপ লোকের যথার্থই অভাব, যিনি নিজের চরিত্র ও সাধনাবলে এদেশে

পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সক্ষম। একমাত্র ঐরূপ ক্ষমতা দ্বারাই আমাদের বহুমুখী চেষ্টার সিদ্ধি সম্ভব। শ্রীযুক্ত গান্ধীর জীবনের বিশেষত্ব এইখানে। তাঁহার সহিত সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি বা অন্যান্য বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভবপর না হইতে পারে—অনেকে তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর বিদ্বান হইতে পারেন; কিন্তু শ্রীযুক্ত গান্ধীর এই চরিত্র বা সাধনা সকলেরই অনুকরণীয়।

ভারতবাসী অশেষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত; কি ভারতে, কি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যত্র, সকল স্থানেই তাহাদের দুরবস্থার সীমা নাই। কিরূপে কোথা হইতে এই দুর্গতি আসিল? অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থার পার্থক্য কি? কেন এই পার্থক্য ঘটিল? এই সকল প্রশ্ন বহুবার আলোচিত হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি জাতিগত জীবনে, সকল ক্ষেত্রেই আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাদেরই নিজকৃত অথবা পূর্ব্বপুরুষগণের কৃত কর্ম্মের ফল। কিন্তু আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতিকূল বলিয়া কোন ব্যক্তিবিশেষকে দোষী করা যায় না। তবে যদি কোন ব্যক্তি, বিশেষতঃ কোন নেতা, এই দুর্দ্দশার হেতু ও তাহার প্রতিকারোপায় নির্দ্ধারণে ব্রতী না হন এবং সেই প্রতিকার ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিতে পরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে কর্ত্তব্যপরায়ণ বলা চলে না। আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার হেতু আমরা নহি বটে, কিন্তু আমাদের নিজের ও সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলার্থ এই অবস্থার উন্নতি চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের শাস্ত্রের ও ধর্ম্মের বিধানও তাই। যাহা দ্বারা জগত রক্ষিত ও চালিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তনে জগত যাহাতে উন্নত হইতে উন্নততর পথে পরিচালিত হইয়া শেষে পূর্ণতা লাভ করে, সেইরূপ কার্য্য নিজে করা এবং অপরকে করান—ইহাই ধর্ম্ম। শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, জন্মভূমি আমাদিগকে

ও আমাদের সন্তানসন্ততিগণকে আহার যোগাইবেন বা শুধু ভোগবিলাসে রাখিবেন, ইহাই চরম সার্থকতা নহে—ইহাপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ আছে। সেই আদর্শ এত মহৎ ও এত বৃহৎ যে, তাহার অনুসরণ করিতে করিতে মানুষ এই জগতের রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা ঈশ্বরকেও লাভ করিতে পারে।

দুঃখের বিষয়, আমাদের ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের আদেশ উল্লিখিতরূপ হইলেও, এদেশে জনসাধারণের দৃষ্টি এখনও ঐ বিষয়ে যথোপযুক্তরূপ আকৃষ্ট হয় নাই। দেশের লোকের দৃষ্টি যদি ঐদিকে থাকিত, তাহা হইলে আমাদের অবস্থা আজ এরূপ হইত না। জাতীয় উন্নতি প্রয়াসের কালাকাল নাই। যখন কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগে তখনই আত্মত্যাগ করিয়া, নিজের বা পরিজনবর্গের সমস্ত দুঃখ-বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া, সমস্ত আলস্য ও সুখ-সুবিধা বিসর্জ্জন দিয়া, মানুষ তাহার বিবেকবাণী অনুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে। তখন ভগবানে সে অটল বিশ্বাসী, তাহার মনে স্বার্থপরতার লেশমাত্র থাকে না—যে কোন স্বার্থত্যাগে সে উদ্বুদ্ধ হয়। শ্রীযুক্ত গান্ধীর জীবনী হইতে এই মহাশিক্ষা আমরা লাভ করিতে পারি।

সম্প্রতি লোকের মনে আর একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে, ভারতে সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন অগ্রে করিয়া, পরে রাজনৈতিক সংস্কারে মন দেওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত গান্ধীর জীবনই উক্ত মতের প্রতিবাদ করিতেছে। কোন বিষয়ে সংস্কার চেষ্টা করিতে গেলেই প্রথমতঃ ক্ষমতা থাকা দরকার এবং সে ক্ষমতা—সম্পূর্ণরূপেই যদি না হয় ত বেশীর ভাগ—দেশের চিন্তাশীল নেতৃগণের হাতে থাকা প্রয়োজন। অতএব এমন সংস্কারের জন্য সর্ব্বাগ্রে সচেষ্ট হইতে হইবে, যাহার ফলে অন্যান্য সংস্কার সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। ইহা শ্রীযুক্ত গান্ধীর মত; নতুবা তিনি কথনই রাজনৈতিক সংস্কার চেষ্টা করিতেন না। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণের

মঙ্গলোদ্দেশে যে সকল কাজ করিয়াছিলেন, তাহা শুধু সামাজিক নহে। তত্রত্য গভরমেণ্টের কার্য্য-প্রণালীর সহিত সে কাজগুলি প্রত্যক্ষভাবে সংসৃষ্ট। আমরা বলিতে পারি যে, সে সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় অত্যাচার-মূলক শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল বলিয়াই, সেখানকার ভারতীয় শ্রমিকগণ বিপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং শাসন-পদ্ধতির সংস্কার সাধন না করিলে প্রবাসী ভারতীয়গণের সামাজিক জীবনেও কোন উন্নতির আশা নাই, ইহা শ্রীযুক্ত গান্ধী ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন। আমরা যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের সরিক হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ প্রজাদের ন্যায়তঃ কোন পার্থক্য রাখা অসঙ্গত। কিন্তু স্বার্থান্ধ শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশিকগণ মনে করে যে, উপনিবেশগুলি কেবল তাহাদেরই লাভের জন্য সৃষ্ট। ফলে, বৃটীশ সাম্রাজ্যের অপরাংশ হইতে যে সকল লোক তথায় গমন করে, তাহাদিগকে নিজেদের সমান বলিয়া গ্রাহ্য করিতে তাহারা চাহে না। তাহাদের দেশে সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র ও খনিসমূহে কাজ করিবার উপযুক্ত শ্রমিকদলের একান্ত অভাব। সেই জন্য স্বার্থের তাড়নায় তাহারা ভারতবর্ষ হইতে শ্রমিকদল সংগ্রহ করে এবং তাহাদিগকে ভারবাহী পশুর মত খাটাইয়া প্রভূত লাভবান হয়। ভারতের শাসকসম্প্রদায়, উক্ত শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশিকগণের সহিত জাতিধর্ম্মে সম্পর্কযুক্ত; তন্নিমিত্ত উপনিবেশ-প্রবাসী ভারতীয় শ্রমিকগণের দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতি ভারত গভরমেণ্টের দৃষ্টি বহুদিন যাবৎ আকৃষ্ট হয় নাই। এমন কি ভারতীয় জননায়কগণের দৃষ্টিও বহুদিন যাবৎ ঐদিকে পড়ে নাই। বস্তুতঃ শ্রীযুক্ত গান্ধীই সর্ব্বপ্রথমে ভারতীয় শ্রমিকদলের দুর্দ্দশা মোচনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা সকলকে সংস্কারের নূতন পথ দেখাইয়াছিলেন।

শাসন-পদ্ধতির কোন অংশে যদি দোষ থাকে, তবে তাহার সংস্কার

চেষ্টাকে ন্যায়ের চক্ষে বিদ্রোহ বলা চলে না। যদি ইহাকে বিদ্রোহ আখ্যা দেওয়া হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে গভরমেণ্ট ন্যায় চান না, নীতি চান না, সকল প্রজাকে সমান অধিকার দিতে চান না—গভরমেণ্ট চান অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে। আমাদের বিশ্বাস, প্রজার কল্যাণ বিধান করা গভরমেণ্টের আদর্শ এবং তাহাতেই শাসন-শক্তি পরিপুষ্টি লাভ করে। এই সিদ্ধান্ত যদি আমরা স্বীকার করি, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মানিয়া লইতে হয় যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে গভরমেণ্টকেই তাহার আদর্শ রক্ষায় সহায়তা করা হয়। কিন্তু প্রজাসাধারণের মধ্যে কেহ কেহ বা কোন কোন সম্প্রদায় স্বার্থবশে অথবা অতীত জীবনের অভ্যাসলব্ধ একগুঁয়েমী বশে এতই আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে যে, তাহারা এই ন্যায়সঙ্গত নীতি উপলব্ধি করিতে পারে না। ফলে, তাহাদের হাতে অপরে নির্য্যাতিত হয়। গভরমেণ্ট স্বেচ্ছায় যদি কখনও অন্যায়কে দমন করেন, তাহা হইলে এই শ্রেণীর স্বার্থপর, একগুঁয়ে, আত্মাভিমানী লোকেরা গভরমেণ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। ফলে, শান্তিভঙ্গ ঘটে। সেই জন্য যে পর্য্যন্ত না অত্যাচারপীড়িত লোকেরা স্বয়ং তীব্র প্রতিবাদ করে, সে পর্য্যন্ত গভরমেণ্ট ঐরূপ বিষয়ে কখনও মনোনিবেশ করেন না। নির্ব্বিবাদে যাহা চলিয়া যাইতেছে তাহাতে হস্তক্ষেপ না করাই, মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাস্তবিকই কোন অপকার বা অন্যায় না ঘটে, ততক্ষণ প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা, কোন রাজনীতিকের কাজ নহে। অন্যায়-অত্যাচার ও দুঃখ-দারিদ্রের কথা এরূপ ভাবে জানাইতে হইবে, যাহাতে গভরমেণ্ট বিধি-ব্যবস্থা সংশোধন করিতে বাধ্য হন—ইহাই প্রত্যেক দেশ-ভক্তের কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত গান্ধী এই কর্ত্তব্য সম্যকরূপে সম্পাদন করিয়াছেন; সেই জন্যই তিনি দেশবাসীর যথার্থ সম্মান ও প্রশংসার পাত্র।

দেশের মধ্যে শান্তি রক্ষার জন্য আইনের সৃষ্টি। কিন্তু সাধু উদ্দেশ্যে—

সম্পূর্ণ সদভিপ্রায়ে প্রণোদিত হইয়াও—কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়ান বা তাঁহাদের আদেশ অমান্য করা, ঐ আইনের চক্ষেই হয়ত বে-আইনী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। সেই সময়ে সংস্কারপ্রার্থী দেশভক্তের অন্তরে একটা বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। একদিকে সংস্কার সাধনের জন্য প্রবল বাসনা, অন্যদিকে আইন লঙ্ঘনের অনৌচিত্য বোধ—এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে পড়িয়া সে কূল কিনারা দেখিতে পায় না। শ্রীযুক্ত গান্ধীও এইরূপ দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়াছিলেন। তৎকালে এই কঠিন সমস্যার ভিতর হইতে মুক্ত হইবার যে পন্থা তিনি নির্দ্ধারণ করেন, তাহার নাম—'নিরুপদ্রব প্রতিরোধ' বা 'সত্যাগ্রহ'। তিনি অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া এই 'সত্যাগ্রহ' ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। উহা এখন যেন শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। যদিও সকল সময়ে এই প্রতিকার পন্থা অবলম্বিত হইতে পারে, তথাপি ঠিক কোন ক্ষেত্রে উহা অবলম্বনীয় এবং কোন ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত গান্ধীর ন্যায় কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভবপর, তাহা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, এই প্রতিকার পন্থা অতীব উচ্চ।

রাজার আইন যাহাতে সকলে মানিয়া চলে, সেই জন্য আইন ভঙ্গকারিগণের প্রতি দণ্ড দানের ব্যবস্থা আছে। স্বভাবতঃ আইন মানুষকে ন্যায়পথে চলিতে উৎসাহিত করে এবং ন্যায়ের পথেই সুখ, শান্তি ও সন্তোষ বিরাজিত। যদি কখনও স্বার্থের মোহে কাহারও মনে ন্যায়ের পথ পরিত্যাগের আকাঙ্ক্ষা জাগে, তাহা হইলে আইনে উল্লিখিত দণ্ডের কথা স্মরণ করিয়া তাহাকে সে আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু যেখানে অবস্থাটা ঠিক ইহার বিপরীত, অর্থাৎ যেখানে এমন কোন আইন প্রচলিত থাকে, যাহা ন্যায় ও ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, পরন্তু লোকে কেবল দণ্ডিত হইবার ভয়ে তাহা মানিয়া চলে, সেখানে প্রকৃত জ্ঞানীর হৃদয়ে এই সমস্যা উদিত হয় যে, আইনভঙ্গের অপরাধে দণ্ড গ্রহণ করিয়া ন্যায় ও

ধর্ম্মের নীতি পরীক্ষা করিব, না মানুষের কৃত আইনের ভয়ে ভগবানের ন্যায়-বিধান বর্জ্জন করিব? যাহারা সত্য ও ন্যায়ের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়ায়, তাহারা মানুষের কৃত আইনের অনুশাসন লঙ্ঘন করিতে ভীত হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐরূপ ধর্ম্মে ব্রতী হইবে, তাহাকে কেবল সত্য ও ন্যায়ের উপরই অটল অচল বিশ্বাস রাখিয়া দাঁড়াইতে হইবে—নিজের শক্তি-সামর্থ্য বা দুর্ব্বলতার কথা ভাবিলে চলিবে না। তখন তাহার নিজের ও স্ত্রী-পুত্রাদির সুখ-দুঃখের ভাবনাও তাহাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। মানসিক দৃঢ়তা, সত্যে প্রগাঢ় নিষ্ঠা, নিষ্পাপ চরিত্র এবং অন্তরের মহত্ব না থাকিলে এই সকল কার্য্য সম্ভব হয় না। কেবল বিদ্যা দ্বারা ইহা লাভ করা যায় না—কেবল উচ্চবংশে জন্মিলেও ইহা সুলভ হয় না—কেবল বুদ্ধি দ্বারাও ইহা পাওয়া যায় না। ইহা প্রকৃতপক্ষে আত্মার শক্তি (Soul Force)। উপনিষদের সেই মন্ত্র আমাদের সযত্নে স্মরণ রাখা উচিত যে, বিদ্যা দ্বারা—মেধা দ্বারা—বা শিক্ষা দ্বারা আত্মাকে লাভ করা যায় না। একথা সত্য বটে যে, আত্মার শক্তি মানবের স্বাভাবিক সম্পদ—বিদ্যা বা বুদ্ধি দ্বারা ইহা আয়ত্ত করা যায় না—তথাপি ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে যে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি অনাসক্তি ও অধ্যবসায় দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ উহা লাভ করিতে পারে। এই জন্যই মহৎ ব্যক্তির জীবনেতিহাস পাঠে আমরা আপনাদের চরিত্র গঠন করিয়া তুলিতে পারি।*

---

* শ্রীমতী অবন্তিকাবাঈ গোখলে মারাঠী ভাষায় মহাত্মা গান্ধীর একখানি জীবন-চরিত লিখিয়াছেন। তাহার ভূমিকায় লোকমান্য তিলক, মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রের যে সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়াছেন, ইহা তাহারই মর্ম্মানুবাদ।

"শ্রীযুক্ত গান্ধীকে যাহারা কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহারা আপনাদিগকে খ্রীষ্টান বলিয়া পরিচয় দিলেও তাহাদের তুলনায়, আমার চক্ষে, শ্রীযুক্ত গান্ধীই ক্রুশ-বিদ্ধ পরিত্রাতার যোগ্যতর প্রতিনিধি; কারণ তিনি ন্যায় ও কৃপা লাভের নিমিত্ত ধৈর্য্য-বলে উৎপীড়ন সহ্য করিতেছেন।"

—মাদ্রাজের লর্ড বিশপ।

সূচীপত্র।

পত্র, প্রবন্ধ, বক্তৃতা—

সূচীপত্র।

চিত্র-সূচী।

মহাত্মা গান্ধী।

"প্রতিজ্ঞা কর, মদ্য মাংস ও রমণী স্পর্শ করিবে না।"

"মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম।"

সম্মুখে জৈন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর সাক্ষাতে যুবক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী জননীর নিকট তিনবার সত্যবদ্ধ হইলেন যে, তিনি বিদ্যাশিক্ষার্থ বিলাতে গিয়া মদ্য, মাংস ও রমণী স্পর্শ করিবেন না। তখন তাঁহার বয়স মাত্র সতর বৎসর। তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যারিষ্টারি পড়িবার জন্য বিলাত যাত্রায় উৎসুক। এ প্রস্তাবে অপর সকলের সম্মতি ছিল ; কিন্তু স্নেহময়ী জননী পুত্রকে 'কালাপানি' পারে পাঠাইবার কথা উঠিলে উৎকণ্ঠায় আকুল হইতেন। তাঁহার আশঙ্কা, পাছে পুত্র বিদেশে গিয়া বিলাসী হয়, পাছে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে, পাছে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দেয় ; কারণ, সেখানে তাহাকে দেখিবার—উপদেশ দিবার ত কেহ নাই। তা'ছাড়া, ভগবান না করুন, সে যদি পীড়িত হয়, তাহা হইলে কে

ত্রি-সত্য।

তাহার তত্ত্বাবধান করিবে ? কে তাহাকে স্নেহের অঞ্চলে ঢাকিয়া রাখিবে ? এই সকল দুশ্চিন্তা জননীকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিত। শেষে পু[illegible] নির্বন্ধ [illegible] মাতার মত পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি পুত্রকে বিলাত পাঠাইতে সম্মতা হইলেন ; তবে, তৎপূর্ব্বে পুত্রকে তিনটী প্রলোভন বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ হইতে হইল। সে তিনটী প্রলোভন কি, পাঠক পূর্ব্বেই জানিয়াছেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২রা অক্টোবর শনিবার শ্রীযুক্ত গান্ধী গুজরাটের অন্তর্গত কাথিয়াবাড়ের মধ্যবর্ত্তী পোরবন্দর সহরে এক সম্ভ্রান্ত বণিক বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পোরবন্দর ভারতের পশ্চিম প্রান্তে দ্বারকার ষাট মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে আরব্যোপসাগর তীরে একটী সমৃদ্ধ বন্দর। উহা বৃটিশ রাজ্যের অধীনস্থ পোরবন্দর করদ রাজ্যের রাজধানী। পোরবন্দরের রাণা ঐ রাজ্যের অধীশ্বর। শ্রীযুক্ত গান্ধীর পিতামহ রাণার দেওয়ান ছিলেন। তৎকালে অপ্রাপ্তবয়স্ক রাণার পক্ষে তাঁহার জননী রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। একবার রাণা-জননীর সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় শ্রীযুক্ত গান্ধীর পিতামহ পোরবন্দর পরিত্যাগ করিয়া জুনাগড় রাজ্যের নবাব সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নবাব সাহেব তাঁহাকে সমাদরে সভায় স্থান দেন। নবাবের পারিষদগণ আগন্তুককে বাম হস্তে অভিবাদন করিতে দেখিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিলে, তিনি বলেন,—'পোরবন্দরে অনেক দুঃখ পাইয়াছি বটে ; কিন্তু এখনও আমার দক্ষিণ

বংশ-পরিচয়।

হস্ত ঐ রাজ্যের জন্য রাখিয়াছি।' আশ্রয়প্রার্থীর পক্ষে এ তেজস্বিতা—এ অনন্যসাধারণ স্বদেশ-প্রেম নিশ্চয়ই প্রশংসার্হ।

শ্রীযুক্ত গান্ধীর পিতাও কম তেজস্বী ছিলেন না। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পোরবন্দরের দেওয়ানী পদে পঁচিশ বৎসর কাল কার্য্য করেন; শেষে কিন্তু রাণার সহিত তাঁহার মনের মিল হয় নাই। কাজেই তিনি ঐ কার্য্য ত্যাগ করিয়া অদূরবর্ত্তী রাজকোট রাজ্যের দেওয়ানী গ্রহণ করেন। রাজকোটের ঠাকুর সাহেব তাঁহার কর্ম্মদক্ষতায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া আপন রাজ্যের মধ্যে এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড তাঁহাকে জায়গীর স্বরূপ প্রদান করিতে ইচ্ছুক হন। শ্রীযুক্ত গান্ধীর পিতা প্রথমে উহা প্রত্যাখ্যান করেন; পরে অনেক উপরোধ-অনুরোধে পড়িয়া উহার সামান্য অংশ মাত্র গ্রহণ করেন। গার একটী ঘটনায় তাঁহার তেজস্বিতা বেশ পরিস্ফুট হইয়াছিল। একদিন রাজকোটের এসিষ্টাণ্ট পলিটিকাল এজেণ্ট সাহেবকে ঠাকুর সাহেবের সম্বন্ধে কটূক্তি করিতে শুনিয়া তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন। এজেণ্ট সাহেব রোষকষায়িত লোচনে বলেন,—'তোমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে।' শ্রীযুক্ত গান্ধীর পিতা সে উপাদানে গঠিত নহেন। তিনি সাহেবের রক্ত-আঁখি দেখিয়া ভয় পাইলেন না—কিছুতেই ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন না। এজেণ্ট সাহেব তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিয়া কয়েক ঘণ্টা কাল কোন বৃক্ষতলে আটক রাখিলেন। ইহাতেও শ্রীযুক্ত গান্ধীর পিতা বিচলিত হইলেন না; কিন্তু নাগরিকগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তখন ব্যাপারটী আর অধিক দূর

গড়াইতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে বুঝিয়া, এজেণ্ট সাহেব নিরস্ত হইলেন—ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ চাপা পড়িল।

এই ঘটনায় শ্রীযুক্ত গান্ধীর অনুস্থত 'নিরুপদ্রব প্রতিরোধ' (Passive Resistance) নীতির বীজ আমরা তাঁহার পিতার অন্তরে নিহিত দেখিতে পাই। তাঁহার পিতা ঈশ্বর-বিশ্বাসী, নির্ভীক, সাত্ত্বিক পুরুষ ছিলেন। তিনি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। 'ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ' হইয়া কিরূপে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন। শ্রীযুক্ত গান্ধীর জননীও ভগবদ্‌পরায়ণতায় আদর্শ-স্থানীয়া। পূজা, দান, অর্চ্চনা ও অতিথি-সৎকার, তাঁহার নিত্য কর্ম্ম ছিল। তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত সময়ে সময়ে সাত দিন পর্য্যন্ত অনাহারে কাটাইতেন। যম-নিয়ম-উপবাসে তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইলেও, মনের তেজ বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। রোগীর পরিচর্য্যায় তাঁহার অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও অনন্যসাধারণ সহিষ্ণুতা, অনেকের বিস্ময় উৎপাদন করিত। রাজপথে কোন অন্ধ আতুর অনশন-পীড়িতকে দেখিলে তাঁহার প্রাণ করুণায় গলিয়া যাইত। মাতার সুকোমল মনোবৃত্তি ও পিতার জ্ঞান শ্রীযুক্ত গান্ধীর হৃদয় অধিকার করিয়াছে।

শৈশবে শ্রীযুক্ত গান্ধী পোরবন্দর বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। কিছুদিন পরে তাঁহার পিতা পরিজনবর্গসহ রাজকোটে গমন করিলে, তিনি প্রথমে তত্রত্য গুজরাটী স্কুলে ও পরে কাথিয়াবাড় হাই-স্কুলে প্রবেশ করেন। শেষোক্ত বিদ্যালয় হইতে

শ্রীযুক্ত গান্ধী সতর বৎসর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর তাঁহার বিলাত যাত্রার কথা উঠে। ইতিপূর্ব্বে দ্বাদশ বর্ষ বয়সে শ্রীযুক্ত গান্ধী এক সুলক্ষণা বালিকার পাণিগ্রহণ করেন। সেই বালিকাই উত্তরকালে তাঁহার উৎসাহদাত্রী জীবনসঙ্গিনী হইয়াছেন।

শিক্ষা।

ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আলোকে অনেক বালক পথভ্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহারা প্রায়ই পুরুষ-পরম্পরাগত আচার-ব্যবহারে, প্রাচীন বেশভূষায় ও সনাতন ধর্ম্ম-বিশ্বাসে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উন্মার্গগামী হয়, এরূপ দৃষ্টান্ত এদেশে বিরল নহে। শ্রীযুক্ত গান্ধীর বাল্য-জীবনেও এইরূপ ভাব-পরিবর্ত্তন একবার ঘটিয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী —'অহিংসা' তাঁহাদের জীবনের ব্রত। বালক গান্ধী ও তাঁহার সহপাঠিগণ একদিন সিদ্ধান্ত করিলেন যে, নিরামিষ ভোজন একটা 'কুসংস্কার' মাত্র; 'সভ্য' হইতে হইলে মাংস ভোজন করিতেই হইবে; বিশেষতঃ মাংস না খাইলে সাহেবদের মত বলশালী হওয়ার আশা বৃথা। বিদ্যালয়ের ছুটীর পর বালকেরা চুপে চুপে মাংস কিনিয়া আনিয়া নদীতীরে তাহা রন্ধন ও ভোজন করিত। বালক গান্ধীও ঐ দলে জুটিলেন। প্রায় প্রত্যহই মাংস ভোজন চলিতে লাগিল। কিন্তু সন্ধ্যার সময় মাংস ভোজন করিলে, রাত্রে আর ক্ষুধার উদ্রেক হয় না; কাজেই বাড়ীতে আহারের সময় একটা না একটা মিথ্যা ওজর তুলিতে হইত। এইরূপ মিথ্যা বলিতে বালক গান্ধী একান্ত অনভ্যস্ত। দুই চারি দিন মিথ্যা-

সত্যনিষ্ঠা।

কথা কহিয়া তাঁহার প্রাণে অসহ্য অনুশোচনা হইতে লাগিল; তিনি বিবেকের তাড়নায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। ফলে, মাংস ভোজনের প্রলোভন তিনি তদবধি চিরজীবনের জন্য বিসর্জ্জন দিলেন। সত্যের প্রতি এই একনিষ্ঠ অনুরাগ শ্রীযুক্ত গান্ধীর জীবনে পদে পদে পরিস্ফুট।

সৌন্দর্য্য-সম্পদে অমরাবতী তুল্য মনোরম, আধুনিক সভ্যতার লীলাভূমি বিলাতের চাক্‌চিক্যময় ব্যসন-বিলাসের মধ্যে অকস্মাৎ উপনীত হইয়া কোন্ ভারতীয় যুবকের নয়ন না ধাঁধিয়া যায়? বদ্ধজলের ক্ষুদ্র মৎস্য সহসা অপার সাগরে গিয়া পড়িলে যেরূপ দিশাহারা হইয়া পড়ে, তরলমতি ভারতীয় যুবকেরাও সেইরূপ বিলাতের স্বাধীন আব্‌হাওয়ার সংস্পর্শে হঠাৎ আসিয়া প্রায় মাথা ঠিক রাখিতে পারে না। মানুষ বাহির হইতে যাহা সুন্দর দেখে, তাহারই অনুকরণ করিবার জন্য বহ্নিবিবিক্ষু পতঙ্গের ন্যায় প্রাণপণে ছুটিয়া যায়—ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি তখন তাহার থাকে না।

বিলাত-বাস।

তরুণ যুবক গান্ধী বিলাতে পৌঁছিয়া ষোল আনা সাহেবিয়ানার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। সাহেবী বেশভূষা, সাহেবী নাচগান, সাহেবী হাবভাব, সাহেবী আদব-কায়দা তাঁহার চক্ষে অতি মনোরম হইয়া উঠিল। তিনি পূরাদস্তুর 'ইংলিস জেণ্ট্‌লম্যান্' সাজিবার আশায় সাহেবিয়ানায় সুপক্ক জনৈক বন্ধুর নিকট শিক্ষানবিশী জুড়িয়া দিলেন। বন্ধুটী ভারতবাসী; তিনি বহুপূর্ব্বে বিলাতে গিয়া এমনই নিখুঁত সাহেবিয়ানা আয়ত্ত

প্রলোভনের পথে।

করিয়াছিলেন যে, তাঁহার চাল-চলনে অণুমাত্রও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যাইত না। উৎসাহী গান্ধী সেই বন্ধুর নিকট ইংরাজী নাচ-গান ও ফরাসি ভাষা শিখিতে লাগিলেন। এত বিলাসিতার মধ্যেও কিন্তু তাঁহার প্রাণ মাঝে মাঝে হা-হা করিয়া উঠিত ; বিবেক যেন কাণে কাণে বলিয়া দিত—'মাতার নিকট কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, স্মরণ কর।' এক একদিন নাচ-গানে মন কিছুতেই বসিত না —নাচের সময় পা বেতালে পড়িত, গানের সুর সহসা কাটিয়া যাইত ; মনে হইত, হায় হায়, আমি কোন্ পথে ছুটিয়াছি ! তখনও কিন্তু মনের নিকট এইরূপ একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া চলিত,—'মা মদ, মাংস ও রমণী স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, নাচ-গান ত বারণ করেন নাই—নাচ-গান হিন্দু শাস্ত্রেও নিষিদ্ধ নহে, ইহা ত নির্ম্মল আমোদ উপভোগ মাত্র ; সুতরাং নাচ-গানে দোষ কি ?' বেশী দিন কিন্তু এভাবে চলিল না। একদিন এক প্রমোদোৎসবে শ্রীযুক্ত গান্ধী নিমন্ত্রিত হইলেন। সেখানে নাচ-গান ও ভুরিভোজের সমারোহ ত আছেই, তা'ছাড়া কত কুন্দেন্দুসুন্দর যুবক-যুবতীর সহিত আলাপ পরিচয়ের সম্ভাবনা। হয়ত কোন অনুরাগ-বিহ্বলা বিলাস-লাস্যকুশলা সম্ভ্রান্ত শ্বেতাঙ্গ-বালার সহিত নাচিবার সুবিধাও ঘটিতে পারে। অজানা নূতন দেশে এমন মনোমদ প্রলোভন কয়জন নবীন আগন্তুক ত্যাগ করিতে সক্ষম ? যুবক গান্ধী নিমন্ত্রণস্থলে যথা সময়ে উপনীত হইলেন। নৃত্যগীত চলিতে লাগিল, শেষে ভোজের আয়োজন হইল। শ্রীযুক্ত গান্ধী আহারে বসিলেন ; কিন্তু

ঐকি! সম্মুখেই যে মাংসের ঝোল! পদতলে দংশনোন্মুখ কালফণী সন্দর্শন করিলে পথিক যেমন চমকিত হয়, শ্রীযুক্ত গান্ধীও সেইরূপ ত্রাস্ত হইলেন—তাঁহার কেশাগ্র হইতে পদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত যেন তড়িৎ-শিখা খেলিয়া গেল। স্নেহময়ী জননীর আদেশ তাঁহার স্মরণপথে জাগিল, গভীর অনুশোচনায় হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই যুবক গান্ধী টেবিল ছাড়িয়া উঠিলেন! চারিদিক হইতে বন্ধুবান্ধবেরা ও নিমন্ত্রিতগণ তাঁহার এই অসামাজিক আচরণে তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধী তাঁহাদের মন্তব্যে কর্ণপাত না করিয়া স্থান ত্যাগ করিলেন। তদবধি তাঁহার 'ইংলিশ জেণ্ট্‌লম্যান' সাজিবার বাসনা চিরদিনের তরে অন্তর্হিত হইল।

আঘাতের পর প্রতিঘাত আসাই স্বাভাবিক। উল্লিখিত ঘটনায় শ্রীযুক্ত গান্ধীর হৃদয়ে যে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল,

প্রতিক্রিয়া।

তাহার প্রতিক্রিয়া এবার আরম্ভ হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, মানুষ কি শুধু দশেন্দ্রিয়ের পিপাসা পরিতৃপ্তির জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, না মানব-জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে? মানুষ কি?—তাহার আদি কোথায়, অন্তই বা কোথায়? পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর সহিত তাহার সম্পর্ক কত দিনের? মানুষ মরিলে কোথায় যায়? দেহের সহিত দেহীর অবসান হয় কি না? এই সকল গভীর সমস্যা তাহাকে দিন দিন ব্যাকুল করিয়া তুলিল। প্রাণের ভিতর কি একটা অনির্ব্বচ-

চনীয় অপূর্ণতা তিনি অবিরাম অনুভব করিতে লাগিলেন। কোন কোন বিলাতী বন্ধু তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিতে পরামর্শ দিলেন; কিন্তু তাহাতে প্রাণের পিপাসা মিটিবে কি? অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া তিনি নির্বিষ্টচিত্তে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' এই আশ্বাস-বাণী তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিল। শ্রীগীতা তাঁহার উত্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি-সুধা ঢালিয়া দিল, সকল সন্দেহ মিটিল, তিনি গীতার ভিতর সত্য-সুন্দরের সন্ধান পাইলেন। বিলাতে পঠদ্দশায় শ্রীযুক্ত গান্ধীর জীবনে আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। তিনি লণ্ডনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তত্রত্য ইনার্ টেম্পল বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন এবং তথা হইতে ব্যারিষ্টারি সনন্দ লাভ করেন।

দেশাগমন।

ব্যারিষ্টার হইয়া শ্রীযুক্ত গান্ধী দেশে ফিরিলেন। বোম্বাই বন্দরে জাহাজ হইতে নামিয়া তিনি যে হৃদয়-বিদারক সংবাদ শুনিলেন, তাহার কল্পনাও ইতিপূর্ব্বে কখনও তাঁহার মনে জাগে নাই। তিনি শুনিলেন, প্রত্যক্ষ ভগবতী-তুল্য স্নেহশীলা আনন্দরূপিণী জননী আর ইহ জগতে নাই! এ সর্ব্বনাশের সংবাদ তাঁহার নিকট গোপন রাখা হইয়াছিল। মাতার কনিষ্ঠ পুত্র, স্নেহের দুলাল শ্রীযুক্ত গান্ধীর সরল হৃদয়ে এ সংবাদ শেলের মত বিঁধিল। তিনি শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। কেবল মনে হইতে লাগিল, সেই স্নেহময়ী পুণ্যবতী জননীই যে তাঁহাকে অধঃপতনের পথ হইতে রক্ষা করিয়াছেন! আজ তিনি

কোথায় ? তাঁহার পুত্র যে প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, যশের মুকুট শিরে ধরিয়া, অকলঙ্ক চরিত্রে গৃহে ফিরিয়াছে, কে তাহাকে বরণ করিয়া লইবে ?

যথারীতি অশৌচান্তে শ্রীযুক্ত গান্ধী বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তিনি কখনও বোম্বায়ে কখনও বা রাজকোটে অবস্থান করিতেন। দেড় বৎসর কাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে শ্রীযুক্ত গান্ধীর অদৃষ্ট ভিন্ন পথে পরিচালিত হইল।

পোরবন্দরের জনৈক প্রসিদ্ধ সওদাগরের একটী বাণিজ্য-শাখা, দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রিটোরিয়া সহরে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

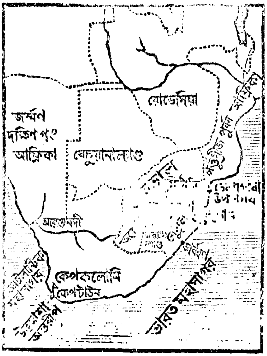
আফ্রিকা-যাত্রা।

প্রিটোরিয়া ট্রান্সভাল রাজ্যের রাজধানী। তথায় ব্যবসায় সংক্রান্ত কোন জটিল মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনের নিমিত্ত উল্লিখিত সওদাগর শ্রীযুক্ত গান্ধীকে নিয়োগ করিতে চান। ঐ মামলায় তাঁহার ন্যায় আরও অনেক ভারতীয় সওদাগরের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত ছিল। বৎসরাধিক কাল মামলা চলিবে, এইরূপ অনুমান। শ্রীযুক্ত গান্ধী সেই সওদাগরের পক্ষ সমর্থনের নিমিত্ত ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত ভারতের ঐতিহাসিক সম্পর্ক অল্প দিনের নহে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভাস্কো ডা-গামা প্রমুখ পর্ত্তুগীজ নাবিকগণ স্বর্ণভূমি ভারতবর্ষের সন্ধানে বাহির হইয়া পথে দক্ষিণ আফ্রিকা আবিষ্কার করেন। তদবধি ইউরোপীয়

নাবিকেরা এদেশে যাতায়াত কালে দক্ষিণ আফ্রিকায় উত্তমাশা অন্তরীপের নিকট একবার বিশ্রাম লইতেন। এই উপলক্ষে কেপটাউন বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীযুক্ত গান্ধী যে সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা গমন করেন, তৎকালে ঐ অঞ্চলে এই কয়টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল ঃ—



. দক্ষিণ আফ্রিকার মানচিত্র।

(১) কেপ কলোনি,

(২) নেটাল,

(৩) জুলুল্যাণ্ড,

(৪) অরেঞ্জ-ফ্রি-ষ্টেট,

(৫) ট্রান্সভাল,

(৬) বাসুতোল্যাণ্ড,

(৭) বেচুয়ানাল্যাণ্ড,

(৮) রোডেসিয়া।

দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিকথা।

ইহাদের মধ্যে কেপ কলোনি ও নেটাল, এই দুইটী বৃটিশ উপনিবেশ; এখানকার অধিবাসিগণ স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার ভোগ করিতেন। জুলুল্যাণ্ড ইংলণ্ডের ক্রাউন কলোনি। আফ্রিকার আদিম অধিবাসী 'জুলু' অর্থাৎ কাফ্রিগণ এই রাজ্যের অধিবাসী।* অরেঞ্জ-ফ্রি-ষ্টেট ও ট্রান্সভাল, এই দুই রাজ্যে বুয়রগণের বাস।

* ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে জুলুল্যাণ্ড নেটালের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বুয়রেরা ওলন্দাজ বংশসম্ভূত। তাঁহাদের সরহদ্দে প্রজাতন্ত্রমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; তবে ট্রান্সভাল বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিত; অরেঞ্জ-ফ্রি-ষ্টেট সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। বাসুতো-ল্যাণ্ড ও বেচুয়ানাল্যাণ্ড, এই দুইটি কাফ্রিরাজ্য ইংরাজের প্রভুত্বা-ধীনে পরিচালিত হইত। রোডেসিয়ার শাসন ভার ইংরাজের সনন্দ-প্রাপ্ত এক বৃটিশ কোম্পানীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই সকল রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্তে, পর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব-আফ্রিকা ও পশ্চিম প্রান্তে, জর্ম্মণ দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সুবিস্তৃত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নেটালের অবস্থা এমনই শোচ-নীয় ছিল যে, সেখানে বৃটিশ উপনিবেশ সফল হইবে কিনা, সন্দেহ হইত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নেটাল গভরমেণ্ট স্বদেশে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধনার্থ সুলভে শ্রমিক সংগ্রহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। ফলে, ভারতের প্রতি তাঁহাদের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। তাঁহারা বিলাতী গভরমেণ্টের মারফতে ভারতের দরবারে প্রস্তাব করেন যে, এদেশ হইতে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদল (Indentured labourers) দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরিত হউক। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ তৎকালে ভারত গভরমেণ্টকে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, নেটালে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকগণের প্রতি যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করা হইবে এবং চুক্তির কাল অতীত হইলে, তাহারা যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে সে সুবিধাও পাইবে। তদবধি চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকগণ কলিকাতা ও মাদ্রাজ বন্দর হইতে দলে দলে দক্ষিণ আফ্রিকা অভিমুখে ধাবিত

হয়। তাহাদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই নেটালের জঙ্গলাকীর্ণ উষর ক্ষেত্রে সুবর্ণ ফলিতে থাকে। চারিদিকে চা-বাগান ও ইক্ষুক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ধন-জন-সম্পদে নেটাল হাস্যময় হইয়া উঠে। নেটালের ন্যায় ট্রান্সভাল ও কেপ-রাজ্যেও ভারতীয় শ্রমিকগণের ডাক পড়িয়াছিল। তবে, নেটালের তুলনায় ঐ দুই রাজ্যে তাহাদের সংখ্যা অনেক কম। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কেপ-রাজ্যে প্রায় দশহাজার ও ট্রান্সভালে প্রায় পাঁচ হাজার ভারতীয় অবস্থান করিত। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় শ্রমিকগণের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনজীবী ভারতীয় ব্যবসাদারেরা ক্রমশঃ তথায় বিপণি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতীয় ক্রেতৃগণের প্রয়োজন অনুযায়ী জিনিসপত্র সরবরাহ করিতেন। ক্রমশঃ কাফ্রিগণ ভারতীয় ব্যবসাদারদের পক্ষপাতী হইয়া উঠে। এই ব্যবসাদারগণের অধিকাংশই বোম্বায়ের মুসলমান। চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকগণের মধ্যে অনেকে চুক্তির কাল (পাঁচ বৎসর) অতীত হইলে, বহুবিধ বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও নূতন চুক্তিতে আবদ্ধ না হইয়া, তথায় নানা উপায়ে জীবিকার্জ্জন করিত। জিনিসপত্র ফেরি করা, অল্প মূলধনে ছোট ছোট দোকান চালান, ভদ্রলোকের বাড়ী চাকর থাকা, মালীগিরি করা প্রভৃতি বিবিধ কর্ম্মে তাহারা নিযুক্ত হইত। ফলে, দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন ভারতীয়গণকে এই ত্রিবিধ পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—(১) চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক, (২) চুক্তিমুক্ত শ্রমিক, (৩) স্বাধীনজীবী ব্যবসাদার, ডাক্তার, স্কুল মাষ্টার, পুরোহিত, ইণ্টারপ্রেটার, কেরাণী প্রভৃতি।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নেটালের অধিবাসী সংখ্যা কিরূপ দ্রুতহারে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, পাঠক নিম্নলিখিত তালিকায় দেখুন,—

বর্ষ	শ্বেতাঙ্গ	ভারতীয়	কাফ্রি	মোট।
১৮৭৪—	১৮,৬৪৬	৬,৭৮৭	২,৮১,৭৯৭	৩,০৭,২৩০
১৮৭৯—	২৪,৬৫৪	১৬,৯৯৯	৩,১৯,৯৩৪	৩,৬১,৫৮৭
১৮৮৪—	৩৫,৪৫৩	২৭,২৭৬	৩,৬১,৭৬৬	৪,২৪,৪৯৫
১৮৮৯—	৩৭,৩৯০	৩৩,৪৮০	৪,৫৯,২৮৮	৫,৩০,১৫৮
১৮৯৪—	৪৫,৭০৭	৩৫,৪১১	৫,০৩,২০৮	৫,৮৪.৩২৬
১৮৯৮—	৫২,৩৮৩	৬১,১০৩	৫,৮৭,২৪৪	৭০০,৭৩০

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে বিশ বৎসরের মধ্যে নেটালে শ্বেতাঙ্গগণ সংখ্যায় আড়াইগুণ, ভারতীয়গণ সাড়ে পাঁচগুণ এবং কাফ্রিগণ প্রায় দুইগুণ বাড়িয়াছিল। সুতরাং ঐ হারে ভারতীয় আগন্তুকগণের দলপুষ্টি হইলে হয়ত নেটাল গভরমেণ্টের উপর ভারতীয়গণের প্রভাব একদিন প্রতিষ্ঠিত হইবে, হয়ত শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের অপ্রতিহত প্রতিপত্তি কিছু খর্ব্ব হইবে, হয়ত তাঁহাদের মুখের অন্ন ভারতের 'কালা আদমি'রা কাড়িয়া খাইবে, এই আশঙ্কা উপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গগণের হৃদয়ে জাগিয়াছিল।

ভারতীয়গণের দুর্দ্দশা।

উপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গগণ সে সময়ে ভারতীয়গণকে কিরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, শ্রীযুক্ত গান্ধীর মুখে পাঠকগণ শুনুন। ১৮৯৬ খৃঃ ২৬শে অক্টোবর মাদ্রাজে এক সাধারণ সভায় দক্ষিণ আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়গণের দুর্দ্দশা বর্ণনকালে তিনি এই মর্ম্মে বলেন,—

"দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণ একান্ত ঘৃণ্য জীব। কি ইতর কি ভদ্র, ভারতীয় মাত্রেই সেখানে 'কুলি' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ভারতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে 'কুলি-মাষ্টার,' ভারতীয় দোকানদার-গণকে 'কুলি দোকানদার' বলা হয়। দাদা আবদুল্লা ও মুস হাজি কাসিম নামে দুইজন বোম্বাইবাসী ভদ্রলোক সেখানে জাহাজের মালিক; তাঁহাদের জাহাজ 'কুলি জাহাজ' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। এ কোলাণ্ডাভেলু পিলে এণ্ড কোং নামে এক সম্ভ্রান্ত মাদ্রাজী কোম্পানী ডার্ব্বাণ বন্দরে বৃহৎ অট্টালিকা-শ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ অট্টালিকা-শ্রেণীকে 'কুলি ষ্টোর্স' এবং উহার মালিকগণকে 'কুলি মালিক' বলা হয়। সেখানে রেলের ও ট্রামের কর্ম্মচারিগণ, কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিবাদ সত্ত্বেও, আমাদের প্রতি পশুবৎ আচরণ করিয়া থাকে। তথায় ফুট্‌পাথের উপর চলা-ফেরা আমাদের পক্ষে নিরাপদ নহে; তাহা হইলে হয়ত ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবে, অথবা অপমান করিবে। †

*   *   *   *   *

—ট্রান্সভালে কোথাও কোথাও একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে ভাড়াটিয়া কোচ্ (বড় গাড়ী) পাওয়া যায়। কোচের ভিতরে বসিবার অধিকার আমাদের নাই। প্রচণ্ড শীতে ও প্রখর রৌদ্রে আমা-দিগকে গাড়ীর বাহিরে বসিয়া যাতনা সহিতে হয়। হোটেলে আমরা স্থান পাই না; এমন কি শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত স্থানে কোন সম্ভ্রান্ত ভারত-বাসীর পক্ষে সামান্য জলযোগ সংগ্রহ করাও দুষ্কর। কিছুদিন পূর্ব্বে একদল শ্বেতাঙ্গ, নেটালের ডাণ্ডি পল্লীতে একখানি ভারতীয় দোকানে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিল। ভারতীয়গণের প্রতি এই বিজাতীয় ঘৃণার

† প্রিটোরিয়ার রাজপথে একদিন এক প্রহরী শ্রীযুক্ত গান্ধীকে পদাঘাত করিয়া ফুট্‌পাথ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল।

অভিব্যক্তি দক্ষিণ আফ্রিকার নানা রাজ্যে ভারতীয়গণের স্বাধীনতা সঙ্কোচক আইন-কানুনে পরিস্ফুট হইয়াছে।”*

মাদ্রাজে উল্লিখিত বক্তৃতা করিবার তিন বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ যে সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় উপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের ভিতর ভারতীয় বিদ্বেষ প্রজ্বলনোন্মুখ ধূমের ন্যায় ঘনায়িত হইতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিধাতার অলঙ্ঘ্য নির্দ্দেশে শ্রীযুক্ত গান্ধী নেটালের ডার্ব্বাণ বন্দরে অবতীর্ণ হন।

বন্দরে নামিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সাম্যস্বাধীনতার লীলাভূমি বিলাতে ও আফ্রিকায় কত প্রভেদ! শুধু ভারতীয় বলিয়া তাঁহাকে অনেকবার বিপাকে পড়িতে হইয়াছিল।

গান্ধীর লাঞ্ছনা।

তিনি নেটালের সুপ্রিম কোর্টে এড্ভোকেট্রূপে প্রবেশপ্রার্থী হইলে তত্রত্য আইন-সমিতি (Law Society) এই বলিয়া আপত্তি তুলিলেন যে, কৃষ্ণকায় ব্যক্তি ব্যবহারাজীবের গৌরব লাভ করিতে পারে না। যাহাহউক ধীরবুদ্ধি বিচারকগণ

---

*পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন; ইহা তেইশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সে সময়ে ট্রান্সভালে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তদবধি অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদকারী, ন্যায়দণ্ডধারী, সমদর্শী বৃটেনের নৈতিক প্রভাবে এবং পরবর্ত্তী ঘটনায় ভারতীয়গণের গুণের পরিচয় পাইয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার উপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গগণ অধুনা অনেকটা সংযত হইয়াছেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে জুলাই বিলাতে রাষ্ট্রীয় সমর পরিষদে (Imperial War Conference) সমবেত বৃটিশ উপনিবেশিক প্রতিনিধিগণ ভারতীয় প্রতিনিধিগণের প্রস্তাবানুযায়ী, উপনিবেশবাসী ভারতীয়গণের স্বার্থসংক্রান্তে কতিপয় গুরুতর সমস্যার অনুকূল মীমাংসা করিয়া দেন এবং অবশিষ্ট অনুযোগগুলির আশু মীমাংসার নিমিত্ত স্ব স্ব গবরমেণ্টকে অনুরোধ করেন।

এ আপত্তি শুনিলেন না। পরে আদালতে তাঁহাকে ব্যারিষ্টারি শিরস্ত্রাণ উন্মোচনের নিমিত্ত কর্কশ কণ্ঠে আদেশ করা হইল। শ্রীযুক্ত গান্ধী একান্ত বিরক্ত হইয়া আদালত ত্যাগ করিলেন।

ট্রান্সভাল গমন কালে ট্রেণের গার্ড তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে জোরপূর্ব্বক নামাইয়া দিয়াছিল। বলা বাহুল্য শ্রীযুক্ত গান্ধী প্রথম শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিয়া সেই কামরায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি গার্ডের আচরণে ক্ষুণ্ণ হইয়া ভাবিলেন, এই কি সেই ন্যায়দণ্ডধারী, দুর্ব্বলের সহায়, বৃটিশের আশ্রিত রাজ্য!

এইরূপ লাঞ্ছনা শ্রীযুক্ত গান্ধীকে বহুবার সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি নিজের জন্য যতটা বেদনা না বোধ করিতেন, ততোধিক বেদনা স্বদেশবাসীর জন্য অনুভব করিতেন। কিন্তু উপায় কি?

যে মামলা সূত্রে শ্রীযুক্ত গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়াছিলেন তাহা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে শেষ হইয়া গেল। তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। নেটালের ভারতীয়গণ একটী বিদায়-ভোজের আয়োজন করিয়া তাঁহার যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিল। ভোজের দিন সায়াহ্নে শ্রীযুক্ত গান্ধী নেটালের একখানি সংবাদ-পত্রে অকস্মাৎ এই সংবাদ পাঠ করিলেন যে, তত্রত্য ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচনে ভারতীয়গণ ভোটদানের যে অধিকার এতাবৎকাল ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা অপহরণের নিমিত্ত শীঘ্রই একটী বিল উপনিবেশিক

বিদায়ে বাধা।

পার্লামেণ্টে পেশ হইবে এবং তৎপরে ভারতীয়গণকে আটেপিঠে বাঁধিবার উদ্দেশ্যে আরও বহুবিধ আয়োজন চলিবে। শ্রীযুক্ত গান্ধী বুঝিলেন, এবার সত্য সত্যই পশ্চিম গগনে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখা দিয়াছে; শীঘ্রই প্রবল ঝঞ্চা উঠিবে! তাহাতে অভাগ্য ভারতীয়গণের নিষ্পেষণ অবশ্যম্ভাবী।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতীয়গণ নেটালের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচন ব্যাপারে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের তুল্য অধিকার ভোগ করিতেন; অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক যে কোন শ্বেতাঙ্গ বা ভারতীয় পুরুষ পঞ্চাশ পাউণ্ড (সাড়ে সাতশত টাকা) মূল্যের স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হইলে বা বার্ষিক দশ পাউণ্ড (দেড়শত টাকা) খাজনা দিলে, বৃটিশ প্রজা বলিয়া, তাঁহার নাম ভোটদাতৃগণের তালিকায় স্থান পাইত। কাফ্রিগণের ভোটদান সম্বন্ধে পৃথক্ নিয়ম প্রচলিত ছিল। সূক্ষ্মবুদ্ধি গান্ধী অনুমানে বুঝিলেন যে, অতঃপর ভারতীয়গণকে আইনের চক্ষে কাফ্রিদের তুল্য হীন করা হইবে। তিনি এই বিপদ বার্ত্তা ভোজসভায় সম্মিলিত ভারতীয়গণকে জানাইলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে নাবিকহীন নৌকার আরোহীর ন্যায় একান্ত অসহায় বুঝিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধীকে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে ধরিয়া বসিলেন।

এখন শ্রীযুক্ত গান্ধী কোন্ পথে যাইবেন? স্বদেশে স্বজনমণ্ডলীর মধ্যে ব্যারিষ্টারি করিয়া, তাঁহার ন্যায় মেধাবী যুবক অবশ্যই বিপুল বিত্তের অধিকারী হইতে পারিবেন—সকলের

সম্মানভাজন হইবেন—এরূপ আশা অসঙ্গত নহে। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় অতি অল্প দিনের জন্য গিয়া নানারূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন। তত্রত্য ভারতীয় সমাজ তাঁহার তুল্য শিক্ষিত নহে। তাহাদের কাহারও সহিত তাঁহার আত্মীয়তা নাই; এমন কি পূর্ব্বে আলাপ-পরিচয় পর্য্যন্ত ছিল না। সেখানে ব্যারিষ্টারি করিয়া তেমন লাভের আশা করাও বাতুলতা মাত্র; বরং পদে পদে নির্য্যাতন ও অবমাননা সহ্য করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় কয়জন যুবক বিদেশে পরের জন্য নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিতে পারে?

পরার্থপরতার জয়।

পরার্থৈকপ্রাণ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণের বিপদে বিচলিত হইলেন। তিনি তাহাদের অদৃষ্টের সহিত নিজের অদৃষ্ট মিলাইয়া দিলেন। তাঁহার পরামর্শে তৎক্ষণাৎ উপনিবেশিক পার্লামেণ্টে এই মর্ম্মে তার প্রেরিত হইল যে, ভারতীয়গণের সম্বন্ধে সঙ্কল্পিত বিলটী যেন তাড়াতাড়ি আইনে পরিণত না হয়।

শ্রীযুক্ত গান্ধী দেখিলেন, ভারতীয়গণের স্বার্থ রক্ষার্থ একটা সভা প্রতিষ্ঠা না করিলে, সমবেতভাবে কার্য্য করা সম্ভবপর হইবে না। এই সঙ্কল্প সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যে পরিণত হইল—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে নেটালে সম্ভ্রান্ত ভারতীয়গণের সহযোগে 'নেটাল ইণ্ডিয়ান্ কংগ্রেস' নামে এক মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীযুক্ত গান্ধী ঐ সভার অনারারি সেক্রেটারি নিযুক্ত হইলেন। তা'ছাড়া অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভা-সমিতি নানাস্থানে লোকমত গঠনে প্রবৃত্ত হইল। শ্রীযুক্ত গান্ধীর অধীনে একদল ত্যাগী কর্ম্মঠ

সঙ্ঘ গঠন।

ভারতীয় যুবক, স্বদেশীয়গণের হিতসাধন কল্পে, প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাঁহার অদ্ভুত চরিত্রবল, অনন্যসাধারণ সহিষ্ণুতা, আদর্শ আতুর-সেবা, কঠোর সংযমাভ্যাস, আড়ম্বরহীন আচরণ, একনিষ্ঠ সত্যবাদিতা ও নিষ্কলঙ্ক পরার্থপরতা সন্দর্শন করিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল; মনে করিল—শ্রীভগবান্ তাহাদেরই উদ্ধারের নিমিত্ত এই দেবদূতটীকে প্রেরণ করিয়াছেন!

প্রথম আইন রোধ।

অতঃপর উপনিবেশিক পার্লামেণ্টে উত্থাপিত ভারতীয় বিলটী নাকচ করাইবার জন্য নবীন কংগ্রেসের পক্ষে উৎসাহী গান্ধী অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোন ফল হইল না। প্রস্তাবিত বিলটী যথারীতি পাশ হইয়া 'এসিয়াবাসীর বহিষ্কার আইন' (Asiatic Exclusion Act) নাম ধারণ করিল। আইনের মর্ম্ম এই যে, এসিয়াবাসী মাত্রেই ভোটের অধিকার ভ্রষ্ট হইবেন। কোন নূতন আইন পাশ হইলে তাহা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে বিলাতী কর্ত্তৃপক্ষের মঞ্জুরী লইতে হয়। শ্রীযুক্ত গান্ধী উল্লিখিত আইনের বিরুদ্ধে বহু ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একখানি যুক্তিপূর্ণ দরখাস্ত বিলাতের তৎকালীন উপনিবেশ সচিব মিঃ জোসেফ্ চেম্বারলেনের * নিকট প্রেরণ করিলেন। উপনিবেশ-সচিব শ্রীযুক্ত গান্ধীর অলঙ্ঘ্য যুক্তিপরম্পরা পাঠ করিয়া নূতন আইনে সম্রাটের মঞ্জুরী রদ করিয়া দিলেন। ফলে, প্রথম আইন-জাল শতধা ছিন্ন হইল।

* ইনি ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব মিঃ অষ্টেন চেম্বারলেনের পিতা; ১৮৯৫ খ্রীঃ হইতে ১৯০৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের উপনিবেশ-সচিব ছিলেন।

দ্বিতীয় আইন প্রবর্ত্তন।

পর বৎসর উপনিবেশ কর্ত্তৃপক্ষ উল্লিখিত বিলটী প্রত্যাহার করিলেন ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটী বিল উপনিবেশিক পার্লামেণ্টে পাশ হইল। শেষোক্ত বিলটী আইনে পরিণত করিবার পূর্ব্বে, উপনিবেশিক কর্ত্তারা তাহা মিঃ চেম্বারলেনকে দেখাইয়া লইয়াছিলেন ; সুতরাং এবার ভারতীয়-গণের পক্ষে প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও নূতন আইনে মঞ্জুরী লাভ করিতে বিলম্ব ঘটিল না। উল্লিখিত আইনের মর্ম্ম এই যে, যে দেশে পার্লামেণ্টের ব্যবস্থানুযায়ী নির্ব্বাচিত সদস্য সমবায়ে গঠিত শাসন-প্রতিষ্ঠান নাই, সে দেশের কোন অধিবাসী (শ্বেতাঙ্গ বংশসম্ভূত না হইলে) সকৌন্সিল গভর্ণরের ছাড়পত্র ব্যতীত, ভোটদাতৃগণের তালিকাভুক্ত হইবে না ; তবে যাহাদের নাম ইতিপূর্ব্বে ঐ তালিকায় স্থান পাইয়াছে, তাহাদের অধিকার পূর্ব্ববৎ বজায় থাকিবে।

শ্রীযুক্ত গান্ধী দেখিলেন, একেই ত ভারতীয়গণের মধ্যে ভোটদাতার সংখ্যা অতি অল্প, তদুপরি যদি প্রকারান্তরে তাহাদের ভোটের অধিকার কাড়িয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে আইনের চক্ষে তাহারা ত ছোট হইবেই ; পরন্তু ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের মনোমত সভ্য নির্ব্বাচনের সুবিধা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হই-বারই সম্ভাবনা। তিনি ভারতীয়গণের পক্ষে ঘোষণা করিলেন যে, নির্ব্বাচনমূলক শাসন-প্রতিষ্ঠান ভারতেও রহিয়াছে ; সুতরাং নূতন আইনটী এসিয়াবাসীর পক্ষে যদি বা প্রযোজ্য হয়, ভারতীয়গণের সম্বন্ধে কিছুতেই খাটিবে না। ইহাই বিরোধের প্রথম স্তর।

ভারতীয়গণকে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়াও উপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গগণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। নেটাল-যাত্রী দরিদ্র শ্রমিকদলকে দেখিয়াই, ভারতের অধিবাসিগণের সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে হেয় ধারণা জন্মিয়াছিল। ভারতীয়গণ যে আর্য্য সন্তান—ব্যাস বশিষ্ঠের বংশধর—তাহারাই যে জগতে সভ্যতার প্রথম আলোক শিখা জ্বালিয়াছিল—জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্মেষণায় একদিন জগতে গুরুর আসন অধিকার করিয়াছিল, এ সংবাদ দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশিকগণের কর্ণে কখনও পৌঁছে নাই। তাঁহারা মনে করিতেন, ভারতীয় মাত্রেই কুলি! কুলি কখনও শ্বেতাঙ্গের সমান আসন পাইতে পারে না!

এত বিদ্বেষ কেন?

এদিকে স্বাধীনজীবী ভারতীয়গণ দক্ষিণ আফ্রিকার বাণিজ্য ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিলেন। কোথাও কোথাও বা তাঁহারা শ্বেতাঙ্গ বণিক্‌গণের সহিত সমকক্ষতা করিতেন। তাঁহাদের তুল্য সুলভে বা স্বল্পলাভে জিনিসপত্র সরবরাহ করা শ্বেতাঙ্গ বণিক্‌গণের পক্ষে সহজসাধ্য নহে; কারণ তাঁহাদের সাজ-সরঞ্জাম বাবদ ব্যয় অনেক অধিক। কাজেই স্বাধীনজীবী ভারতীয়গণকে দেশান্তরিত করিবার জন্য আইনের এক নূতন ফাঁদ পাতা হইল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট পর্য্যন্ত চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকগণ নিম্নলিখিত সর্ত্তে দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হইত,—

শ্রমিক আইনের শক্ত বাঁধন।

(১) পাঁচ বৎসরের মধ্যে কার্য্য ত্যাগ করিতে পারিবে না। (২)

স্ত্রীপুত্রাদি সহ বিনা ভাড়ায় কার্য্যস্থানে নীত হইবে। (৩) নিজের ও পরিজনবর্গের আহার এবং বাসস্থান বিনা মূল্যে পাইবে। (৪) প্রথম বৎসর মাসে দশ শিলিঙ (সাড়ে সাত টাকা) বেতন প্রদত্ত হইবে; পরে প্রতি বৎসারান্তে মাসিক বেতন এক শিলিঙ (বার আনা) বাড়িবে। (৫) চুক্তির কাল অতীত হইলে কোন শ্রমিক যদি আরও পাঁচ বৎসর কাল স্বাধীন শ্রমিকরূপে তথায় অবস্থান করে, তাহা হইলে বিনা ভাড়ায় ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে।

ইহার পরিবর্ত্তে নেটাল গভরমেণ্ট নিম্নলিখিত সর্ত্তে এক নূতন আইনের খসড়া প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হইলেন,—

প্রথম চুক্তির পাঁচ বৎসর অতীত হইলে শ্রমিকগণকে হয়, (ক) ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, অথবা (খ) আজীবন নেটালে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক-রূপে কালাতিপাত করিতে হইবে। শেষোক্ত পন্থাবলম্বিগণের বেতন, ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া নয় বৎসর পরে মাসিক এক পাউণ্ড অর্থাৎ পনর টাকা দাঁড়াইবে। কোন শ্রমিক চুক্তিকাল অন্তে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন বা নূতন চুক্তিতে প্রবেশ না করিয়া নেটালে অবস্থান করিলে, তাহা ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

নেটালের কর্ত্তৃপক্ষ জানিতেন যে, সঙ্কল্পিত বিলটী প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে ঐ সম্বন্ধে ভারত গভরমেণ্টের সম্মতি লওয়া প্রয়োজন; কারণ, ভারত গভরমেণ্ট যদি ঐরূপ সর্ত্তে শ্রমিক পাঠাইতে স্বীকৃত না হন, তাহা হইলে নেটালের কৃষিক্ষেত্রগুলি আবার আদিম অবস্থা প্রাপ্ত হইবে! কাজেই ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে নেটালের পক্ষে দুইজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি ভারতে আসিয়া নূতন সর্ত্ত গ্রহণের জন্য তৎকালীন বড়লাটের দ্বারস্থ হইলেন। তাঁহাদের

নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ভারত গভরমেণ্ট অন্যান্য সর্ত্তে স্বীকৃত হইলেন বটে ; কিন্তু কোন শ্রমিক চুক্তির কাল অন্তে স্বেচ্ছায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন না করিলে, বা নূতন চুক্তিতে আবদ্ধ না হইলে, ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হইবে, এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না।

নেটালের কর্ত্তৃপক্ষ তখন অন্য উপায় আবিষ্কার করিলেন। তাঁহারা ফৌজদারী দণ্ড প্রয়োগের পরিবর্ত্তে, নেটালের স্বাধীন ভারতীয়গণের উপর বার্ষিক তিন পাউণ্ড (পঁয়তাল্লিশ টাকা) মুণ্ডকর (Poll Tax) আদায় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—ধনী নির্ধন, ইতর ভদ্র—সকল স্বাধীন ভারতীয়কেই জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে এই গুরু করভার বহন করিতে হইবে। পাঠক মনে রাখিবেন, ইহা সাধারণ শ্রমিকের ছয় মাসের বেতন ! জনপ্রতি বার্ষিক পঁয়তাল্লিশ টাকা মুণ্ডকর দিয়া কোন্ শ্রমিক নিজের ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যার গ্রাসাচ্ছাদন সংস্থান করিতে সক্ষম ? কাজেই নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হইলে, ভারতীয় শ্রমিকগণকে চুক্তিকাল অন্তে হয় ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, নতুবা দাসখৎ লিখিয়া দিয়া আজীবন দাসত্বের পাদুকা শিরে বহন করিতে হইবে—ইহা সুনিশ্চিত। নেটালে শ্রমিক-জীবনের শেষ পরিণাম এই !

শ্রীযুক্ত গান্ধী প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন তুলিলেন। ভারতীয়গণের পক্ষে উপনিবেশিক পার্লামেণ্টে তীব্র প্রতিবাদ-পত্র প্রেরিত হইল। কিন্তু হায় ! কোন ফল হইল

না—বিলটী যথা নিয়মে পাশ হইয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয়, দশবৎসর পূর্ব্বে ভারতীয়গণের এইরূপ বহিষ্কার প্রস্তাব একবারে নেটাল দরবারে উত্থাপিত হওয়ায়, যাঁহারা তৎকালে দৃঢ়তার সহিত তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এবার তাঁহারাই এই আইনের উদ্যোগী! সে সময়ে ঐরূপ আইন প্রবর্ত্তন প্রয়োজন কিনা, স্থির করিবার জন্য এক কমিশন বসিয়াছিল। কমিশনে নেটালের এটর্ণি-জেনারেল এই মর্ম্মে সাক্ষ্য দেন,—

বিফল আন্দোলন।

"ভারতীয় শ্রমিকগণ নামে মাত্র স্বেচ্ছায় এদেশে আসিলেও বস্তুতঃ তাহারা প্রায়ই বিনা সম্মতিতেই আনীত হইয়া থাকে। তাহারা জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাঁচটী বর্ষ এদেশের কাজে কাটাইয়া দেয়। এই সময়ের মধ্যে পুরাতন সম্বন্ধ তাহারা ভুলিয়া যায়—নূতন সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়; হয়ত এদেশে ঘর-বাড়ী বাঁধিয়া বসে। অতএব আমার ন্যায়বিশ্বাসমতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। তাহাদের দ্বারা কাজ করাইয়া লইয়া, পরে তাড়াইয়া দেওয়া অপেক্ষা ভারতীয় শ্রমিকের আমদানি আদৌ বন্ধ করিয়া দেওয়া অনেক ভাল। এই উপনিবেশ ভারতীয়গণকে চায়, অথচ তাহাদের আগমনের ফল এড়াইতে উৎসুক। আমি যতদূর জানি, ভারতীয়গণ কোন ক্ষতি করে নাই; বরং এক হিসাবে অনেক ভালই করিয়াছে। যাহারা পাঁচ বৎসর সচ্চরিত্রতার সহিত এদেশে কাটাইয়াছে, তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার উপযুক্ত কারণ, আমি কিছুই শুনি নাই।"

দশ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ নির্ভীক ভাষায় যিনি ভারতীয়গণের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তিনিই এবার নূতন বিলের খসড়া উপনিবেশিক পার্লামেণ্টে পেশ করিলেন! শুধু এটর্ণি-জেনা-

রেল নহেন, নেটালের বহু পদস্থ ব্যক্তিই এবার মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্ !

নূতন বিলের বিবরণ পাঠ করিয়া লণ্ডনের 'টাইম্‌স' ও 'ষ্টার' প্রমুখ স্বনামপ্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্রসমূহ নেটালপ্রবাসী ভারতীয়গণের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 'ষ্টার' পত্র লিখিলেন,—

"নূতন বিলে ভারতীয়গণকে ক্রীতদাস করিবার আয়োজন হইয়াছে। প্রস্তাবটী একান্ত গর্হিত, বৃটিশ প্রজার অপমানকর, প্রস্তাবকারিগণের কলঙ্কসূচক ও আমাদের প্রতি উপেক্ষাজনক। দক্ষিণ আফ্রিকার উপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গ ব্যবসাদারদের বণিকসুলভ অর্থগৃধ্নুতার ফলে এত বড় একটা উৎকট অন্যায় যাহাতে না ঘটে, তৎপ্রতি প্রত্যেক ইংরাজেরই লক্ষ্য রাখা উচিত।"

'টাইম্‌স' বলিলেন,—

"ভারত গভরমেণ্টের হাতে এক অতি সহজ প্রতিকারোপায় রহিয়াছে। উপনিবেশ-যাত্রিগণের বর্ত্তমান মঙ্গল এবং ভবিষ্যৎ সুব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্য্যন্ত, তাঁহারা নেটালে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রেরণ বন্ধ রাখিতে পারেন।"

এবারও শ্রীযুক্ত গান্ধী উপনিবেশ-সচিবের নিকট প্রতিকার-প্রার্থী হইলেন। তিনি এই মর্ম্মে আবেদন করিলেন যে, প্রস্তাবিত বিলটী পরিত্যক্ত হউক, অথবা ভারতীয় শ্রমিক আমদানির পথ রুদ্ধ হউক। বিলাতী সংবাদ-পত্রসমূহের অনুকূল মন্তব্য পাঠ করিয়া তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, নূতন বিল নাকচ হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রতিপক্ষের আয়োজন এমনই প্রবল যে, শ্রীযুক্ত

গান্ধীর আবেদন-পত্র বন্যামুখে বালির বাঁধের মত ভাসিয়া গেল। বিলটী সম্রাটের সম্মতি লাভ করিয়া পাকা আইনে পরিণত হইল। কর্ম্মবীর গান্ধী কিন্তু ইহাতেও হতাশ হইলেন না। তিনি বুঝিলেন, আরও কঠোর পরীক্ষা আসিতেছে।

স্বদেশে সহানুভূতি।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত গান্ধী ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই দক্ষিণ-আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়গণের দুর্দ্দশা-কাহিনী বিবৃত করিয়া একখানি 'খোলা চিঠি' ভারতীয় নেতৃগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত আত্মত্যাগ, অসাধারণ স্বদেশ-প্রেমিকতা এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্রবলের পরিচয় বহুপূর্ব্বেই ভারতবাসীর কর্ণে পৌঁছিয়াছিল। ভারতবাসী তাঁহাকে সাদরে বরণ করিয়া প্রীতির মাল্য পরাইয়া দিল। তিনি বোম্বাই ও মাদ্রাজ সহরে বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি নানাস্থানে সাধারণ সভায় প্রবাসী ভারতীয়গণের নির্যাতন বার্ত্তা জ্বলন্ত ভাষায় ঘোষণা করিয়া এবং ঐ বিষয়ক পুস্তকাদি অজস্র প্রচার করিয়া ভারতীয় জনসাধারণের সাহায্য-প্রার্থী হইলেন। দক্ষিণ-আফ্রিকাপ্রবাসী অভাগ্য ভারতীয়গণের জন্য এদেশে সহানুভূতির স্রোত তর তর বেগে বহিল।

ভারতে আন্দোলনের সংবাদ 'রয়টারে'র তারে অতি সংক্ষেপে বিকৃতাকারে নেটালে পৌঁছিল। নেটালের শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশিকগণ শুনিলেন, শ্রীযুক্ত গান্ধী ভারতে আসিয়া এই মর্ম্মে পুস্তিকা প্রচার করিতেছেন যে, নেটালে ভারতীয়গণ প্রহৃত, হৃতবিত্ত ও

পশুবৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাহার প্রতিকার কিছু হয় না। 'রয়টার' ইহাও জানাইলেন যে, বোম্বায়ের 'টাইম্‌স অব্ ইণ্ডিয়া' পত্র এই অভিযোগের তদন্ত প্রার্থনা করিয়াছেন।

উল্লিখিত সংবাদ বারুদ-স্তুপে নিক্ষিপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় নেটালের শ্বেতাঙ্গ সমাজে ঘোর জিঘাংসানল প্রজ্বলিত করিল। তাঁহারা দক্ষিণ আফ্রিকার নানা স্থানে সভা আহ্বান করিয়া, শ্রীযুক্ত গান্ধীর বিরুদ্ধে অশেষ কুৎসা প্রচার করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের প্রজ্বলিত রোষবহ্নি নেটালের নিরীহ ভারতীয়গণের ভীতি উৎপাদন করিল। তাঁহারা শ্রীযুক্ত গান্ধীকে অবিলম্বে তথায় প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য জরুরি সংবাদ পাঠাইলেন।

শরণাগত-বৎসল গান্ধী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না— তিনি স্ত্রীপুত্রাদিসহ সত্বর দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করিলেন। যে জাহাজে তিনি ডার্ব্বাণ পৌঁছিলেন, সেই জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে ছয় শত ভারতীয় আরোহী লইয়া আর একখানি জাহাজ ঐ বন্দরে প্রবেশ করিল। উভয় জাহাজকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য 'কোয়া-রাণ্টাইন'* আইন অনুসারে যাত্রীদলসহ আটক রাখা হইল। এদিকে ডার্ব্বাণ বন্দরে গুজব রটিয়া গেল যে, শ্রীযুক্ত গান্ধী এবার স্বদেশ হইতে বহু সুদক্ষ কারিগর সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন; তাহারা

---

* সংক্রামক ব্যাধি-প্রপীড়িত বন্দর হইতে আগত কোন জাহাজ নূতন বন্দরে পৌঁছিলে, তাহাকে যাত্রী ও মালপত্র নামাইবার পূর্ব্বে, কয়েক দিন অপেক্ষা করিতে হয়। ব্যাধির বিস্তৃতি নিবারণ, এই ব্যবস্থায় উদ্দেশ্য।

শ্বেতাঙ্গ কারিগরগণকে প্রতিযোগিতায় হটাইয়া দিয়া, সমস্ত শিল্প কার্য্যগুলি আয়ত্তাধীন করিবে ; ফলে, শ্বেতাঙ্গ কারিগরগণের অন্নে ধূলি পড়িবে।

এই জনরবে আস্থা স্থাপন করিয়া নেটালের শ্বেতাঙ্গ শিল্পিগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। তাহারা স্থির করিল যে, নবাগত ভারতীয়গণকে কিছুতেই জাহাজ হইতে নামিতে দেওয়া হইবে না। চারিদিকে তুমুল আন্দোলন পড়িয়া গেল। দলে দলে শ্বেতাঙ্গ শ্রমজীবিগণ সমুদ্রতটে সমবেত হইতে লাগিল। কেহ কেহ প্রকাশ্য সভায় প্রস্তাব করিল যে, যাত্রীসহ জাহাজ দুইখানি অতল তলে ডুবাইয়া দেওয়া হউক! অবশেষে শ্রীযুক্ত গান্ধীকে জানান হইল যে, তিনি যদি সঙ্গীদলসহ ডার্ব্বাণে অবতীর্ণ হইতে সচেষ্ট হন, তাহা হইলে ঘোরতর বিপদ ঘটিবে ; সে সঙ্কটে কেহ তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। অতএব তিনি দলবলসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন। শ্রীযুক্ত গান্ধী কিন্তু ইহাতে তিলমাত্র ভীত হইলেন না ; তিনি 'কোয়ারাণ্টাইনে'র কাল অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত ধীরভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ 'কোয়ারাণ্টাইনে'র আইনসঙ্গত সময় কাটিয়া গেল ; কিন্তু যাত্রীদলকে অবতরণের আদেশ প্রদত্ত হইল না—জাহাজ দুইখানি রাজা ত্রিশঙ্কুর ন্যায় মধ্যপথে আটক রহিল। জাহাজের সত্বাধিকারিগণ তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া আদালতের আশ্রয় লইবেন, স্থির করিলেন। তখন নেটাল গভরমেণ্ট নিতান্ত বাধ্য হইয়া যাত্রীদলকে বন্দরে নামাইবার হুকুম দিলেন। এই সংবাদ পাইয়া ডার্ব্বাণের ক্রোধান্ধ শ্বেতাঙ্গগণ দলে দলে 'ডক্'

অভিমুখে ছুটিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই স্থানটী রুদ্র জনতায় ভরিয়া গেল। চারিদিকে রোষদীপ্ত আস্ফালন, প্রবল হুঙ্কার ও অশ্রান্ত কোলাহলে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা বুঝিয়া, নেটালের এটর্ণি-জেনারেল জনসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"বৃটিশ সাম্রাজ্ঞীর দোহাই, তোমরা এখানে হাঙ্গামা করিও না; স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যাও। আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি, নেটাল পার্লামেণ্ট ইহার প্রতিকার ব্যবস্থা অতি সত্বর করিবেন।"

ইহার পর হাঙ্গামাকারিগণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। শ্রীযুক্ত গান্ধীর সহযাত্রীদল তীরে নামিয়া আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার পত্নী ও সন্তানগণ শ্রীযুক্ত পার্শি রস্তমজী নামে জনৈক ধনবান বন্ধুর গৃহে প্রেরিত হইলেন। তখনও হাঙ্গামাকারীরা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই। একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার আসিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধীকে সে সময়ে বন্দরে নামিতে নিষেধ করিলেন; বলিলেন,—'আপনি সন্ধ্যার পর নামিবেন।' কিছুক্ষণ পরে মিঃ লাউটন নামে নেটালের জনৈক উদারহৃদয় শ্বেতাঙ্গ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত গান্ধীকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য জাহাজে আসিলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধী অন্ধকারের অপেক্ষা না করিয়া, তাঁহার সহিত তীরে নামিয়া পড়িলেন। বৃটিশের ন্যায়বুদ্ধি ও সততাই তাঁহার ভরসা! তিনি বন্ধুর সহিত পদব্রজে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু কয়েকজন হাঙ্গামাকারী তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিল। তাহারা বাঘের পশ্চাতে 'ফেউ'র মত বিকট চীৎকার জুড়িয়া দিল। বন্ধুটী তাড়াতাড়ি একখানি 'রিক্‌স'* ভাড়া করিয়া ফেলিলেন;

জীবন সঙ্কট।

---

* মানুষটানা হাল্কা গাড়ী।

কিন্তু জনতা তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। শ্রীযুক্ত গান্ধী তখন বন্ধুর সহিত পুনরায় পদব্রজে অগ্রসর হইলেন। জনসঙ্ঘ উত্তরোত্তর প্রবলতর ভাব ধারণ করিল। বন্ধুদ্বয় একটী রাস্তার মোড়ে পৌঁছিয়া জনতার চাপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। এই সুযোগে হাঙ্গামাকারিগণ শ্রীযুক্ত গান্ধীকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিল; অজস্র প্রহারে তিনি অর্দ্ধমৃত হইয়া পড়িলেন।

দূর হইতে এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া এক সহৃদয়া শ্বেতাঙ্গ মহিলার প্রাণ কাঁদিল। শক্তিরূপিনী জননীর ন্যায় তিনি বিপন্নের রক্ষায় ধাবিতা হইলেন; কিন্তু এ অবস্থায় তিনি একা কি করিবেন! কি উপায়ে ক্রোধান্ধ জনসঙ্ঘের মুখ হইতে প্রহার-জর্জ্জরিত গান্ধীকে ছাড়াইয়া লইবেন? সহসা প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধির জয় হইল। মহাপ্রাণা শ্বেতাঙ্গ মহিলা নিজের ছাতাটী খুলিয়া বিপন্ন গান্ধীর মস্তকে ধরিলেন। উন্মত্ত জনসঙ্ঘ বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে দেখিল—ইনি স্বয়ং পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহধর্ম্মিণী মিসেস্ আলেক্‌জান্দার!

শ্বেতাঙ্গ মহিলার মহত্ত্ব।

শ্রীযুক্ত গান্ধী এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন। পুলিশদল তাঁহাকে এক বন্ধুর গৃহে লইয়া গেল। সেখানেও আবার উত্তেজিত জনসঙ্ঘ চারিদিকে উগ্র আস্ফালন করিতে লাগিল। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানাইলেন যে, হয়ত তাহারা অগ্নি-সংযোগে গৃহদাহ করিতে পারে। পাছে বন্ধুটী সর্ব্বস্বান্ত হন, এই আশঙ্কায় শ্রীযুক্ত গান্ধী কনষ্টেবলের বেশে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া,

সরকারী থানায় আশ্রয় লইলেন। হাঙ্গামাকারিগণের এই সাময়িক উচ্ছ্বাস শনৈঃ শনৈঃ প্রশমিত হইল।

বুয়র-সমর।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃটিশের রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ রাজ্যের বুয়রগণের বিরুদ্ধে বিপুল বৃটিশবাহিনী অবিলম্বে প্রেরিত হইল। শ্রীযুক্ত গান্ধী বুঝিলেন, ভারতীয়গণের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের সময় আসিয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়া ভারতীয়-গণের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিবার—বিদ্বিষ্ট উপনিবেশিকগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার—ইহাই ত শুভ অবসর! তাঁহার আহ্বানে দক্ষিণ আফ্রিকার শত শত ভারতীয় যুবক স্বেচ্ছাসেবক-রূপে যুদ্ধে যাইবার জন্য উৎসুক হইল; কিন্তু তাহাদের আবেদন কর্তৃপক্ষ গ্রাহ্য করিলেন না। উৎসাহী গান্ধী আবার একবার দরখাস্ত দিলেন, সেবারও তাহা পরিত্যক্ত হইল। শেষে যখন কর্ত্তারা দেখিলেন যে, বুয়রগণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করা নিতান্ত সহজ নহে, তখন তাঁহারা ভারতীয় সেবকদলকে আহ্বান করিলেন।

ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক-দলের কৃতিত্ব।

জনপ্রিয় গান্ধীর নেতৃত্বে এক সহস্র ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক সমবেত হইল। তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আহতগণকে হাঁস-পাতালে লইয়া যাইবার ভার পাইল। শ্রীযুক্ত গান্ধীর পরিচালনায় ভারতীয় বাহকদল কিরূপ অটল কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিল, তাহা জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধার মুখে শুনুন। তিনি ১৯১১

খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে জোহানেস্‌বার্গের 'ইলাষ্ট্রেটেড্ ষ্টার' পত্রে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন,—

"অতঃপর নেটালে শ্রীযুক্ত গান্ধীর গঠিত ভারতীয় বাহকদলের কঠোর কর্ত্তব্য আরম্ভ হইল। ভারতীয়গণ এই ব্যাপারে অসাধারণ সহিষ্ণুতার পরিচয় দিলেন। এক রাত্রি গুরুতর পরিশ্রমের পর আমি প্রত্যুষে শ্রীযুক্ত গান্ধীকে পথিপার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিলাম। তিনি সৈন্যদলের রসদী বিস্কুট খাইতেছিলেন। বুলারের অধীনস্থ সৈন্যগণ তখন বিষণ্ণ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। সারা বিশ্ব তাহাদের চক্ষে বিরক্তিকর বোধ হইতেছিল। শ্রীযুক্ত গান্ধীকে কিন্তু ব্যবহারে খুব সংযত, স্ফূর্ত্তিযুক্ত, কথাবার্ত্তায় দৃঢ়-বিশ্বাসী এবং প্রসন্ন-নয়ন দেখিলাম। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় যথা-রীতি আদব-কায়দার সহিত সম্পন্ন হয় নাই; তথাপি আমাদের বন্ধুত্ব জন্মিল। তদবধি আমি তাঁহাকে নেটালের যুদ্ধক্ষেত্রে বহুবার সেই শিক্ষা-হীন ক্ষুদ্র দলের সহিত কর্ম্মরত দেখিয়াছি। যেখানে সাহায্য প্রয়োজন, সেইখানেই তাহারা উপস্থিত! এই অপ্রগলভ নির্ভীকতার ফলে, তাহাদের মধ্যে অনেকে জীবন হারাইয়াছিল। শেষে কর্ত্তৃপক্ষ আদেশ দিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন গোলা-গুলির সহরদে না যায়।"

একদিন ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর ব্যাপ্টে শ্রীযুক্ত গান্ধীর নিকট আসিয়া বলিলেন যে, রণস্থল হইতে আহতগণকে তৎক্ষণাৎ সরাইতে পারিলে, বড়ই উপকার করা হয়। তখনও যুদ্ধ চলিতেছে —উভয় পক্ষের গোলা-গুলি সন্ সন্ ছুটিতেছে! ভারতীয় সেবক-গণ শ্রীযুক্ত গান্ধীর ইঙ্গিতে প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া, অসহায় আহতগণের উদ্ধারার্থ তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল। এ দিন অনেক ভারতীয় সেবক রণাঙ্গণে প্রাণ হারাইল।

ইহারাই একদিন অশ্রান্ত গোলাবৃষ্টির ভিতর হইতে স্বনামধন্য ইংরাজ সেনাপতি লর্ড ররার্টসের একমাত্র পুত্রের মৃতদেহ খুঁজিয়া আনিয়াছিল।

প্রকৃত গুণের আদর করিতে ইংরাজ কোন দিন পশ্চাদ্‌পদ নহেন। সরকারী রিপোর্টে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকদলের প্রশংসা শতমুখে নিনাদিত হইল; কর্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত গান্ধীকে সামরিক পদক দানে সম্মানিত করিলেন। এই ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সমাজে ভারতীয়গণের প্রতি কতকটা প্রীতির ভাব ফুটিয়া উঠিল।

রাজসম্মান লাভ।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে বুয়র সমর মিটিল। বুয়রগণ পরাভূত এবং ট্রান্সভাল তথা অরেঞ্জ রাজ্য ইংরাজের করতলগত হইল। ট্রান্স-ভালে ভারতীয়গণের প্রতি অত্যাচার, যুদ্ধের অন্যতম হেতু বলিয়া বৃটিশ গভরমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন। সুতরাং নূতন শাসন-ব্যবস্থায় দক্ষিণ-আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়গণের দুর্দ্দশা নিশ্চয়ই ঘুচিবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধী ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্ত্রীপুত্রাদিসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, স্থির করিলেন।

নেটালের গুণমুগ্ধ ভারতীয়গণ বিদায়-সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে তাঁহাকে, তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে ও সন্তানগণকে কয়েকখানি মূল্য-বান সুবর্ণ পাত্র ও রত্নালঙ্কার উপহার দিলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধী তাহা নিজের জন্য গ্রহণ না করিয়া, আবশ্যককালে জনহিতকর কার্য্যে ব্যবহারার্থ, বিনীতভাবে প্রত্যর্পণ করিলেন। এতাদৃশ স্বার্থত্যাগ মহাপ্রাণ গান্ধীর জীবনে পদে পদে প্রতিভাত।

বিদায়-সম্বর্দ্ধনা।

তিনি বোম্বায়ে আসিয়া পুনরায় নিশ্চিন্ত চিত্তে ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাকে যে অচিরে দক্ষিণ আফ্রিকায় আবার ফিরিতে হইবে, এরূপ কল্পনা তৎকালে তিনি মনে স্থান দেন নাই।

ট্রান্সভালে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু অভাগ্য ভারতীয়গণের অদৃষ্ট বিন্দুমাত্র সুপ্রসন্ন হইল না; বরং নির্যাতন বাড়িল। ট্রান্সভালে ভারতীয়গণের অবাধ প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল! এমন কি যাঁহারা যুদ্ধের পূর্ব্বে ট্রান্সভালে অবস্থান করিতেন, কিন্তু যুদ্ধের সময় বৃটিশ বন্দরে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও ছাড়পত্র ব্যতীত ট্রান্সভালে পুনরায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না। ছাড়পত্রের উপরও খুব কড়াকড়ি পড়িয়া গেল। ফলে, ট্রান্স-ভালের প্রতিষ্ঠাবান ভারতীয় ব্যবসাদারগণ নিতান্ত বিপন্ন হই-লেন; কারণ তথায় তাঁহাদের বিষয়-সম্পত্তি বড় সামান্য নহে। কোন কোন ব্যবসাদার নিজের জন্য ছাড়পত্র পাইলেও, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও কর্ম্মচারিবর্গকে কার্য্যক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতীয় ব্যবসা-দারেরা যে কোন স্থানে কারবার চালাইতে পারিতেন; নূতন শাসনে সে পথ প্রায় রুদ্ধ হইল। এমন কি ভারতীয় ফেরি-ওয়ালাগণ যাহাতে নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে স্বেচ্ছানুযায়ী যে কোন রাজপথে পরিভ্রমণ করিতে না পারে, তজ্জন্য আইনের ফাঁদ বাড়িল। ইহা ছাড়া ভারতীয়গণের প্রতিকূলে এই কয়টী বিশেষ বিধান ট্রান্সভালে প্রচলিত ছিল,—(ক) নাগরিকের অধিকার

ট্রান্সভালে নূতন বিপদ।

লাভে তাঁহারা বঞ্চিত ছিলেন। (খ) নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে তাঁহারা স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিতেন না। (গ) স্বাস্থ্য রক্ষার অজুহাতে তাঁহাদিগকে সহরের একাংশে নিবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা হইত। (ঘ) প্রত্যেক আগন্তুক ব্যবসায়ী বা স্বাধীনজীবীর নিকট গভরমেণ্ট তিন পাউণ্ড (পঁয়তাল্লিশ টাকা) সেলামী আদায় করিতেন। নূতন শাসন ব্যবস্থায় বর্ণ-বিদ্বেষও বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

ট্রান্সভালের নবীন গভরমেণ্ট ভারতীয়গণের সংখ্যাসমৃদ্ধি দমনের নিমিত্ত 'এসিয়াটিক্ ডিপার্টমেণ্ট ' নামে এক নূতন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ফলে, আইনের নাগপাশে পড়িয়া তত্রত্য ভারতীয়গণ 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' ডাক ছাড়িলেন। এ আর্ত্তনাদ শ্রীযুক্ত গান্ধীর কর্ণে পৌঁছিতে বিলম্ব ঘটিল না।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেস হইতে বোম্বায়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, শ্রীযুক্ত গান্ধী নেটালের ভারতীয়গণের প্রেরিত একখানি জরুরি টেলিগ্রাম পাইলেন। টেলিগ্রামের মর্ম্ম এই

পুনর্যাত্রা।

যে, উপনিবেশ-সচিব মিঃ চেম্বারলেন শীঘ্রই দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা স্বয়ং পরিদর্শনের নিমিত্ত আসিতেছেন ; অতএব ভারতীয়গণের অভাব-অভিযোগ তাঁহাকে জ্ঞাপনার্থ শ্রীযুক্ত গান্ধীর তথায় উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। বিপন্নের আহ্বানে ব্যথিতের প্রাণ টলিল—শ্রীযুক্ত গান্ধী তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হইলেন।

নেটালে পৌঁছিয়া তিনি তত্রত্য ভারতীয়গণের পক্ষে এক

'ডেপুটেশন্' (প্রতিনিধি মণ্ডলী) উপনিবেশ-সচিবের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। নেটালের সরকারী কর্ম্মচারিগণ শ্রীযুক্ত গান্ধীর গুণের পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুমোদনক্রমে, শ্রীযুক্ত গান্ধী 'ডেপুটেশনে'র মুখপাত্ররূপে উপনিবেশ-সচিবকে ভারতীয়গণের অভাব-অভিযোগের কথা প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দিলেন। ট্রান্সভালেও ঐরূপ আয়োজন হইয়াছিল; কিন্তু সেখানকার সরকারী কর্ম্মচারিগণ শ্রীযুক্ত গান্ধীকে 'ডেপুটেশনে'র সদস্য-শ্রেণীভুক্ত করিবার প্রস্তাবে ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন। ট্রান্সভালের ভারতীয়গণ তখন নিরুপায়; তাঁহারা 'ডেপুটেশন' প্রেরণ করিবেন না বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধী কিন্তু তাহা হইতে দিলেন না; তিনি নিজে যাইতে না পারিলেও, অন্যান্য প্রতিনিধিগণকে অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া উপনিবেশ-সচিব সকাশে পাঠাইয়া দিলেন। ট্রান্সভালবাসী ভারতীয়গণ আপনাদের অবস্থা উত্তরোত্তর সঙ্কটসঙ্কুল হইতেছে বুঝিয়া, শ্রীযুক্ত গান্ধীকে তথায় অবস্থান করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। আর্ত্তবন্ধু গান্ধী তাঁহাদের প্রার্থনানুযায়ী এবার প্রিটোরিয়ার সুপ্রিম কোর্টে এটর্ণিরূপে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীযুক্ত গান্ধী জানিতেন,—'তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বদ্ধ্যন্তে মত্ত-দন্তিনঃ।' ট্রান্সভাল-প্রবাসী ভারতীয়গণ প্রবল রাজশক্তির তুলনায় তৃণতুল্য তুচ্ছ হইলেও, তাহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবে, এই আশায়

শ্রীযুক্ত গান্ধী ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে 'ট্রান্সভাল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্' নামে এক সভা প্রতিষ্ঠা করিলেন।

সঙ্ঘশক্তি।

ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের নেতৃগণ ঐ সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। তাঁহাদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী শ্রীযুক্ত গান্ধীর উপর সভার সম্পাদকতা ও আইন সংক্রান্ত পরামর্শ দানের ভার পড়িল।

শুধু সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া উদ্যোগী গান্ধী নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। ভারতীয়গণের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তার করা, ভারতীয়গণের অভাব-অভিযোগের বিবরণ তাহাদের ও শ্বেতাঙ্গ সমাজের সম্মুখে প্রচার করা এবং ভারতীয়গণকে কর্ত্তব্যপথ দেখাইয়া দেওয়া, কিরূপে হইতে পারে? এজন্য সংবাদ-পত্রের সাহায্য একান্ত অপরিহার্য্য। ফলে, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে একটী মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধী 'ইণ্ডিয়ান্ ওপিনিয়ন্' (ভারতীয় অভিমত) নামক সংবাদ-পত্র প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন। কাগজখানি প্রথমে ইংরাজী, গুজরাটী, হিন্দী ও তামিল, এই চারিটী ভাষায় মুদ্রিত হইতে লাগিল; শেষে কিন্তু নানা কারণে হিন্দী ও তামিল ভাষা পরিত্যক্ত হয়। এই সংবাদ-পত্র প্রকাশ করিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধীকে প্রভূত আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রথম বৎসরই ত্রিশ হাজার টাকা ঐজন্য নিজের তহবিল হইতে প্রদান করেন। শুধু টাকায় নহে, তাঁহার লিখিত বহু সুচিন্তিত ও সারবান প্রবন্ধে নূতন সংবাদ-পত্রের গৌরব, শত্রু-মিত্র সকলের

সংবাদ-পত্র।

দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আর্থিক লাভ কিছু না হইলেও, এই সংবাদ-পত্রখানি পরে ভারতীয়গণের পক্ষে প্রধান অস্ত্ররূপে প্রতিপক্ষের কূট কৌশলজাল ছিন্নভিন্ন করিয়াছিল।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জোহানেস্‌বার্গে ভারতীয় অধিবাসিগণের ভিতর ভীষণ প্লেগরোগ দেখা দিল। স্থানীয় মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমে এ সংবাদ জানিতে পারেন নাই; অথবা অকিঞ্চিৎকর বোধে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধী এই বিপদ বার্ত্তা শুনিয়াই জোহানেস্‌বার্গে ছুটিয়া আসিলেন। তিনি মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন যে, তৎক্ষণাৎ প্রতিকার ব্যবস্থা না করিলে মহামারী আরও প্রবলতর হইয়া উঠিবে; কিন্তু তাঁহাদের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। একদিন অহোরাত্রের মধ্যে একুশ জন ভারতীয় প্রাণত্যাগ করিল। তখন আর মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষের মুখ চাহিয়া বৃথা কালক্ষয় করা যুক্তিযুক্ত নহে স্থির করিয়া, শ্রীযুক্ত গান্ধী ৪।৫জন সঙ্গীসহ একখানি ভারতীয় দোকানের দ্বার উন্মোচন করত রোগিগণকে তথায় স্থানান্তরিত করিলেন। সেই স্থানে রোগিগণের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার সম্যক ব্যবস্থা হইল; শ্রীযুক্ত গান্ধী সঙ্গীদলসহ স্বয়ং রোগিপরিচর্য্যায় ব্রতী হইলেন। এমন সৎসাহস ও নির্ভীকতা না থাকিলে কি কেহ নেতা হইতে পারে? পরদিন প্রাতে মিউনিসিপাল কর্ত্তাদের চক্ষু ফুটিল; তাঁহারা প্লেগ প্রতিষেধের যথোপযুক্ত আয়োজনে মন দিলেন। এই দুর্ঘটনায় শতাধিক ভারতবাসী শমন সদনে প্রেরিত হইল।

প্লেগে পরিচর্য্যা।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত গান্ধী ডার্ব্বাণ বন্দর হইতে বার মাইল দূরে শ্যাম শস্পশোভিত নিভৃত পল্লীভূমে 'ফিনিক্স সেট্‌লমেণ্ট' নামক পল্লীবাস প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানটী সহরের ধূলি কোলাহল ও আবর্জ্জনা বর্জ্জিত; পর্ব্বত পার্শ্বে, রেল ষ্টেশন হইতে মাত্র দুই মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। উহার চারিদিকে উর্ব্বর ইক্ষুক্ষেত্র। পল্লী-জননীর স্নেহাঞ্চলে শান্ত শীতল বিটপি-ছায়ায়, অভিনব সমাজবদ্ধ হইয়া কর্ম্মময় জীবন যাপনের কল্পনা, সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ দার্শনিক রাস্কিনের লিখিত "Unto this Last" গ্রন্থে শ্রীযুক্ত গান্ধী পাঠ করেন। কল্পনাটী তাঁহার এতই চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল যে, তিনি অবিলম্বে ফিনিক্স গ্রামে এক সরহদ্দে তিন শত বিঘা ভূমি নিজ ব্যয়ে ক্রয় করিয়া, কয়েকটী বিশিষ্ট ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গ পরিবারকে তথায় বাস করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তাঁহার নিজের ও 'ইণ্ডিয়ান্ ওপিনিয়ন্' পত্রের গৃহ তথায় নির্ম্মিত হইল। দেখিতে দেখিতে স্থানটী নূতন বাসিন্দায় ভরিয়া উঠিল। তাঁহারা নিম্নলিখিত সর্ত্তে নূতন স্থানে বসবাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,—

পল্লীবাস প্রতিষ্ঠা।

(১) মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদ-পত্র ও ভূসম্পত্তির উপর তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। (২) প্রত্যেক বাসিন্দা দরিদ্রের ন্যায় জীবন যাপন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন। (৩) কেহ মাসিক পঁয়তাল্লিশ টাকার অধিক গ্রহণ করিবেন না। [বলা বাহুল্য, দক্ষিণ আফ্রিকায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এদেশের তুলনায় অনেক মহার্ঘ।] (৪) যৌথ সম্পত্তিতে লাভ হইলে তাহার অংশ সকলে সমানভাবে পাইবেন (৫) নূতন বাসিন্দার বাসগৃহ প্রথমতঃ সাধারণ ব্যয়ে নির্ম্মিত হইবে। তিনি

যতদিনে পারেন, কিস্তিবন্দী করিয়া উহা শোধ দিবেন। ঐ টাকার স্থদ লাগিবে না। (৬) প্রত্যেক বাসিন্দা ছয় বিঘা জমী নিজ চাষাবাদের জন্য পাইবেন। উহার দরুণ দেয় টাকাও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পরিশোধ করা চলিবে। (৭) বাসিন্দাগণ সাধারণের হিতকল্পে আত্মনিয়োগ করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে উচ্চনীচ ভেদ থাকিবে না; তাঁহারা পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন।

কৃচ্ছ্র-সাধন।

এই পল্লীবাসে সকলকেই রীতিমত কায়িক শ্রম করিতে হইত। কর্ম্মঠ কৃষকের ন্যায় কেহ মৃত্তিকা খনন করিতেছেন, কেহ লাঙ্গল চালাইতেছেন, কেহ বা কৃষিজাত শস্যরাশি গৃহে তুলিতে ব্যস্ত; অথচ তাঁহারা অশিক্ষিত 'চাষা' নহেন—বরং অনেকে উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। পাঠক, মনে করুন সে কেমন আনন্দময় স্থান! শ্রীযুক্ত গান্ধী এইস্থানে স্ত্রীপুত্রাদিসহ কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধন আরম্ভ করিলেন। বিলাসিতা দূরে পলাইল। আহার—নামমাত্র, পরিধেয়—অতি স্থূল বসন, শয্যা—কম্বলাসন, আবাস—সামান্য কুটীর! তদুপরি অবিরাম পরিশ্রম। এইভাবে কিছুদিন অভ্যাসের ফলে অদ্ভুতকর্ম্মা গান্ধী কঠোর কষ্ট-সহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। তখন কে জানিত, তাঁহার সংযম-শুষ্ক শরীর ভবিষ্যৎ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্যই বিধাতার অলক্ষ্য ইঙ্গিতে গঠিত হইতেছিল।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে জুলুগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। নেটালে 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া গেল। এ সংঘর্ষে রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধী নিজের নেতৃত্বে বিশজন ভারতীয় সেবক

সহ ডুলি-বাহকরূপে, আহতগণকে হাঁসপাতালে বহন করিবেন বলিয়া, কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। তাঁহারা অশ্বারোহী সৈন্যদলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়া পদব্রজে রওনা হইলেন। হাতে অস্ত্র নাই, চারিদিকে অসভ্য শত্রুপক্ষের আস্তানা—কখন কোন্ বৃক্ষান্তরাল হইতে বিষাক্ত তীর আসিয়া শরীরে বিঁধিবে বলা যায় না; এইরূপ অবস্থায় কোন কোন দিন ত্রিশ মাইল কুচ্ করা কি সহজ সাধ্য! তাঁহারা সহস্র বিপদ শিরে লইয়া, প্রভূত ক্লেশ সহ্য করিয়া, আহত জুলুগণের শুশ্রূষায় ব্রতী হইলেন। ভারতীয় সেবকদলের অদ্ভুত কার্য্যকুশলতার বিবরণ সরকারী রিপোর্টে ফুটিয়া উঠিল; কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে ধন্যবাদ করিলেন।

জুলু বিদ্রোহ।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ট্রান্সভালের নূতন গভরমেণ্ট এশিয়াবাসিগণের অপমানকর এক অভিনব আইনের (Ordinance) খসড়া প্রস্তুত করিলেন। আইনের মর্ম্ম এই যে, এশিয়াবাসিগণকে সরকারী খাতায় নাম রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে এবং নামের পার্শ্বে স্ব স্ব টিপ-সহি দিতে হইবে। শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, স্ত্রী পুরুষ, কেহই রেহাই পাইবেন না—সকলকেই অঙ্গুষ্ঠাগ্র মসীলিপ্ত করিয়া কয়েদীদের মত সরকারী খাতায় কৃষ্ণাঙ্গের কলঙ্ক-চিহ্ন স্বহস্তে আঁকিয়া দিতে হইবে! ট্রান্সভালে আগন্তুক ভারতীয়দলের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করাই আইনকর্ত্তাদের উদ্দেশ্য; পরন্তু প্রস্তাবিত

আবার আইনের নাগপাশ।

আইনে ভারতীয়গণের প্রতি এমনই একটা বিজাতীয় ঘৃণার অভি-ব্যক্তি পরিস্ফুট হইয়াছিল যে, তাহা নীরবে সহ্য করা কোন আত্মসম্মানসম্পন্ন জাতির পক্ষে একান্ত অসম্ভব। শ্রীযুক্ত গান্ধী বুঝিলেন, আজ ট্রান্সভালে ভারতীয়গণের ললাটে যে দাসত্বের ছাপ চিরাঙ্কিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা যদি একবার নির্ব্বিবাদে মাথা পাতিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য রাজ্যেও, এমন কি পৃথিবীর সর্ব্বত্র, প্রবাসী ভারতীয়গণের প্রতি ঐরূপ দাসাসাত্ম বর্ব্বর ব্যবস্থা হইতে বিলম্ব ঘটিবে না। অতএব জাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণে লড়িতেই হইবে।

শ্রীযুক্ত গান্ধী ট্রান্সভালের প্রতিষ্ঠাবান ভারতীয় নেতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গীসহ প্রথমে প্রস্তা-বিত আইনের ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারিগণের দর্শনপ্রার্থী হই-লেন। তাঁহাদের সহিত বহু বিচার-বিতর্ক ও আলোচন-আন্দো-লনের পর স্থির হইল যে, ভারতীয় রমণীগণ রেজিষ্ট্রী আইনের আমলে আসিবেন না। সম্ভাবিত নিগ্রহের কতকটা রেহাই হইল বটে; কিন্তু শ্রীযুক্ত গান্ধী এইখানেই নিরস্ত থাকা সঙ্গত বোধ করিলেন না। তিনি সঙ্কল্পিত বিধানের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন তুলিলেন। সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে, প্রকাশ্য বক্তৃতায়, সাধারণ কথাবার্ত্তায়, ভারতীয়গণ রেজিষ্ট্রী আইনের প্রতিকূলে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাহা কাণে তুলিলেন না। প্রস্তাবিত আইনের ধারাগুলি একরূপ বিনালোচনায় ট্রান্সভালের ব্যবস্থাপক সভায় পাশ হইয়া গেল।

. যে দিন উল্লিখিত আইনটী ব্যবস্থাপক সভায় পরিগৃহীত হয়, সেই দিনই সহরের অপরাংশে 'এম্পায়ার' থিয়েটারে ভারতীয়গণ এক বিরাট বৈঠকে সমবেত হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, তাঁহারা কিছুতেই নাম রেজিষ্ট্রী করিবেন না—টিপ-সহি দিবেন না; ইহার ফলে যে কোন নির্য্যাতন আসে আসুক, নীরবে সহ্য করিবেন। ইহারই নাম—'নিরুপদ্রব প্রতিরোধ' (Passive Resistance)। প্রতিরোধিগণ লাঠিসোঁটা ধরিবেন না, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিবেন না; শুধু সুদৃঢ় মানসিক বলে সহস্র নিপীড়ন সহ্য করিয়াও সঙ্কল্প অটুট রাখিবেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ১১ই সেপ্টেম্বর মহাত্মা গান্ধী ট্রান্সভালবাসী ভারতীয়গণকে এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। ইহাই ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে অক্ষয় কবচরূপে রক্ষা করিয়াছিল।

নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ।

নূতন আইনে সম্রাটের সম্মতি যাহাতে প্রদত্ত না হয়, তজ্জন্য বিলাতে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপনের উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত গান্ধী কয়েকজন কর্ম্মীসহ ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। এই সময়ে ট্রান্সভালে দায়িত্বমূলক গভরমেণ্ট প্রতিষ্ঠার কথা চলিতেছিল। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ, শ্রীযুক্ত গান্ধীর উত্থাপিত সমস্যার মীমাংসা ট্রান্সভালের ভাবী গভরমেণ্ট করিবেন বলিয়া, প্রস্তাবিত আইনে সম্রাটের সম্মতি রদ করিয়া দিলেন।

বিলাতে আন্দোলন।

এই সুযোগে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়গণের স্বার্থ রক্ষার্থ

লণ্ডনে এক কমিটী প্রতিষ্ঠিত হইল। মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড এম্‌থিল * কমিটীর প্রেসিডেণ্ট এবং স্যার মঞ্চেরজী ভবনগরী উহার কার্য্যকরী (Executive) চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইলেন।

লণ্ডনে কমিটী।

এত আয়োজন সত্ত্বেও কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না। ট্রান্সভালে নূতন শাসন প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে, প্রস্তাবিত আইনটী পুনরায় পরিগৃহীত হইয়া সম্রাটের সম্মতি লাভ করিল।

এখন ট্রান্সভালবাসী ভারতীয়গণ কি করিবেন? তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। আইন অমান্য করিলে জেলে যাইতে হইবে, অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইবে—হয়ত বা কর্ত্তৃপক্ষের কোপানলে পড়িয়া পথের ভিখারী সাজিতে হইবে। জলে বাস করিয়া কে কুমীরের সহিত বাদ সাধিতে সক্ষম?

এদিকে শ্রীযুক্ত গান্ধীর জ্বলন্ত বক্তৃতা, অশ্রান্ত উৎসাহবাণী, ভাবোন্মাদিনী লেখনী, ভারতীয়গণের হৃদয়ে তড়িৎ শক্তি সঞ্চার করিতেছিল। তিনি স্বজাতির গৌরব-নিশান সমুন্নত রাখিবার জন্য প্রাণস্পর্শী ভাষায় ভারতীয়গণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমাজ-যন্ত্র এক গভীর মন্দ্রে বাজিয়া উঠিল; সকলে সমস্বরে কহিল,—'আমরা মরিব, তবুও আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিব না।' দক্ষিণ-আফ্রিকাপ্রবাসী চীনাগণ এশিয়াবাসী

তুমুল আন্দোলন।

* ইনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্জ্জনের অনুপস্থিতি কালে ৩০শে এপ্রিল হইতে ১২ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারতে বড়লাটের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

বলিয়া নূতন আইনের নিগড়ে আবদ্ধ হইয়াছিল ; তাহারাও এই আন্দোলনে যোগ দিল।

সরকারী রেজিষ্ট্রারেরা ভারতীয়গণের নাম তালিকাভুক্ত করিবার জন্য নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ; কিন্তু প্রায় পনর আনা ভারতবাসী কিছুতেই নাম লিখাইলেন না—টিপ-সহি দিলেন না। তখন তাঁহাদিগকে আইনের বলে দলে দলে জেলে পাঠান হইতে লাগিল। ভারতীয় কয়েদীদলে কারাগার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহাদের মধ্যে ধনী দরিদ্র, ইতর ভদ্র, বালক বৃদ্ধ, সকল শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁহারা সকলে সানন্দে স্ফীতবক্ষে কারাঙ্গনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। কারাগার আনন্দ-মুখর হইয়া উঠিল।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে শ্রীযুক্ত গান্ধীও আইন অমান্যের অপরাধে অভিযুক্ত হইলেন। তিনি আদালতে বিচারকের সমক্ষে ভারতীয়গণের সমস্ত অপরাধ নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া কহিলেন,—"আমিই তাহাদিগকে 'নিরুপদ্রব প্রতিরোধ' নীতি শিখাইয়াছি, অতএব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাস্তি আমাকে দেওয়া হউক।" ইতিপূর্ব্বেই প্রিটোরিয়ায় শ্রীযুক্ত গান্ধীর কয়েকজন সহকর্ম্মী ছয়মাস সশ্রম কারাবাসে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহাই আইনের চরম দণ্ড। শ্রীযুক্ত গান্ধীর নির্ব্বন্ধাতিশয় সত্ত্বেও বিচারক তাঁহাকে মাত্র দুই মাস বিনা শ্রমে কারাদণ্ড ভোগ করিবার আদেশ দিলেন।

কারাগারে গান্ধী।

কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয়গণের অদ্ভুত দৃঢ়তা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, হাঙ্গামা সহজেই মিটিবে—আইনের চাপে ভারতীয়গণ সায়েস্তা হইয়া যাইবে ; কিন্তু তাহা হইল না। কুলপ্লাবিনী স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবল ভাবের বন্যায় ভারতীয় সমাজ উথলিয়া উঠিল। তখন কর্ত্তারা বিপদ গণিলেন। মিট-মাটের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। 'ট্রান্সভাল লিডার' পত্রের সম্পাদক মিঃ কার্টরাইটের মারফতে শ্রীযুক্ত গান্ধী প্রমুখ নেতৃ-বর্গকে জানান হইল যে, আপাততঃ তিনমাস কাল নূতন আইনের প্রয়োগ বন্ধ থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে যদি ভারতীয়গণ স্বেচ্ছায় নাম লিখাইতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আইনটী পরে একেবারে পরিত্যক্ত হইবে। গভরমেণ্টের পক্ষে জেনারেল স্মাট্‌স স্বয়ং সরকারী কর্ম্মচারি-গণের সমক্ষে শ্রীযুক্ত গান্ধীর নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন যে, ভারতীয়গণ যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া দেন, তাহা হইলে আইনটী নিশ্চয়ই বাতিল করা হইবে। জেনারেল স্মাট্‌সের উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সরলহৃদয় গান্ধী প্রস্তা-বিত সর্ত্তে স্বীকৃত হইলেন ; কিন্তু তাঁহার সহকর্ম্মিগণের মধ্যে কয়েকজন ইহাতে ঘোরতর আপত্তি তুলিল। তাহারা ভাবিল, এ কাপুরুষতা কেন ? কেহ কেহ তাঁহাকে সরকারী গোয়েন্দা বলিয়া সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল।

মিটমাটের প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত গান্ধী সকলকে স্বেচ্ছায় নাম রেজিষ্ট্রী করিবার জন্য আহ্বান করিয়া, নিজে পথপ্রদর্শকরূপে অগ্রসর হইলেন। রেজিষ্ট্রী অফিসের পথে এক অবস্থানভিজ্ঞ নির্ভীক পাঠান, তাঁহাকে

বিভীষণ ভ্রমে, গুরুতর আঘাতে জর্জ্জরিত করিল। প্রহার-কাতর গান্ধীর সংজ্ঞাহীন দেহযষ্টি রাজপথে লুঠাইয়া পড়িল। তাঁহার ক্ষতবিক্ষত মুখমণ্ডলে অজস্র রক্তধারা ছুটিতেছিল; কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া রেভারেণ্ড মিঃ জে-জে ডোকের গৃহে তুলিলেন। ডোক সাহেব শ্রীযুক্ত গান্ধীর গুণমুগ্ধ বন্ধু। তিনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনাইলেন; কিন্তু ক্ষতস্থান সেলাই হইবার পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত গান্ধী নাম রেজিষ্ট্রীর দরখাস্তে সহি করিবেন বলিয়া ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখনও শোণিতধারা ছুটিতেছে, ক্ষতস্থানে দারুণ যন্ত্রণা অনুভূত হইতেছে; কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। অনেকে তখন তাঁহাকে নিরস্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিল; কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ নাম রেজিষ্ট্রী না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না।

প্রহারে প্রাণ-সংশয়।

এই প্রহারের ফলে শ্রীযুক্ত গান্ধীর অবস্থা এমনই সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল যে, অনেকে তাঁহার জীবনাশা ছাড়িয়া দিলেন। এই সময়ে রেভারেণ্ড মিঃ ডোকের সহৃদয়া পত্নী, জননীর ন্যায় অহোরাত্র রোগীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া, মাতৃহৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহধারা ঢালিয়া, রোগীর পরিচর্য্যায় ব্রতী হইলেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে শ্রীযুক্ত গান্ধী উত্তরোত্তর নিরাময় হইয়া উঠিলেন।

পাছে ভারতীয়গণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় শ্রীযুক্ত গান্ধী উল্লিখিত দুর্ঘটনার দিন অপরাহ্নে রোগ যন্ত্রণায় কাঁপিতে কাঁপিতে পশ্চাল্লিখিত ইস্তাহার প্রচার করেন,—



শ্রীমতী গান্ধী।



মিসেস ডোক্‌।

"প্রহারকারিগণ জানিত না যে, তাহারা কি করিতেছে। তাহাদের মনে হইয়াছিল, আমি অন্যায় করিতেছি। ফলে, প্রতিকারের যে একমাত্র উপায় তাহারা জ্ঞাত আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়াছিল। অতএব তাহাদের বিরুদ্ধে যেন কিছু করা না হয়—ইহাই আমার অনুরোধ।

"হিন্দুগণ হয়ত এইজন্য ক্ষুব্ধ হইতে পারেন যে. একজন বা কয়েকজন মুসলমান আমাকে আঘাত করিয়াছে। এ ভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করিলে তাঁহারা বিধাতার চক্ষে এবং জগৎবাসীর সমক্ষে দোষী হইবেন। আজ যে রক্তপাত হইয়াছে, তাহা যেন হিন্দু-মুসলমানকে প্রীতির বন্ধনে জুড়িয়া দেয় —ইহাই আমার ঐকান্তিক কামনা। শ্রীভগবান আমার কামনা পূর্ণ করুন।

'নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইলে, একমাত্র ভগবান ব্যতীত আর কাহাকেও ভয় থাকিবে না। সংযমশীল ভারতীয়গণ ঐ নীতি অবলম্বন করিলে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত হইবেন না; তাঁহারা স্বেচ্ছায় নাম রেজিষ্ট্রী করিলে নূতন আইন পরিত্যক্ত হইবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে কর্ত্তব্যজ্ঞানে উপনিবেশিক গভরমেণ্টের মতানুবর্ত্তী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।"

মহাপ্রাণ গান্ধীর এই আহ্বান-বাণী ব্যর্থ হইল না। ভারতীয়গণ দলে দলে সরকারী খাতায় নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া দিলেন।

এইবার কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি পালনের সময় আসিল; কিন্তু তাঁহারা পাকা আইন বর্জ্জন করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

কর্ত্তৃপক্ষের পণভঙ্গ।

শ্রীযুক্ত গান্ধী লাট দরবারে বহুবার গতায়াত করিলেন —জেনারেল স্মাট্‌সের প্রতিশ্রুতির কথা তুলিয়া, অনেক উপরোধ-অনুরোধ জানাইলেন; কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। শেষে পুনরায় 'নিরুপদ্রব প্রতিরোধ' পন্থা

অবলম্বন করাই পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। যাঁহারা নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া 'রেজিষ্ট্রেশন্ সার্টিফিকেট্' পাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রয়োজন স্থলে সেই সার্টিফিকেট প্রদর্শন করিতে এবং টিপ-সহি দিতে হইবে, ইহাই আইনের বিধান। নিরুপদ্রব-প্রতিরোধিগণ প্রাণান্তেও সার্টিফিকেট দেখাইবেন না, বা টিপ-সহি দিবেন না বলিয়া বদ্ধপরিকর হইলেন।

বিরোধের দাবানল আবার বিকট তাণ্ডবে জ্বলিয়া উঠিল। বালক বৃদ্ধ, ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে ভারতীয়গণ আইন অমান্যের অপরাধে দলে দলে কঠোর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কেহ পতিপ্রাণা পত্নীকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া, কেহ বৃদ্ধা জননীর চক্ষে শোকের দরবিগলিত ধারা ছুটাইয়া, কেহ বা আশ্রয়হীন সন্তানসন্ততিগুলিকে ঘোর বিপদ সাগরে ভাসাইয়া, জাতির সম্মান রক্ষা করিবার জন্য, অকাতরে কারাদণ্ড শির পাতিয়া লইল। কারাগার যেন তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। অতি দীন দরিদ্র হইতে লক্ষপতি পর্য্যন্ত সকলেই সমান নির্যাতন হাসিমুখে সহ্য করিতে লাগিলেন। বিস্ময়ের বিষয়, ইহাদের মধ্যে অনেকেই নিরক্ষর! কেহ কেহ বা দৈনন্দিন পরিশ্রমলব্ধ অর্থে অতিকষ্টে নিজের উদরান্ন সংস্থান করিত—স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইত। পাঠক, এই শ্রেণীর দুঃস্থ শ্রমিকগণের অবস্থা একবার মানস-নেত্রে নিরীক্ষণ করুন। তাহাদের স্ত্রী-পুত্র ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, অনশনক্লিষ্ট শরীর কুকুর বিড়ালের মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,

দেখিলে কাহার না চোখ ফাটিয়া জল আইসে? অন্যদিকে বড় বড় সওদাগরেরা শুধু সত্যরক্ষার নিমিত্ত স্বেচ্ছায় দেউলিয়া হইলেন! ইহাও কি কম মানসিক বলের পরিচায়ক?

ট্রান্সভালবাসী মোট নয় হাজার ভারতীয় পুরুষের মধ্যে দুই হাজার সাত শত জন এই ব্যাপারে অশেষ কারাযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পুনঃ পুনঃ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াও প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ কয়েদীদের জন্য যতদূর সম্ভব জঘন্য রসদ ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু তাহাতে আইন-অমান্যকারিগণের জেদ্ বাড়িল বই কমিল না।

এই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় মহিলাগণ রাজপুত রমণীর ন্যায় স্বামী-পুত্র-সহোদরগণকে বীরোচিত কঠোর কর্ত্তব্য পালনে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উগ্র উদ্দীপনায় সত্যাশ্রয়ী স্থিরপ্রতিজ্ঞ ভীষ্মের মহান্ আদর্শ সকলের সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল।

শ্রীযুক্ত গান্ধী এবার আদালতে অভিযুক্ত হইয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে এজাহার দিলেন,—

"দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি সেই একই অপরাধে দ্বিতীয় বার বিচারালয়ে নীত হইয়াছি। আমি বেশ জানি যে, আমার অপরাধ ইচ্ছাকৃত এবং বিশেষ বিবেচনা সহকারে সম্পাদিত। অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমি আমার চরিত্র সততার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; শেষে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছি যে, আমার স্বদেশবাসিগণ যাহাই করুন বা যাহাই ভাবুন, আমি সাম্রাজ্যের জনৈক নাগরিকরূপে—বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্য-

রূপে—যতদিন গভরমেণ্ট একভাগ নাগরিকের (ভারতীয়গণের) সম্বন্ধে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা করিতে বিরত থাকিবেন, ততদিন পুনঃ পুনঃ আইন ভঙ্গ করিবই করিব। আমার আচরণ যদি নিন্দার্হ হয়, তাহা হইলে আমি বলিতে পারি যে, এসিয়াবাসীর বিরুদ্ধতা ব্যাপারে আমিই প্রধান উদ্যোগী। অতএব আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দণ্ড দেওয়া হউক।”

বিচারক শ্রীযুক্ত গান্ধীকে দুইমাস সশ্রম কারাবাসে পাঠাইলেন। এই সময়ে একদিন তাঁহাকে জোহানেস্‌বার্গের রাজপথে সামান্য চোর-ডাকাতের মত কয়েদী বেশে 'ওয়ার্ডারে'র সঙ্গে পদব্রজে যাইতে হইয়াছিল।

আবার কারাবাস।

দৃঢ়ব্রত গান্ধী এ অপমান গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি মুক্তি লাভ করিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়গণের দুর্দ্দশা কাহিনী ভারতে ও ইংলণ্ডে প্রচার করিবার জন্য, দুইদল 'ডেপুটেশন' প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে ডেপুটেশনের প্রতিনিধিগণ রওনা হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের অপরাধে কারাগারে আটক রাখিলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধী ইহাতেও নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি স্বয়ং কয়েকটী মাত্র সঙ্গীসহ ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন; অন্যদিকে 'ইণ্ডিয়ান্ ওপিনিয়ন্' পত্রের সম্পাদক মিঃ এইচ্-এস-এল পোলাক্* ভারতাভিমুখে রওনা হইলেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। লণ্ডনের 'টাইম্‌স্' প্রভৃতি সংবাদ-পত্র বরাবরই দক্ষিণ-

* এই মহাপ্রাণ ইংরাজ মনীষী ট্রান্সভালে শ্রীযুক্ত গান্ধীর সমব্যবসায়ী অর্থাৎ এটর্ণি ছিলেন।

আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়গণের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। এবার ট্রান্সভালের মন্ত্রিবর্গও এই সময়ে ইংলণ্ডে উপস্থিত ছিলেন। বিলাতের কর্তৃপক্ষ উভয়দলের সামঞ্জস্য বিধানে সচেষ্ট হইলেন ; কিন্তু জেনারেল স্মাট্‌স কিছুতেই নরম হইলেন না। শেষে শ্রীযুক্ত গান্ধী দক্ষিণ-আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়গণের স্বপক্ষে আন্দোলন বিলাতে জাগ্রত রাখিবার এবং ঐ উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করিবার ভার একদল 'ভলাণ্টিয়ারে'র উপর দিয়া ট্রান্সভালে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ডের বহু বিজ্ঞ রাজনীতিক দক্ষিণ-আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়গণের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন।

নিরুপদ্রব প্রতিরোধের জয়।

এদিকে মিঃ পোলাক্ ভারতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দক্ষিণ আফ্রিকার করুণ কাহিনী এদেশে অনেকটা রাষ্ট্র হইয়াছিল। তদুপরি তাঁহার জ্বলন্ত বক্তৃতায় ভারতের প্রধান প্রধান সহরে প্রবাসী স্বদেশীয়গণের জন্য সহানুভূতির স্রোত ছুটিল। তাহারা বিদেশে অশেষ নির্যাতন সহ্য করিয়াও যে ভারতের মুখ উজ্জ্বল রাখিয়াছে, ইহা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। তাহাদের দুর্দ্দশা মোচনের নিমিত্ত প্রভূত অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল। স্যার রতন টাটা প্রমুখ দয়ার্দ্র ধনকুবেরগণ অর্থকোষ উন্মুক্ত করিলেন। কোন কোন সদাশয় সামন্ত-নৃপতি সাহায্য পাঠাইয়া আন্দোলনকারিগণের কার্য্যে উৎসাহ দিলেন। ফলে, দেড় লক্ষ টাকা চাঁদা উঠিল। অবশেষে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মহামতি গোখলে নেটালে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক

প্রেরণের বিরুদ্ধে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঘোরতর আন্দোলন তুলিলেন। তাঁহার মনীষাপূর্ণ অকাট্য যুক্তি পরম্পরায় বড়-লাটের আসন টলিল, তিনি নেটালে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রেরণ ব্যবস্থা একেবারে রদ করিয়া দিলেন। নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের জয় এতদিনে ঘোষিত হইল।

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সমাজেও একদল ন্যায়পরায়ণ মহা-প্রাণ মনীষী ভারতীয়গণের পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা স্যার উইলিয়ম হস্‌কেনের নেতৃত্বে 'হস্‌কেন কমিটি' নামে এক সভা স্থাপন করিয়া স্বজাতীয়গণের অনুষ্ঠিত স্বেচ্ছাচারমূলক অসঙ্গত আচরণের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্যদিকে সঙ্কীর্ণচিত্ত শ্বেতাঙ্গগণ দুর্ব্বল ভারতীয়দলকে নিপীড়িত করিবার নিমিত্ত আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

নির্ব্বাসন ব্যবস্থা।

কোন কোন হাতুড়ে চিকিৎসক কলেরা রোগীর উৎকট ভেদ-বমন দমন করিতে না পারিয়া, সময়ে সময়ে এমন সুতীব্র ধারক ঔষধ দিয়া বসে যে, তাহার ফলে রোগীর উদরাধ্মান হইয়া প্রাণান্ত ঘটে। এবার ট্রান্সভাল গভরমেণ্টও সেইরূপ একটী হাতুড়ে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলেন। তাঁহারা এই মর্ম্মে এক আইন পাশ করিলেন যে, কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে যে কোন ব্যক্তিকে নির্ব্বাসিত করিতে পারিবেন! এই আইন অনুসারে তাঁহারা কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় নেতাকে নেটাল-সীমান্ত পার করিয়া দিলেন; কিন্তু নেতৃগণ সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন। তখন কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিলেন,—'মরিয়া না মরে

রাম এ কেমন বৈরি!' ইহাতেও কিন্তু তাঁহারা দমিলেন না, এক সঙ্গে ৬৪ জন নিরুপদ্রব-প্রতিরোধীকে গ্রেপ্তার করিয়া ভারত-বর্ষে চালান দিলেন। ভারতে আসিয়াই ভারতীয়গণ স্বদেশবাসীর সাগ্রহ উৎসাহে ও স্বেচ্ছাদত্ত অর্থানুকূল্যে আবার দ্বিগুণ সাহসে দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হইলেন্। ট্রান্সভাল কর্ত্তৃপক্ষের জেদ্ বাড়িয়া গেল; তাঁহারা স্থির করিলেন যে, প্রত্যাবর্ত্তনকারিগণকে আর জাহাজ হইতে কিছুতেই নামিতে দেওয়া হইবে না। নির্ব্বাসিতগণ নিরুৎসাহ হইলেন না। তাঁহাদের মধ্যে নারায়ণ স্বামী নামে জনৈক অসমসাহসিক যুবক তীরে উঠিতে সচেষ্ট হইলে. সরকারী লোকেরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। বেচারা বন্দর হইতে বন্দরান্তরে বিতাড়িত হইয়া, শেষে পর্ত্তুগীজ এলাকায় ডেলাগোয়া উপসাগরে সলিল-সমাধি লাভ করিল! এই নির্ভীক যুবকের শোচনীয় মৃত্যুর ফলে ভারতীয় সমাজে দারুণ প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ভারত গভরমেণ্ট এদেশবাসীর হৃদয়ে গভীর চাঞ্চল্য অনুভব করিয়া, বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষকে ট্রান্সভাল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। বিলাত গভরমেণ্টের অনুরোধে ট্রান্সভালে ভারতীয়গণের নির্ব্বাসন ব্যবস্থা রহিত হইল।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কেপ-কলোনি, নেটাল, ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ রাজ্য সম্মিলিত হইয়া 'ইউনিয়ন্ অব্ সাউথ্ আফ্রিকা" বা দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মিলন, এই নূতন নাম গ্রহণ করিয়াছিল। যৌথ

গভরমেণ্টের বিচার বিভাগীয় কেন্দ্র প্রিটোরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ভারত গভরমেণ্টের অনুরোধে বিলাতের কর্তৃপক্ষ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ৭ই অক্টোবর দক্ষিণ আফ্রিকার 'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করেন যে, তত্রত্য ভারতীয়গণের আপত্তিকর মূল আইনটী বর্জ্জন করিয়া, উহার পরিবর্ত্তে এমন বিধান প্রবর্ত্তন করা হউক, যাহাতে জাতি-বিদ্বেষের গন্ধ থাকিবে না; পরন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় নবাগত ভারতীয়দলের প্রবেশপথ প্রায় রুদ্ধ হইলেও, প্রতিবৎসর অল্প সংখ্যক শিক্ষিত ভারতবাসী যেন তথায় যাইতে পারেন। বিলাত গভরমেণ্ট ইহাও বলিয়া দিয়াছিলেন যে, সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহে উপনিবেশকারিগণ যে সকল সুবিধা এযাবৎ ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা যেন অক্ষুন্ন থাকে। বিলাত গভরমেণ্টের চাপে 'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্ট মূল আইন বর্জ্জন করিতে স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে নূতন আইনের খসড়া, যাহা ১৯১১ খৃষ্টাব্দে গড়িয়া তুলিলেন তাহাতে জাতি-বৈষম্য নিরাকৃত হইল না; অধিকন্তু সমুদ্রোপকূলবাসী ভারতীয়গণের অনেকগুলি সুবিধাজনক অধিকার কাড়িয়া লইবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হইল। ভারতীয়গণ উল্লিখিত বিলে কোন মতে সম্মতি দিতে পারিলেন না, কাজেই বিলটী বাতিল হইয়া গেল।

এই সময়ে 'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্টের সহিত ভারতীয় নেতৃগণের মিটমাটের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। গভরমেণ্ট জানাইলেন

যে, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে নূতন বিল পেশ না হওয়া পর্য্যন্ত 'নিরুপদ্রব প্রতিরোধ' যেন বন্ধ রাখা হয়। ভারতীয়গণ ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; কিন্তু ১৯১২ খৃষ্টাব্দে গভরমেণ্ট যে বিল পেশ করিলেন, তাহাও ভারতীয়গণের বিশেষ অনুকূল নহে; কাজেই, আবার সংঘর্ষ বাধিবার উপক্রম হইল। শেষে, ভারতীয়গণ আর এক বৎসর কাল মিটমাটের আশায় অপেক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ২২শে অক্টোবর মহামতি গোখলে কেপ-টাউনে পৌঁছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি কর্ম্মবীর গান্ধীর আহ্বানে, ভারত গভরমেণ্টের তথা বিলাত গভরমেণ্টের সম্মতিক্রমে, তিন সপ্তাহ কাল সারা দক্ষিণ আফ্রিকা পরিভ্রমণ করিয়া প্রধান প্রধান সহরে ভারতীয়গণের ও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের মতামত জানিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষই তাঁহাকে প্রভূত সম্মান সহকারে সম্বর্দ্ধনা করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইলেন না। নেটালের সম্ভ্রান্ত শ্বেতাঙ্গগণ তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত ডার্ব্বাণে বিরাট ভোজের আয়োজন করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। অভিনন্দন-বক্তৃতায় ভারতীয়গণের প্রতি শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের প্রীতিসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তাঁহারা মুণ্ডকর বর্জ্জনের পক্ষে প্রচুর আশ্বাস দিলেন। পরে তত্রত্য চেম্বার-অব্-কমার্সের বৈঠকেও ঐরূপ সহানুভূতির সুবাতাস বহিতে দেখিয়া, শ্রীযুক্ত গোখলে ভারতীয়গণকে জানাইলেন যে, নেটালে মুণ্ডকর রহিত

গোখলের মধ্যস্থতা।

না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কিছুতেই প্রতি নিবৃত্ত হইবেন না। তিনি প্রিটোরিয়ায় 'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্টের মন্ত্রিসম্প্রদায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিটমাটের প্রতিশ্রুতি পাইলেন; এমন কি, নেটালে মুণ্ডকর রদ করিবেন বলিয়া তাঁহারা অঙ্গীকার করিলেন। মেঘমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় আশার উজ্জ্বল আভাসে ভারতীয়গণের হৃদয়াকাশ ভরিয়া গেল—তাঁহারা এত দিনের পর পরিত্রাণ পাইবেন ভাবিয়া, হর্ষোৎফুল্ল হইলেন।

ইতিমধ্যে 'ইউনিয়ন্' আদালতে একটী দেওয়ানি মামলায় বিচারকেরা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভারতীয়গণের বিবাহ আইন মতে সিদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না; কারণ যে

উদ্বাহ অসিদ্ধ।

প্রথানুসারে পুরুষেরা একাধিক রমণীর পাণিপীড়ন করিতে সক্ষম, তাহা অবৈধ। শ্বেতাঙ্গ সমাজে বহু বিবাহ অচল হইলেও হিন্দু-মুসলমানের শাস্ত্রানুসারে উহা দূষণীয় নহে। বিচারকগণ শুধু বহু বিবাহের দোষ কীর্ত্তন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাঁহারা ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের তাবৎ বিবাহ আইনের চক্ষে অসিদ্ধ বলিয়া রায় দিলেন! তবে কি 'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্টের দৃষ্টিতে ভারতীয় রমণীগণ স্বামীর ধর্ম্মপত্নী নহেন? তাঁহাদের গর্ভজাত সন্তানেরা কি আইনের তুলাদণ্ডে অবৈধ সংযোগের ফল বলিয়া সমাজে হেয় হইবেন? হিন্দু-মুসলমানের পবিত্র পরিণয় ব্যাপারে এমন জ্বালাময় কলঙ্কের প্রলেপ ঢালিয়া দিতে, ইতিপূর্ব্বে কেহই সাহসী হন নাই। ভারতীয়গণের সামাজিক আচার-ব্যবহারে 'ইউনিয়ন্' কর্ত্তৃপক্ষের এ হস্তক্ষেপ কেন?

উল্লিখিত বিচার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমাজে সহসা যে ঘোর অশান্তি-অনল জ্বলিয়া উঠিল, সপ্ত সমুদ্রের জলেও বুঝি তাহা নির্ব্বাপিত হইবে না।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কর্ত্তৃপক্ষ 'ইউনিয়ন্' পার্লামেণ্টে বহুদিন প্রত্যাশিত নূতন বিল পেশ করিলেন। ভারতীয়গণ মুক্তিলাভের যে উচ্চ আশা এতদিন হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন—মহামতি গোখলে তাঁহাদিগকে যে বুকভরা ভরসা দিয়াছিলেন—তাহার এতটুকুও প্রস্তাবিত বিলে পূরণের সম্ভাবনা দেখা গেল না। ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিলের যৎসামান্য পরিবর্ত্তিত সংস্করণ মাত্র! নূতন সর্ত্তের মধ্যে কেবল এইটুকু ছিল যে, ভারতীয় রমণীগণ মুণ্ডকর হইতে রেহাই পাইবেন; তবে, তাঁহাদিগকেও প্রতি বৎসর নূতন ছাড়পত্র লইতে হইবে!

ভারতীয়গণ কর্ত্তৃপক্ষের আচরণে অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধী ভারতে শ্রীযুক্ত গোখলের নিকট তারে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মুণ্ডকর কি কেবল রমণীগণের সম্বন্ধে রহিত করিবেন বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন? প্রত্যুত্তরে শ্রীযুক্ত গোখলে জানাইলেন যে, সকলের সম্বন্ধেই উহা নাচক হইবার কথা ছিল। ভারতীয়গণ প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন তুলিলেন; কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। বিলটী সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে 'ইউনিয়ন্' পার্লামেণ্টে পাশ হইয়া গেল। শ্রীযুক্ত গান্ধী বৃটিশ দরবারে ও ইংলণ্ডের সজ্জন-সমাজে সকল ব্যাপার জানাইবার জন্য এক 'ডেপুটেশন' পাঠাইলেন।

অঙ্গীকার প্রতিপন্ন করিবার জন্য, জেলে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। জোহানেস্‌বার্গেও ঐরূপ আর একদল নিরুপদ্রব-প্রতিরোধী নারীসঙ্ঘ গঠিত হইল।

নেটালের বীরবালাগণ ট্রান্সভালের সীমান্তবর্ত্তী ভক্সরাষ্ট্ পল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা ঐ স্থানে পৌঁছিবা-মাত্র অনধিকার প্রবেশের অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়া তিন মাস কঠোর কারাদণ্ড ভোগের আদেশ পাইলেন। ইহাঁরাই কারা-তীর্থের প্রথম যাত্রী!

অন্যদিকে জোহানেস্‌বার্গের নিরুপদ্রব-প্রতিরোধিনীগণ নেটা-লের উত্তর সীমায় আসিয়া নিউক্যাসলে আড্ডা পাতিলেন। তাঁহারা ঐ অঞ্চলের কয়লা-খনিসমূহে প্রত্যহ পরিভ্রমণ করিয়া চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকগণকে মুণ্ডকর রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত, একযোগে কাজ ছাড়িবার জন্য প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ধর্ম্মঘটের বিষাণ বাজিয়া উঠিল। নেটালের কয়লা খনিসমূহে দরিদ্র শ্রমজীবীদল যেন সহসা নূতন প্রাণ পাইল—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কোন অলক্ষ্য শক্তির ইঙ্গিতে জাতির কল্যাণ-মন্দিরে ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দিতে ব্যগ্র হইল। কর্ম্ম-কোলাহলময় কয়লা-খনিসমূহ একে একে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। আর সে ব্যস্ততা নাই, উদ্দাম কর্ম্ম-প্রবণতা নাই—শ্রমিকগণ দলে দলে ধর্ম্মঘটে যোগ দিল।

কয়লা-খনির স্বত্বাধিকারিগণ বিচলিত হইলেন। তাঁহারা তাড়াতাড়ি ডার্ব্বাণে এক বৈঠক আহ্বান করিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধীকে

তথায় উপস্থিত থাকিবার জন্য নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রীযুক্ত গান্ধী সভায় সকলের সমক্ষে ভারতীয়গণের অনুযোগ কাহিনী বিবৃত করিয়া বলিলেন যে, খনির স্বত্বাধিকারিগণ মুণ্ডকর বর্জ্জনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন জানিয়াই শ্রমিকদল ধর্ম্মঘট করিয়াছে; অতএব কর্ত্তৃপক্ষের অঙ্গীকার অনুযায়ী মুণ্ডকর রহিত হইলেই, তাহারা আবার স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। সভার অনুষ্ঠাতৃগণ তখন জেনারেল স্মাট্‌সকে তারে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শ্রীযুক্ত গান্ধীর কথিত প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছিল কি না? এবার জেনারেল স্মাট্‌স ও জেনারেল বোথা প্রতিশ্রুতির কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন; কিন্তু মিঃ ফিসার (যিনি মিটমাটের কথাবার্ত্তার সময় মন্ত্রি-সভায় উপস্থিত ছিলেন) তাহা উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। পক্ষান্তরে শ্রীযুক্ত গোখলে স্পষ্ট ভাষায় তার পাঠাইলেন যে, মুণ্ডকর বর্জ্জনের প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই প্রদত্ত হইয়াছিল।

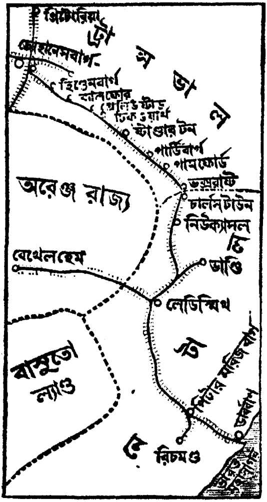
ধর্ম্মঘট।

যাহা হউক গোলযোগের মীমাংসা কিছুই হইল না। খনির সত্বাধিকারিগণ মিটমাটের আশায় শ্রমিকদলের রসদ প্রথম কয়েক দিন বন্ধ করেন নাই বটে, কিন্তু তাহাদিগকে কাজে লাগাইবার জন্য গভরমেণ্টের সাহায্যে নানারূপ অবৈধ চাপ দিতে লাগিলেন। শ্রমিকগণ তখন দলে দলে কয়লা-খনি ত্যাগ করিয়া নিউক্যাসল অভিমুখে রওনা হইল।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! রেলে, রাজপথে, পঙ্গপালের মত শত-শত বালক যুবক বৃদ্ধ বনিতা আপনাদের যৎসামান্য জিনিসপত্র

স্কন্ধে লইয়া, কেহ কেহ বা দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানগুলিকে বুকের উপর ফেলিয়া, নিউক্যাসলে সমবেত হইতে লাগিল। সে সময়ে প্রবল বর্ষা নামিয়াছে। গভীর কর্দ্দমাক্ত পথে লট্‌বহর লইয়া যাইতে শ্রমিকগণ দারুণ কষ্টে পড়িল বটে, কিন্তু তাহাদের মনের বল কিছুতেই হ্রাস হইল না।

নিউক্যাসল যাত্রা।



ডার্বান হইতে প্রিটোরিয়া।

এদিকে মিঃ ক্যালেন-ব্যাক্ প্রমুখ কয়েকজন কর্ম্মঠ সঙ্গীর সাহায্যে শ্রীযুক্ত গান্ধী শ্রমিকদলের রসদ যোগাইবার ব্যবস্থা নিজের হাতে লইলেন। দেখিতে দেখিতে লেডিস্মিথ তথা ডাণ্ডি হইতে নিউক্যাসল পর্য্যন্ত চারিদিকের শ্রমিকদল নিউক্যাসলে আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা প্রত্যেকে এক এক মুষ্টি চাউল, সামান্য পরিমাণ রুটি ও একটু-মাত্র চিনি পাইয়া সকল অভাব ভুলিল। রন্ধনের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করা দুর্ঘট, বাসস্থান—উন্মুক্ত আকাশ-তল; ইহাতেও কিন্তু তাহারা ক্ষুণ্ণ নহে, কারণ কর্ম্মবীর গান্ধী যে তাহাদের সঙ্গে তাহাদেরই মত কষ্ট সহ্য করিতেছেন! তিনি রোগীর শুশ্রূষায়, ক্ষুধার্ত্তকে আহার্য্য



মিঃ ক্যালেনব্যাক।



মিঃ পোলাক্।

বিতরণে, আশ্রিতগণের যথাসম্ভব কষ্ট নিবারণে একা শত হস্তীর বল ধরিয়াছেন। এমন কর্ম্মকুশল মহাপ্রাণ আদর্শ নেতাকে সম্মুখে দেখিলে, কাহার চিত্ত আত্মত্যাগে উৎসুক না হইয়া থাকিতে পারে?

নিউক্যাসলে শ্রমিকদল সমবেত হইলে শ্রীযুক্ত গান্ধী তাহাদিগকে লইয়া ট্রান্সভাল রাজ্যে প্রবেশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

বিরাট অভিযান।

ছাড়পত্র ব্যতিরেকে ট্রান্সভালে প্রবেশ করিলে তাঁহারা অবশ্যই গ্রেপ্তার হইবেন এবং জেলে যাইবেন, ইহাই তাঁহাদের কামনা। জেলে এত কয়েদীকে স্থান দেওয়া সহজসাধ্য নহে। বিশেষতঃ এত লোক যে আইনের বিরোধী, তাহা বাহাল রাখাও বড় দুষ্কর। কাজেই 'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্টকে হয় বাধ্য হইয়া আইন বদলাইতে হইবে; নতুবা অশান্তির তিক্ত রসে প্রভুত্বের আস্বাদন তাঁহাদের অতৃপ্তিকর হইয়া উঠিবে—ইহাই নিরুপদ্রব-প্রতিরোধিগণের অভিমত।

৩০শে অক্টোবর শ্রীযুক্ত গান্ধী শ্রমিকদলসহ নেটালের সীমান্তবর্ত্তী চার্লস্‌টাউন পল্লীতে পৌছিলেন। এই অভিযানের প্রাক্‌কালে কর্ত্তৃপক্ষ কতিপয় ধর্ম্মঘটকারীকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু তাহাতে শ্রমিকদল নিরুৎসাহ হওয়া দূরে থাক, তাহাদের জেদ্ আরও বাড়িয়া গেল। শত শত ব্যক্তি চার্লস্‌টাউনে আসিয়া শ্রমিকদলের সহিত যোগ দিল। এখানে মেসার্স বলীভাই এণ্ড মুকদুম নামে ভারতীয় ব্যবসাদারগণ অভিযাত্রীদলের অভাব মোচনে স্বতঃপরতঃ সচেষ্ট হইলেন। ডার্ব্বাণ ও জোহানেস্‌বার্গের ভারতীয় সওদাগরেরা প্রচুর রসদাদি

পাঠাইতে লাগিলেন। ভারত হইতে তারে আশাতীত অর্থ সাহায্য প্রেরিত হইল। শ্রীযুক্ত গান্ধীর নেতৃত্বে তখন তিন সহস্র ভারতীয় নরনারী ক্ষুদ্র চার্লস্‌টাউন পল্লীটী যেন ছাইয়া ফেলিল। এই সময়ে 'নেটাল মার্কারি' পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা ঐ পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

"'আমি ৫ই নভেম্বর তারিখে দুইবার চার্লস্‌টাউন্ পরিদর্শন করি। সারা পল্লীখানি যেন ভারতীয় বাজার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। সর্ব্বত্রই ভারতীয়গণের জনতা। প্রথমে তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা কিছুই হয় নাই; শেষে শ্রীযুক্ত গান্ধীর উদ্যোগে মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষ অনেকটা সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একখানি ভারতীয় দোকানের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী প্রাঙ্গনে আমি শ্রীযুক্ত গান্ধীকে দেখিলাম। ঐ দোকান হইতে তাঁহার অনুচরগণকে চাউল ও তরকারি অংশ মত বণ্টন করিয়া দেওয়া হইতেছিল। ঐ দিন একজন রুটি বিক্রেতা ভারতীয়গণকে পাঁচ হাজার রুটি বিক্রয় করিয়াছিল।"

চার্লস্‌টাউন পার হইলেই ট্রান্সভাল রাজ্যের সীমানা। ঐ পল্লীতে পৌঁছিয়াই শ্রীযুক্ত গান্ধী তাঁহার সঙ্কল্প তারে কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন এবং উত্তরের আশায় সাতদিন দলবলসহ ধীরভাবে প্রতীক্ষা করিলেন। কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। বরং শ্রমিকদলের ডেপুটী প্রটেক্‌টার চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকগণকে কাজে ফিরাইবার জন্য বহু প্রলোভন দেখাইয়াও যখন বিফলপ্রয়াস হইলেন, তখন তাহাদের মধ্যে কয়েকদলকে গ্রেপ্তার করিলেন। ইহারা পরে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

৬ই নভেম্বর শ্রীযুক্ত গান্ধী, ভারতীয় রমণী ও বালকবালিকা-গণের অধিকাংশ, সহকর্ম্মী মিঃ ক্যালেনব্যাকের অধীনে চার্লস্-টাউনে রাখিয়া স্বয়ং দুই সহস্র সঙ্গীসহ ট্রান্সভাল রওনা হইলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, গভরমেণ্ট যদি তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করেন, ভালই; নচেৎ তাঁহারা ট্রান্সভালের অন্তর্গত জোহানেস্-বার্গ সহরের সমীপবর্ত্তী ললীগ্রামে টলষ্টয় কৃষিক্ষেত্র অবধি পদ-ব্রজে গমন করিবেন। চার্লসটাউন হইতে জোহানেস্‌বার্গ প্রায় দুই শত মাইল ব্যবধান; প্রত্যহ গড়ে পঁচিশ মাইল হাঁটিলে তাঁহারা আটদিনে তথায় পোঁছিবেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধী প্রয়োজনানুরূপ রসদাদি সঙ্গে লইলেন্।

ট্রান্সভাল রাজ্যের প্রবেশমুখে জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারী কয়েকজন মাত্র সিপাহীসহ সীমান্ত রক্ষা করিতেছিলেন। যাত্রীদল তাঁহাকে দেখিয়া দাঁড়াইল। শ্রীযুক্ত গান্ধী তখন যাত্রী-শ্রেণীর পশ্চাদ্‌ভাগে শেষ ব্যবস্থা করিয়া আসিতে-ছিলেন। সম্মুখে পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে তাঁহার একটু বিলম্ব ঘটিল। এই সময়ের মধ্যে যাত্রীদল অধীর হইয়া উঠিল। তাহারা উচ্চ কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতে করিতে ভক্সরাষ্টের রাজপথে ছড়াইয়া পড়িল। পুলিশ প্রহরিগণ বিশাল সাগরে জল বুদ্‌বুদের মত ভাসিয়া গেল।

ট্রান্সভাল প্রবেশ।

যাত্রিগণ ঐ দিন সন্ধ্যাগমে পাম ফোর্ড পল্লীতে উপনীত হইল। তত্রত্য ভারতীয়গণ শ্রীযুক্ত গান্ধীর জন্য পৃথক বাসস্থান ও সুচারু

আহার্য্য আয়োজন করিয়াছিলেন। কর্ম্মবীর গান্ধী সে সমাদর বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া কহিলেন,—'আমার শত শত সহচর যে ভূমিশয্যায় ও যে সামান্য আহারে সন্তুষ্ট, আমিও তাহাতে পরিতৃপ্ত থাকিব।' মহাপ্রাণ গান্ধীর এই মহান্ ত্যাগ-নিষ্ঠা ও কঠোর আত্মসংযম প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার সহযাত্রীদলের হৃদয়-তটিনী শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার গৌরবে কূলে কূলে ভরিয়া উঠিল।

'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্ট আবার একটী ভুল চাল চালিলেন। দৈত্যসম্রাট্ হিরণ্যকশিপু বালক প্রহ্লাদের মুখে হরিনাম বন্ধ করিবার জন্য যে অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, 'ইউনিয়ন্' কর্তৃপক্ষ এবার সেই পথ ধরিলেন। তাঁহারা শ্রীযুক্ত গান্ধাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য, ওয়ারেণ্ট মঞ্জুর করিলেন। তাঁহাদের ধারণা, শ্রীযুক্ত গান্ধীকে কবলিত করিতে পারিলেই যাত্রীদল যূথভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে; ফলে, সকল হাঙ্গামা মিটিবে!

শ্রীযুক্ত গান্ধী পামফোর্ডে সরকারী ওয়ারেণ্ট-বাহিগণের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া কর্তৃপক্ষের অনুরোধে নিজের কয়েকজন সহচরকে তাঁহারই বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবার জন্য নির্দ্দেশ করিলেন; নচেৎ তাঁহাকে অপরাধী প্রমাণ করাও নিতান্ত সহজ নহে। সরকারী লোকেরা তাঁহাকে মোটরযানে ভল্করাষ্ট্ অভিমুখে লইয়া গেল। তত্রত্য আদালতে তিনি পর-দেশীর আইন (Immigration Act) ভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত হইলেন। অনুচরগণ পাছে কোন বিপদে পড়ে অথবা অবৈধ

গান্ধী গ্রেপ্তার।

হাঙ্গামা বাধাইয়া বসে, এই আশঙ্কায় শ্রীযুক্ত গান্ধী আদালতে জামিন প্রার্থনা করিলেন এবং 'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্টের অন্তর্বিভাগীয় সচিবের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক তার পাঠাইলেন,—

"নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ আন্দোলনের মূল উদ্যোগীকে গভরমেণ্ট অবশেষে কেন গ্রেপ্তার করিয়াছেন, বুঝিতেছি ; কিন্তু আমি ইহা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, যে মুহূর্ত্তে আমাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহা মনুষ্যত্বের চক্ষে নিতান্ত গর্হিত। গভরমেণ্ট সম্ভবতঃ জানেন যে, যাত্রীদলের মধ্যে ১২২টী রমণী ও ৫০টী দুগ্ধপোষ্য শিশু রহিয়াছে। তাহারা প্রায় অনাহারে, বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া, স্বেচ্ছায় পথ অতিক্রম করিতেছে। এ সময়ে তাহাদের ভিতর হইতে আমাকে ছিনাইয়া লওয়া, কোন মতেই ন্যায়সঙ্গত নহে। গত রাত্রে গ্রেপ্তার হইয়া আমি তাহাদিগকে কোন কথা জানাইয়াও আসিতে পারি নাই। তাহারা হয়ত ক্রোধান্ধ হইতে পারে। অতএব আমাকে তাহাদের সহিত যাইতে দেওয়া হউক, অথবা গভরমেণ্ট তাহাদিগকে ট্রেণে করিয়া টলষ্টয় কৃষিক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিন এবং তাহাদের খাদ্যের সুব্যবস্থা করুন। আশাকরি, গভরমেণ্ট পুনর্বিবেচনার ফলে যাত্রীদলের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিকে অপসারিত না করিতে অথবা তাহাদের জন্য কোনরূপ সরকারী ব্যবস্থা করিতে, অগ্রসর হইবেন। ইহার পর যাত্রীদলের যদি কোন বিপদ-আপদ ঘটে—তাহাদের মধ্যে যদি কেহ প্রাণ ত্যাগ করে—বিশেষতঃ শিশু ও রমণীগণের ভিতর কাহারও যদি জীবনহানি হয়, তাহা হইলে গভরমেণ্ট দায়ী হইবেন।"

শ্রীযুক্ত গান্ধী উল্লিখিত আবেদনের কোন উত্তর পাইলেন না ; তবে, বিচারক তাঁহাকে জামিনে খালাস দিলেন।

মুক্তিলাভ করিয়াই শ্রীযুক্ত গান্ধী মোটরে দ্রুতবেগে যাত্রী-দলের সঙ্গে আসিয়া মিশিলেন। এই সময়ের মধ্যে যাত্রীদল পার্ডিবার্গ পল্লীতে পৌঁছিয়াছিল। অতিরিক্ত ভ্রমণ বশতঃ তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও পদতলে দারুণ ক্ষত দেখা দিয়াছিল। শ্রীযুক্ত গান্ধী শিশু ও মহিলাগণকে, কয়েকজন ক্ষত-কাতর পুরুষের তত্ত্বাবধানে, এই গ্রামে রাখিয়া আবার পূর্ণোদ্যমে অভিযান আরম্ভ করিলেন। ৮ই নভেম্বর প্রাতে তাঁহারা ষ্টাণ্ডার-টন্ সহরে পৌঁছিলেন। এইখানে কোন কোন খনির ম্যানেজার পুলিশের সাহায্যে কয়েকদল ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিককে গ্রেপ্তার করিয়া ট্রেণে নেটালে চালান দিলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধীও এ যাত্রা বাদ পড়িলেন না। তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত অপরাধে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়া স্থানীয় আদালতে হাজির করা হইল। তিনি এবারও জামিনের প্রার্থনা জানাইলেন। অন্যদিকে ভারতীয় যাত্রীদল, তাহাদের গুরুকল্প নেতাকে সঙ্গে না লইয়া কিছুতেই আদালত-গৃহ ত্যাগ করিবে না বলিয়া, জেদ্ প্রকাশ করিতে লাগিল। বিচারক শ্রীযুক্ত গান্ধীকে জামিনে খালাস্ দিলেন। ভারতীয় যাত্রীদল উচ্চ জয়ধ্বনি সহকারে তৎক্ষণাৎ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল।

এদিকে মিঃ পোলাক্ দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদ ভারতে প্রচার করিবার জন্য অতি শীঘ্র রওনা হইবেন বলিয়া, ৯ই নভেম্বর শ্রীযুক্ত গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। যাত্রার পূর্ব্বে পরামর্শ স্থির করাই, সাক্ষাতের উদ্দেশ্য। ষ্টাণ্ডারটন্ হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী টিক্‌ওয়ার্থ নামক স্থানে মিত্রদ্বয়ের সম্মিলন

ও সংবাদ আদান-প্রদান সম্পন্ন হইল। তাঁহারা প্রায় তিন মাইল দীর্ঘ যাত্রীশ্রেণীর পুরোভাগে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একখানি সরকারী গাড়ী তাঁহাদের দিকে দ্রুতবেগে আসিতেছে। তখনও গ্রেলিঙষ্টাড্ পৌঁছিতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগিবার সম্ভাবনা। গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তুইজন পুলিশ কর্ম্মচারী ও সর্ব্বশেষে ট্রান্সভাল্লের প্রধান ইমিগ্রেসন্ অফিসার মিঃ চাম্‌নে দেখা দিলেন। মিঃ চাম্‌নে, নেটালের চুক্তিবদ্ধ-শ্রমিক-আইন অনুসারে প্রদত্ত ওয়ারেণ্টবলে, শ্রীযুক্ত গান্ধীকে গ্রেপ্তার করিলেন। পুরুষসিংহ গান্ধী এজন্য অপ্রস্তুত ছিলেন না। সরকারী গাড়ীখানি তাঁহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইল; মিঃ পোলাক্ যাত্রীদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যার সময় যাত্রীদল গ্রেলিঙষ্টাডে পৌঁছিল। তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার। পল্লীর একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত, রাজপথের উভয় পার্শ্বে তাহারা যৎসামান্য উনান জ্বালিয়া রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। আঁধার পল্লী যেন সহসা সহস্র চক্ষু বিস্তার করিয়া আগন্তুকগণের উদ্দেশে বিপুল বিস্ময় প্রকাশ করিল; কিন্তু বেশী ক্ষণ সে ভাব রহিল না। যাত্রীদল আহারান্তে পথিপার্শ্বে শয্যাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হিমসিক্ত প্রবল পার্ব্বত্য ঝটিকায় ও বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাত ফলে, বড়ই কষ্ট বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু এ কষ্ট যে তাহাদের অঙ্গের ভূষণ!

পরদিন ঊষাগমে আবার অভিযান আরম্ভ হইল। গ্রেলিঙষ্টাড হইতে বালফোর তের মাইল। যাত্রীদল বেলা ৯টার সময়

শেষোক্ত স্থানে পৌঁছিল। এখানে আসিয়া মিঃ পোলাক্ দেখিলেন যে, তিনখানি স্পেশাল ট্রেণ পথিপার্শ্ববর্ত্তী রেল ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছে। মিঃ চাম্‌নে ও জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারী মিঃ পোলাক্‌কে জানাইলেন যে, কর্ত্তৃপক্ষ যাত্রীদলকে নেটালে লইয়া যাইবার জন্য ট্রেণ তিনখানি পাঠাইয়াছেন; তাহারা তথায় পৌঁছিলে ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত হইবে। মিঃ পোলাক্ আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। আপনারা আমাকেও গ্রেপ্তার করুন। তবে এ সময়ে গভরমেণ্ট শ্রীযুক্ত গান্ধীকে যাত্রীদলের ভিতর হইতে সরাইয়া লওয়ায় তাহাদিগকে আমার মতাবলম্বী করা সহজসাধ্য হইবে না; কারণ তাহাদের মধ্যে অনেকের নিকট আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত।" প্রত্যুত্তরে মিঃ চাম্‌নে জানাইলেন যে, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম গভরমেণ্ট দেন নাই। শ্রীযুক্ত গান্ধী এই সময়ে হিল্ডেনবার্গ হইতে ডাণ্ডিতে নীত হইতেছিলেন। তিনি পথে উল্লিখিত সংবাদ পাইয়া যাত্রীদলকে শান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য উপদেশ প্রেরণ করিলেন।

যাত্রীদল গ্রেপ্তার।

এই সময়ে একটু গোলমাল বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল। যাত্রিগণের মধ্যে কয়েক জন প্রধান ব্যক্তি প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া জোহানেস্‌বার্গে যাইবার জন্য জেদ্ ধরিল। তাহারা অপরাপর যাত্রিগণকে তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিবার জন্য পরামর্শ দিল। তখন মাত্র পঁচিশ জন পুলিশ প্রহরী সম্মুখে দণ্ডায়মান। যাত্রীদল

তাহাদের প্রদত্ত বাধা না শুনিলে হয়ত বজ্রপাত হইবে—'নিরুপদ্রব প্রতিরোধে'র প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে! মিঃ পোলাক্ নিমেষ মধ্যে বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কয়েকজন সঙ্গীসহ বিজ্ঞ নেতার ন্যায় সকলের সম্মুখে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—'নিরুপদ্রব-প্রতিরোধীদের শেষ লক্ষ্য জোহানেস্‌বার্গ যাত্রা নহে—জেল প্রবেশ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য; অতএব আপনারা শান্ত হউন।' মেষপালের ন্যায় যাত্রিসঙ্ঘ তাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে ফিরিল। মিঃ পোলাক্ পুলিশদলের সাহায্যে যাত্রিগণকে ট্রেণে তুলিয়া দিলেন এবং নিজে প্রথম ট্রেণে উঠিলেন।

ট্রেণ চার্লস্‌টাউনে পেঁ ছিলে মিঃ পোলাক্ কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে গ্রেপ্তার হইলেন। এইখানে ধর্ম্মঘটকারিগণকে আট ঘণ্টা কাল হাজতে অনাহারে আটক রাখা হইল। তৃষ্ণায় তাহাদের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল। তাহাদের স্ত্রী-পুত্রগণ (যাত্রার প্রারম্ভে যাহারা চার্লসটাউনে মিঃ ক্যালেনব্যাকের অধীনে ন্যস্ত হইয়াছিল) ষ্টেশনে দেখা করিতে আসিলে পুলিশ প্রহরীরা বাধা দিল। ট্রেণ দুই মিনিটের অধিক ষ্টেশনে দাঁড়াইল না। রমণী ও বালকেরা দূর হইতে গলদশ্রুলোচনে আত্মীয়গণকে জানাইল,—'দেখিও, যেন প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইও না।' ট্রেণ তিনখানি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল। সে বিদায়ের দৃশ্য কি করুণ! এইরূপে নিরুপদ্রব-প্রতিরোধীদলের বিরাট অভিযান পরিসমাপ্ত হইল। 'ইউনিয়ন্' কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিলেন, ভারতীয়গণের দৃঢ়তা, সহনশীলতা ও একাগ্রতা কিরূপ অদম্য!

শ্রীযুক্ত গান্ধী ভক্সরাষ্ট্ আদালতে বিচারককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"নিষিদ্ধ যাত্রীদলকে সঙ্গে লইয়া ট্রান্সভালের সীমায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে আমি অন্তর্বিভাগীয় সচিবকে সময় থাকিতে আমার সঙ্কল্প জানাইয়াছিলাম এবং কোন তারিখে সীমান্ত অতিক্রম করিব, তাহাও ভক্সরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অফিসারকে পূর্ব্বেই জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান ঘটনা, ট্রান্সভালে কোন ব্যক্তি বিশেষের লুক্কায়িত প্রবেশ-চেষ্টার সহিত তুলিত হইতে পারে না। বরং বলিতে পারি যে, ট্রান্সভালে আসিয়া অবধি আমি বরাবরই ব্যক্তি বিশেষের লুক্কায়িত প্রবেশ-চেষ্টায় ও বে-আইনী বসবাস-প্রয়াসে বাধা দিয়া গভরমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছি। এক্ষেত্রে আমি জানিয়া শুনিয়া বে-আইনী কাজ করিয়াছি। আমি জানিতাম যে, ইহাতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা ; এমন কি আমার সহকর্ম্মিগণকেও প্রভূত ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে। ইহাও জানি যে, আমরা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ না করিলে গভর্ণরের তথা 'ইউনিয়ন্'-বাসিগণের বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হইবে না। আমি আইন ভঙ্গ করিয়াছি বটে ; কিন্তু এখানকার আইন-মান্যকারী প্রকৃতিস্থ নাগরিকের অধিকার দাবী করিতেছি।"

বিচারক শ্রীযুক্ত গান্ধীকে পনর মাস কারাবাসে পাঠাইলেন। তাঁহার সহযাত্রী শত শত ভারতীয় কঠোর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায়, ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে শ্রমিক-সম্প্রদায়ের পক্ষসমর্থনকারিগণ তুমুল আন্দোলন তুলিলেন। ডার্ব্বাণে, জোহানেস্‌বার্গে ও দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য সহরে ভারতীয় অধিবাসিগণের বিরাট সভায় 'ইউনিয়ন্' কর্তৃপক্ষের নিন্দাবাদ তীব্র ভাষায় প্রচারিত হইতে লাগিল। কয়লা-খনির

শ্রমিকদলের দেখাদেখি নেটালের ইক্ষুক্ষেত্রসমূহে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ ছাড়িতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য ক্ষেত্রাধিকারিগণ পশুবল প্রয়োগ করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না। ধর্ম্মঘটকারিগণের কয়েকজনকে তাঁহারা বন্য পশুর মত গুলি করিয়া মারিলেন। অনেকে গুলির আঘাতে আহত হইল।

উল্লিখিত বীভৎস সংবাদ ভারতে পেঁছিলে, এদেশবাসী জনসাধারণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। ভারতের তৎকালীন বিচক্ষণ বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবাসীর হৃদয়কন্দরে মর্ম্মন্তুদ বেদনার আক্ষেপ অনুভব করিয়া ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ২৪শে নভেম্বর, মাদ্রাজে 'মহাজন সভা'র প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে, নিম্নলিখিত মর্ম্মে সহানুভূতির স্নিগ্ধ ধারা ঢালিয়া দিলেন,—

লর্ড হার্ডিঞ্জের মহাপ্রাণতা।

"সম্প্রতি দক্ষিণ-আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়গণ তাঁহাদের ধারণামতে অন্যায় ও বিদ্বেষজনক আইনসমূহের বিরুদ্ধে নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ ঘোষণা করিয়া প্রতিকার ব্যবস্থা নিজেদের হাতেই লইয়াছেন। আমরা দূরে দাঁড়াইয়া শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতা সন্দর্শন করিলেও উল্লিখিত আইনসমূহের সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত একমত না হইয়া থাকিতে পারি না।

"তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই আইন ভঙ্গ করিয়াছেন। উহার ফলে তাঁহারা দণ্ডিত হইবেন জানিতেন; তথাপি সম্পূর্ণ সাহসে ও ধৈর্য্যবলে তাহা সহ্য করিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন। এই ব্যাপারে সারা ভারতের গভীর ও জ্বলন্ত সহানুভূতি তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। শুধু ভারতের নহে—আমার ন্যায় যাঁহারা ভারতবাসী না হইলেও ভারতীয়গণের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন—তাঁহাদেরও হৃদয়তন্ত্রে সমবেদনায় করুণ ঝঙ্কার উঠিয়াছে।

"অধুনা কিন্তু অবস্থা বড় সঙ্গীণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা এই অনুযোগ বহুলভাবে প্রচারিত হইতে দেখিয়াছি যে, নিরুপদ্রব-প্রতিরোধী দলের প্রতি এমন আচরণ করা হইয়াছে, যাহা কোন সভ্য রাজ্যে এক মুহূর্ত্ত সহ্য করা চলে না।

"দক্ষিণ আফ্রিকার দায়িত্বসম্পন্ন গভরমেণ্ট ঐ সকল অনুযোগের সত্যতা স্পষ্টভাষায় অস্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের অস্বীকারের মধ্যেও এমন সব স্বীকারোক্তি আছে, যাহা শুনিয়া আমার মনে হয় যে, 'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্ট কোন কোন বিষয়ে বুদ্ধিমানের মত বিচার করেন নাই। বর্ত্তমানে প্রকৃত অবস্থা এই। এখন দক্ষিণ আফ্রিকার গভরমেণ্ট যদি ভারতবাসীর চক্ষে তথা পৃথিবীর সমক্ষে আপনাদের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিতে চান, তাহা হইলে নির্ভীক সদস্যগণের সমবায়ে গঠিত কমিটীর দ্বারা অপক্ষপাত তদন্তের ব্যবস্থা করাই একমাত্র পন্থা। তদন্ত-কমিটীতে ভারতীয়গণের প্রতিনিধিও থাকা চাই। কমিটীর সদস্যগণ অনুযোগসমূহের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করিবেন। অদ্য প্রাতে যে সরকারী ইস্তাহার (Communique) প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে আপনারা দেখিয়াছেন যে, আমি ভারত-সচিবের নিকট ঐ অভিমত জোরপূর্ব্বক জানাইতে ইতস্তত করি নাই। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন যে, ভারত গভরমেণ্ট এই প্রস্তাব বৃটিশ গভরমেণ্টের নিকট নির্ব্বন্ধ সহকারে উত্থাপন করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।"

উদারহৃদয় লর্ড হার্ডিঞ্জের এই সমবেদনাপূর্ণ নির্ভীক বক্তৃতায় তাঁহার মহদন্তঃকরণের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

পাদরি-লাটের উদার উক্তি।

তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনার্থ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর 'ভারতীয় দক্ষিণ-আফ্রিকা লিগে'র উদ্যোগে মাদ্রাজে এক সাধারণ সভা আহূত হয়। মাদ্রাজের লর্ড বিশপ ঐ সভার সভাপতিরূপে বক্তৃতার উপসংহারে বলেন,—

"উৎপীড়নের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতে আমি বাল্যকাল হইতেই শিখিয়াছি। উৎপীড়িত ব্যক্তি যে দেশের বা যে জাতির হউক, তাহার পক্ষে দাঁড়ান আমি পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। আমি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরূপে কয়েকটী কথা কহিব। যাহারা আপনাদিগকে যিশুখ্রীষ্টের শিষ্য বা পদানুবর্ত্তী বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারাই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণের উপর নিষ্ঠুর অন্যায়াচরণ করিতেছে শুনিয়া, আমার হৃদয়ে অধিকতর ঘৃণা জন্মিয়াছে। উৎপীড়ন সর্ব্বত্র ঘৃণার্হ। বিশেষতঃ যখন কোন খ্রীষ্টান আপনার ধর্ম্মনীতি অমান্য করিয়া—প্রভু খ্রীষ্টের প্রদত্ত শিক্ষা ও আদর্শ ভুলিয়া—অপরকে উৎপীড়ন করে, তখন তাহা দ্বিগুণ দোষাবহ। হৃদয়ে দারুণ ব্যথা অনুভব করিয়াও আমি স্পষ্ট স্বীকার করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত গান্ধীকে যাহারা জেলে পাঠাইয়াছে তাহারা আপনাদিগকে খ্রীষ্টান বলিয়া পরিচয় দিলেও তাহাদের তুলনায় আমার চক্ষে শ্রীযুক্ত গান্ধীই ক্রুশ-বিদ্ধ পরিত্রাতার যোগ্যতর প্রতিনিধি; কারণ তিনি ন্যায় ও কৃপা লাভের নিমিত্ত ধৈর্য্যবলে উৎপীড়ন সহ্য করিতেছেন।"

ইহার উপর টীকা নিষ্প্রয়োজন।

অন্যদিকে লর্ড এমথিলের নেতৃত্বে লণ্ডনের 'দক্ষিণ আফ্রিকা বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ কমিটী' নিরুপদ্রব-প্রতিরোধীদলের নির্যাতন কাহিনী নিয়ত বিলাতে প্রচার করিতেছিলেন। ফলে, বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না; তাঁহাদের নির্দ্দেশমতে 'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্ট দক্ষিণ-আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়গণের অনুযোগ সম্বন্ধে তদন্তের নিমিত্ত এক কমিশন নিয়োগ করিতে স্বীকৃত হইলেন। পরে স্যার উইলিয়ম্ সলোমণের সভাপতিত্বে সঙ্কলিত কমিশন গঠিত হইল বটে, কিন্তু উহার সদস্য নির্ব্বাচন

ভারতীয়গণের পছন্দমত না হওয়ায়, তাঁহারা কমিশনকে আদৌ আমল দিবেন না, স্থির করিলেন।

এই সময়ে দয়ার অবতার যিশু খৃষ্টের একনিষ্ঠ সেবক ধর্ম্মপ্রাণ রেভারেণ্ড মিঃ এণ্ড্রুজ ও রেভারেণ্ড মিঃ পিয়ার্সন্ দক্ষিণ আফ্রিকায় উপনীত হইয়া বিপন্ন ভারতীয়দলের দুর্দ্দশা মোচনে স্বতঃপরতঃ সচেষ্ট হইলেন। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আবার শান্তি-মন্দাকিনী নামিয়া আসিল।

পরিসমাপ্তি।

সলোমণ কমিশনের সদস্যগণ ভারতীয়দলের সম্পূর্ণ অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। ফলে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে 'ইউনিয়ন্' গভরমেণ্ট 'ইণ্ডিয়ান্ রিলিফ্ এক্ট' বা 'ভারতীয় মুক্তি আইন' বিধিবদ্ধ করিয়া সকল মনোমালিন্য মুছিয়া দিলেন। মুণ্ডকর রহিত হইল; 'ইমিগ্রেশন্' আইনে জাতিগত বৈষম্য উঠিয়া গেল; হিন্দু-মুসলমানের বিবাহ বৈধ বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ স্বীকার করিলেন; ভারতীয়গণের বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার ন্যায়সঙ্গত আইনবলে বজায় রাখিবার ব্যবস্থা হইল। ইহা ছাড়া জেনারেল স্মাট্স শ্রীযুক্ত গান্ধীকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, ভারতীয়গণের অসুবিধাজনক অবশিষ্ট অনুযোগগুলির প্রতিকার ব্যবস্থা তিনি ক্রমশঃ করিবেন। শ্রীযুক্ত গান্ধী তখন কর্ত্তব্য শেষ হইল বুঝিয়া, নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের পরিসমাপ্তি ঘোষণা-পূর্ব্বক দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বিদায় গ্রহণে সমুদ্যত হইলেন।

গত আট বৎসর কাল নিরবচ্ছিন্ন নির্যাতন অকাতরে সহ্য করিয়া, ত্যাগবীর গান্ধী দেশবাসীকে যে মহৎ শিক্ষা দিলেন—

জগতে যে উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিলেন—তাহার তুলনা ইতিহাসে দুর্লভ। তাঁহার প্রদর্শিত আত্ম-নির্ভরতার নবীন আলোক ছটায় দিগ্বলয় উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তাঁহার আদর্শে ধনী দরিদ্র, ইতর ভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সকল ভারতবাসীর হৃদয়ে পরতে পরতে স্বজাতি-প্রীতির মধুর রাগিণী মোহন ছন্দে বাজিতেছিল,—

"ওমা, আমার যে ভাই তারা সবাই—
তোমার রাখাল তোমার চাষী।"

কর্ম্মবীর গান্ধী বুঝিয়াছিলেন, ভারতীয়গণের প্রাণে এই দেশাত্মবোধ জাগাইতে না পারিলে তাহাদের পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকায় তিষ্ঠান দুঃসাধ্য হইবে। তাই তিনি সহস্র বিপদ শিরে লইয়া নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের অগ্নি-পরীক্ষায় প্রবেশ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শত শত অনুচর সে প্রচণ্ড অনলে ঝাঁপ দিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে প্রাণত্যাগ করে নাই, এরূপ নহে। কুমারী ভালিয়াম্মা নাম্নী এক বীরবালা নিরুপদ্রব-প্রতিরোধে যোগ দিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গান্ধী বলেন,—

"সরল বিশ্বাসবতী বালিকা জানিত না যে, 'নিরুপদ্রব প্রতিরোধ' কি? উহার ফলে সমাজের কি কল্যাণ হইবে, তাহাও সে অবগত ছিল না। তবে, আত্মীয়-স্বজনের জন্য সে অসীম উৎসাহে মাতিয়াছিল—জেলে গিয়াছিল। জেল হইতে যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বেচারা কয়েকদিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল।"

হরবৎ সিং নামে জনৈক দীর্ঘকায় বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী নিরুপদ্রব-প্রতিরোধীদলের সহিত মিশিয়া জেলে গিয়াছিল। তখন তাহার বয়স পঁচাত্তর বৎসর। শ্রীযুক্ত গান্ধী তাহাকে জিজ্ঞাসা

করিলেন,—"তুমি আসিয়াছিলে কেন?" বৃদ্ধের দুই চক্ষু সহসা জ্বলিয়া উঠিল। সে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সগর্ব্বে কহিল—"তা'তে কি আসে যায়? আপনি কি জন্য লড়িতেছেন, আমি জানি। আপনাকে মুণ্ডকর দিতে হয় না—আমার ন্যায় চুক্তিমুক্ত শ্রমিকগণকেই উহা দিতে হয়। আমার পক্ষে ইহাপেক্ষা গৌরবের মৃত্যু আর কি আছে?" এই নির্ভীক বৃদ্ধ ডার্ব্বাণ কারাগারে প্রাণত্যাগ করে।

নাগাপ্পান নামে আর একজন তামিল যুবক জেল হইতে বাহির হইয়াই পরলোক প্রয়াণ করিয়াছিল। স্বজাতির মঙ্গলকামী অদ্ভুতকর্ম্মা নারায়ণ স্বামীর আত্মোৎসর্গ কাহিনী পাঠক পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। এই সকল অমূল্য জীবনের বিনিময়ে দক্ষিণ-আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়গণ শেষে মুক্তির দ্বারে দাঁড়াইলেন বটে; কিন্তু এ সকল শোকের স্মৃতি কি কখনও মুছিবে!

শ্রীযুক্ত গান্ধী নিজেও বড় কম নির্য্যাতন ভোগ করেন নাই। তিনি তিনবার জেলে গিয়াছিলেন। প্রথমবার গ্রেপ্তার হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি সংবাদ পাইলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটী মৃত্যু শয্যায় শায়িত; যদি শেষ দেখা দেখিতে চান ত এখনই ফিনিক্স পল্লী অভিমুখে রওনা হউন। দৃঢ়ব্রত গান্ধী অবিচলিত চিত্তে কহিলেন,—'পুত্রের জীবন রক্ষার ভার শ্রীভগবানের করে অর্পণ করিয়া আমি জোহানেস্‌বার্গ চলিলাম; কারণ পুত্র অপেক্ষা আমার জাতি

কর্ত্তব্যমুখে পত্নী-পুত্র।

মহাত্মা গান্ধী — ৮০ পৃষ্ঠা।



কুমারী ভালিয়াম্মা।



হরবৎ সিং।

বড়। জোহানেস্‌বার্গে স্বজাতীয়গণ আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন।” করুণাময় ভগবান তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়বার জেলে অবস্থানকালে তিনি তারে সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার পত্নীর জীবনের আশা প্রায় নাই। জেল পরিদর্শনকারী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন,—“আপনি জরিমানা দিয়া মুক্তিলাভ করুন, কারণ এ সময়ে পত্নীর পার্শ্বে বসিয়া সেবা-শুশ্রূষা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।” স্থিরপ্রতিজ্ঞ গান্ধী বিনীতভাবে অসম্মতি জানাইয়া কহিলেন,—“আমি হাল ছাড়িলে সব বান্‌চাল হইয়া যাইবে।”

পরে সরকারী আদেশে মুক্তিলাভ করিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধী আবার গ্রেপ্তার হইলেন। এবার ইচ্ছা করিলে তিনি মামলা মুলতুবি রাখিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা করিলেন না। ট্রান্সভাল গভরমেণ্ট তাঁহাকে জেলে পাঠাইতে সমুৎসুক জানিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ অন্তিম-শয্যাশায়িতা পত্নীর নিকট বিদায় লইলেন। সে মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য স্মরণেও চক্ষু ফাটিয়া জল আইসে। সুখের বিষয় পতিপ্রাণা পত্নী বিধাতার করুণায় সে যাত্রা রক্ষা পান।

শ্রীযুক্ত গান্ধীর জ্যেষ্ঠপুত্র নিরুপদ্রব-প্রতিরোধীরূপে কয়েক মাস জেলে গিয়াছিলেন। কারাগারের কঠোরতায় অভ্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে কর্ম্মবীর গান্ধী অপর দুইটী শিশু সন্তানকেও আন্দোলনে টানিয়া লইয়াছিলেন। পাঠক, মনে করিবেন না, তিনি স্ত্রী-পুত্রের প্রতি নিতান্ত কঠোর। তাঁহার তুল্য

পুত্রবৎসল পিতা, পত্নীপ্রিয় ভর্ত্তা, সংসারে কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়? তিনি একদিকে যেমন কুলিশ-কঠোর, অন্য দিকে তেমনিই পরাগ-পেলব।

অতঃপর শ্রীযুক্ত গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ইংলণ্ডে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন; কারণ মহামতি গোখলে তখন বিলাতে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভারত-রত্ন গোখলের প্রতি শ্রীযুক্ত গান্ধীর শ্রদ্ধা চিরকালই অটল। তিনি তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিতেন—অভিন্নহৃদয় বন্ধুর ন্যায় ভালবাসিতেন। এমন শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ্ শেষশয্যায় শায়িত শুনিয়া মহাপ্রাণ গান্ধী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেম না। তিনি সস্ত্রীক ইংলণ্ড যাত্রা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কৃতজ্ঞ ভারতীয়গণ জোহানেস্‌বার্গে এক সভা আহ্বান করিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধীকে বিদায়-অভিনন্দনে সম্বর্দ্ধিত করিলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন,—

শেষ বিদায়।

"আমাদের শাস্ত্রের আদেশ এই যে, কুত্রাপি নিজের সুখ্যাতি শুনিলে সে স্থান হইতে তৎক্ষণাৎ পলাইতে হয়; তাহা না পারিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়। ঐ দুইটী পন্থা যাঁহারা অবলম্বন করিতে অক্ষম, তাঁহারা সকল সুখ্যাতি সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানে সমর্পণ করিবেন। আশা করি, আজ আমি ও আমার পত্নী আপনাদের কথিত তাবৎ সুখ্যাতি সেই সারাৎসারের চরণে অঞ্জলি দিতে পারিব।"

ইহার পর তিনি নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের সমর্থনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির গুণপণা বিশদভাবে বিবৃত করিয়া নিজের দীনতা অকুণ্ঠ ভাষায় জ্ঞাপন করিলেন। ফলে, শ্রোতৃবর্গ ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

শ্রীযুক্ত গান্ধী লণ্ডনে উপনীত হইয়া দেখিলেন, মহামতি গোখলে সে যাত্রা মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়াছেন বটে ; কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই সময়ে (৪ঠা আগষ্ট, ১৯১৪) জর্ম্মণীর সহিত ইংরাজের তুমুল যুদ্ধ ঘোষিত হইল। শ্রীযুক্ত গান্ধী কাল বিলম্ব না করিয়া লণ্ডনে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকদল (Indian Volunteer Ambulance Corps) গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সস্ত্রীক ঐ দলে নাম লিখাইলেন ; কিন্তু তাঁহার শরীর আর বহিল না। কঠোর কারাবাসে, নিরবচ্ছিন্ন শ্রমশীলতায় ও বহু নৈষ্ঠিক উপবাসে তাঁহার রুগ্ন শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। তিনি বন্ধুবর্গের সনির্ব্বন্ধ পরামর্শে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বিলাতে কর্ম্মানুষ্ঠান।

শ্রীযুক্ত গান্ধী আপোলো বন্দরে অবতীর্ণ হওয়া অবধি ভারতের নানাস্থানে তাঁহার বিপুল সম্বর্দ্ধনার সমারোহ পড়িয়া গেল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে নববর্ষের উপাধি তালিকায় ভারত গভরমেণ্ট মহাত্মা গান্ধীকে ‘কৈশার-ই-হিন্দ’ স্বর্ণপদক দানে সম্মানিত করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সময়ে তাঁহার প্রধান সহায় মহামতি গোখলে ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া কোন অনির্দ্দেশ্য ধামে চলিয়া গেলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ২১শে এপ্রিল মাদ্রাজে সম্বর্দ্ধনা-সভায় শ্রীযুক্ত গান্ধী এই মর্ম্মে বলেন’—

কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ।

“আপনারা বলিয়াছেন যে, দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয় নরনারী

গণকে আমিই উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলাম। এ সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া আমি মানিয়া লইতে পারি না। সেখানকার সরলচিত্ত, একান্ত বিশ্বাসী ব্যক্তিগণই আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তাহারা সামান্য-মাত্র পুরস্কারের প্রত্যাশা করে নাই। তাহাদের মহান্ আত্মত্যাগ ও অদ্ভুত ভগবদ্‌বিশ্বাস আমাকে আপন সঙ্কল্পে অটল রাখিয়াছিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি ও আমার পত্নী কর্ম্মের অত্যুজ্জ্বল আলোকে পড়িয়া লোকের দৃষ্টিপথে দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছি; কাজেই আপনারা আমাদের অনুষ্ঠিত সামান্য কার্য্যকে অতি বড় করিয়া তুলিয়াছেন।

"আমি মুহূর্ত্ত-মাত্র বিশ্বাস করি না যে, আমরা তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলাম; পরন্তু তাহারাই আমাদিগকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। আমরা শাসক-সম্প্রদায় ও পরিত্রাণ-প্রার্থী, এই উভয় দলের মধ্যে দাঁড়াইয়া দোভাষীর কাজ করিয়াছিলাম। আমরা এই উভয় দলের সংযোজক ছাড়া কিছুই ছিলাম না।"

এ যুগে এমন স্পষ্ট ভাষায় কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিতে কয়জন নেতা সক্ষম?

হাওড়া ষ্টেশনে অপূর্ব্ব দৃশ্য।

ভারতের অবস্থা অন্ততঃ এক বৎসর কাল স্বচক্ষে সন্দর্শন না করিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধীকে এদেশের সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে, মহামতি গোখলে নিষেধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি ভারতের নানা জনবহুল সহরে পরিভ্রমণ করিয়া দেশবাসীর গতি-প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই উপলক্ষে তিনি প্রায়ই তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ীতে পরিভ্রমণ করিতেন। কীর্ত্তিমান গান্ধী কলিকাতায় আসিবেন শুনিয়া বাঙ্গালার নেতৃগণ তাঁহার

সাদর সম্বৰ্দ্ধনার নিমিত্ত উৎসাহিত হইলেন। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট দিনে দলবলসহ হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিবেন, সাগ্রহে বরণ করিয়া কলিকাতায় আনিবেন—এইরূপ সঙ্কল্প স্থির হইল। দেখিতে দেখিতে নির্দ্দিষ্ট দিন আসিল, কলিকাতার জননায়কগণ হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেণের অপেক্ষায় মুহুর্মুহু উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাষ্পীয় রথ উদরগহ্বরে শতশত নরনারী লইয়া শীঘ্রই দেখা দিল। নেতৃগণ প্রথম শ্রেণীর কামরা অভিমুখে ছুটিলেন; কিন্তু শ্রীযুক্ত গান্ধী কোথায়? প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী. অবশেষে মধ্যম শ্রেণীর সকল গাড়ী তাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত গান্ধীকে কোথাও পাওয়া গেল না! তবে কি তিনি আসেন নাই? সকলে একরূপ হতাশ হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে দেখা গেল, সামান্য পরিচ্ছদধারী শ্রীযুক্ত গান্ধী নগ্নপদে একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে অবতরণ করিতেছেন। সকলে অবাক্! এই কি সেই বিশ্রুতকীর্ত্তি মহাত্মা গান্ধী! যাহাহউক সম্বৰ্দ্ধনার ক্রটি হইল না। শ্রীযুক্ত গান্ধী সাদরে কলিকাতায় নীত হইলেন।

এদেশে তৃতীয়শ্রেণীর রেলযাত্রীদের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে তিনি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর রাঁচি হইতে যে বর্ণনা-পত্র প্রচার করেন, তাহা একদিকে যেমন দুঃস্থপ্রীতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অন্যদিকে তেমনই সূক্ষ্মদৃষ্টির স্পষ্ট পরিচায়ক।*

---

* বর্ণনা-পত্রের মর্ম্মানুবাদ পরিশিষ্টে দেখুন।

বিহার—ত্রিহুত অঞ্চলে অনেক শ্বেতাঙ্গ কুঠিয়াল বহুদিন যাবৎ প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহারা পূর্ব্বে কতক খাসে কতক বা প্রজাদের দ্বারা নীল আবাদ করাইয়া তাহা কুঠির কারখানায় পচাইয়া নীল রঙ প্রস্তুত করত ইউরোপে চালান দিতেন। এই সূত্রে দেশীয় জমিদারগণের নিকট দু'দশখানি গ্রাম তাঁহারা কুঠির নামে ইজারা লইয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকারভুক্ত স্থানের প্রজা-গণকে সাধারণতঃ 'তিন কাঠিয়া' প্রথানুসারে বিঘাপ্রতি তিন কাঠা হারে ভূমি নীল আবাদের জন্য পৃথক রাখিতে হইত। বলা বাহুল্য, কুঠিয়াল সাহেবদের কর্ম্মচারিগণ প্রজার ভাল জমি-খানিই নীলের জন্য বাছিয়া দিতে ছাড়িতেন না। ইহার ফলে, অনেক সময়ে রায়তেরা ভিটা-জমীতে নীল আবাদ করিতে বাধ্য হইত; তাহাতে আবরু নষ্ট হয় বলিয়া তাহারা আপত্তি তুলিত। তাহাদের নিকট 'বেগার' ও 'জরিমানা' আদায় করা আইনসঙ্গত বলিয়া অনেক কুঠিয়াল মনে করিতেন। তা'ছাড়া 'অবোয়াব' 'সরেবেশি' 'হিসাবানা' 'মাথট্' প্রভৃতি নানা রূপে 'বাজে আদায়' সংগ্রহ করিতেও তাঁহারা বিরত ছিলেন না। ফলে, প্রজাদলের সহিত কুঠিয়াল সাহেবদের মনোমালিন্য বরাবরই চলিয়া আসিতে-ছিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ত্রিহুত—মতিহারী অঞ্চলে দরিদ্র প্রজাদলের সহিত কয়েকটী কুঠির সাহেবগণের ঘোরতর হাঙ্গামা বাধে। সেই হাঙ্গামার তদন্ত ভার তৎকালীন কৃষি-ডিরেক্টর, সদাশয় সিভিলিয়ান্ মিঃ গুরলের উপর অর্পিত হয়। গুরলে

বিহারে নীলকর।

সাহেবের রিপোর্ট কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেন নাই। বলা আবশ্যক, শ্বেতাঙ্গ কুঠিয়ালগণের ন্যায় কোন কোন দেশীয় তালুকদারও প্রজাগণের নিকট নানারূপ বে আইনী 'বাজে আদায়' সংগ্রহ করিতেন।

জর্ম্মণীর কৃত্রিম নীল আবিষ্কারের পর এদেশে নীলের বাজার একেবারে পড়িয়া যায়। ১৯০৮-১০ খৃষ্টাব্দ হইতে অনেক কুঠিয়াল নীলের কারবার বন্ধ করিয়া দেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা প্রজাগণকে নীলচাষের বাধ্যতা হইতে রেহাই দিবেন বলিয়া, তৎপরিবর্ত্তে মোটা টাকা সেলামী (তাওয়ান্) আদায় করিতে অথবা পাকা জমার নিরীখ বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে করভারপ্রপীড়িত রায়তেরা ঘোরতর আপত্তি তুলে। অন্যদিকে সরকারী সেট্‌লমেণ্ট বা জরিপের ফলে প্রজাদলের সহিত তাঁহাদের জমি-জমা সংক্রান্ত মামলা বহুলভাবে বাধিয়া উঠে। কাজেই ত্রিহুতের দীন প্রজাগণ বিপাকে পড়িয়া 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' ডাক ছাড়ে।

কংগ্রেসে প্রস্তাব।

দীনের আর্ত্তনাদ একদিন দীনবন্ধুর কর্ণে নিশ্চয়ই পেঁাছে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে (Subjects Committee) এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব পরিগৃহীত হয় যে, ত্রিহুতের প্রজাসাধারণের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্তের নিমিত্ত সরকারী ও বে-সরকারী সদস্যগণের সমবায়ে এক কমিটী গঠনের জন্য গভরমেণ্টকে অনুরোধ করা হউক। বিহারের প্রতিনিধিগণ

শ্রীযুক্ত গান্ধীকে ঐ প্রস্তাব কংগ্রেসে উত্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। তিনি কিন্তু তাহাতে সম্মত হন নাই ; পরন্তু বলেন,—"আমি ঐ বিষয়ে কিছুই অবগত নহি। তবে, যথাবশ্যক তথ্য সংগ্রহ করিয়া যদি প্রয়োজনীয় মনে করি, তবে উহা পরে কংগ্রেসে পেশ করিব।"

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে শ্রীযুক্ত গান্ধী ত্রিহুতের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য মজঃফরপুর রওনা হন। মজঃফরপুর পোঁছিয়া তিনি 'বেহার প্লাণ্টার্স এসোসিয়েশনে'র সেক্রেটারি মিঃ উইল্‌সন্ ও ত্রিহুত বিভাগের কমিশনার মিঃ মর্শেডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা উভয়েই শ্রীযুক্ত গান্ধীকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দেন। কমিশনার সাহেব বলেন.—"নীলকর সাহেবদের সহিত রায়তগণের সম্পর্ক লইয়া অনেক আলোচনা গভরমেণ্ট বহুদিন যাবৎ করিতেছেন। আমরা এখন চম্পারণের সমস্যা লইয়াই সবিশেষ ব্যস্ত আছি। এরূপ স্থলে একজন বাহিরের লোক আসিয়া সমস্যার মধ্যে দাঁড়াইলে আমাদের কার্য্যে হাঙ্গামা বাধিবে। এ কার্য্যে আপনাকে আহ্বান করিল কে ?" প্রত্যুত্তরে শ্রীযুক্ত গান্ধী বলিলেন,—"আমি দেশের লোকের আহ্বানে আসিয়াছি। আপনারা আমার কার্য্যে সাহায্য করুন, আমিও আপনাদের কার্য্যে সাহায্য করিব।" কমিশনার সাহেব তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন।

শ্রীযুক্ত গান্ধী কিন্তু কাজে নামিয়া পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র

নহেন। তিনি ১৫ই এপ্রিল মজঃফরপুর হইতে মতিহারী রওনা হন। পরদিন চম্পারণের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হেকক্ বিভাগীয় কমিশনারের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীযুক্ত গান্ধীর উপর ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারামতে এই মর্ম্মে নোটীশ জারি করেন যে, তিনি ঐ জেলায় অবস্থান করিলে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা—এমন কি লোকের প্রাণহানি পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে; অতএব পরবর্ত্তী ট্রেণে তিনি যেন চম্পারণ জেলা ছাড়িয়া চলিয়া যান।

বহিষ্কারের আদেশ।

প্রত্যুত্তরে দৃঢ়ব্রত গান্ধী, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানাইলেন যে, সাধারণের কার্য্যে যে দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অনুরোধে তাঁহাকে চম্পারণ জেলায় থাকিতেই হইবে—জেলা ছাড়িয়া যাইতে তিনি পারিবেন না; তবে কর্ত্তৃপক্ষ যদি ঐ অবাধ্যতার জন্য দণ্ড বিধান করেন, তাহা তিনি বহন করিবেন।

কর্ম্মবীর গান্ধী আদালতে অভিযুক্ত হইলেন। আসামীর কাঠরায় দাঁড়াইতে তিনি অনভ্যস্ত নহেন। আত্মপক্ষ সমর্থনের নিমিত্ত তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে এজাহার দিলেন,—

"আদালতের অনুমতি লইয়া আমি স্বল্প কথায় বুঝাইয়া দিতে চাই যে, কেন আমি ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারামতে প্রদত্ত সরকারী আদেশ বাহ্যতঃ অমান্য করিয়া ঘোরতর দায়িত্ব লইয়াছি। আমার মতে, ব্যাপারটী আমার সহিত সরকারী কর্ম্মচারিগণের মতভেদ লইয়া ঘটিয়াছে। আমি মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য এবং স্বজাতির সেবার নিমিত্ত এ প্রদেশে আসিয়াছি। আমি এখানে আসিয়া রায়তগণকে সাহায্য করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। রায়তেরা বলে যে,

নীলকর সাহেবেরা তাহাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করেন না। তাহাদের আহ্বানে আমি এখানে আসিয়াছি। সমস্ত সমস্যাটী আগাগোড়া না জানিয়া, আমি তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারি না। তজ্জন্য সমস্ত ব্যাপারটী জানিবার উদ্দেশ্যে—এমন কি সম্ভব হইলে, সরকারী কর্ম্মচারিগণের ও নীলকর সাহেবদের সাহায্যে, পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করিবার আশায়—আমি এ অঞ্চলে আসিয়াছি। ইহা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য আমার নাই। আমি এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, আমি এখানে আসিয়াছি বলিয়াই শান্তিভঙ্গ হইবে অথবা লোকের জীবনহানি ঘটিবে। এরূপ ব্যাপারে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। সরকারী কর্ম্মচারীরা কিন্তু অন্যরূপ বুঝিয়াছেন। আমি তাঁহাদের অসুবিধার কথা জানি এবং ইহাও স্বীকার করি যে, তাঁহারা কেবল অপরের প্রদত্ত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করেন। আইনমান্যকারী নাগরিকরূপে সরকারী আদেশ মানিয়া চলাই আমার কর্ত্তব্য; কিন্তু যাহাদের জন্য আমি এখানে আসিয়াছি, তাহাদের প্রতি আমার কর্ত্তব্যবুদ্ধি অব্যাহত রাখিয়া আমি সরকারী আদেশ মানিতে পারি নাই। আমার মতে, এখন ইহাদের মধ্যে থাকিতে পারিলেই, আমি ঠিক কাজ করিতে পারিব। সুতরাং আমি স্বেচ্ছায় চলিয়া যাইতে পারি নাই। কর্ত্তব্যের এই কঠোর সমস্যায় আমাকে এখান হইতে সরাইবার ভার সরকারী কর্ম্মচারিগণের ঘাড়ে ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া, আমার আর উপায়ান্তর ছিল না। আমি বেশ জানি, ভারতে আমার মত যাঁহারা জনসাধারণের হইয়া কাজ করেন, তাঁহাদের পক্ষে কোন কার্য্যে আদর্শ স্থাপন করিতে হইলে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। অধুনা আমরা যে জটিল সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, এরূপ ক্ষেত্রে যাঁহার আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, তিনি ঠিক আমারই মত আচরণ করিবেন, অর্থাৎ আদেশ

অমান্য করার দরুণ দণ্ড, বিনা প্রতিবাদে মাথা পাতিয়া লইবেন। আমি দণ্ড লাঘবের নিমিত্ত কৈফিয়ৎ দিতেছি না; তবে এইটুকু জানাইতে চাই যে, আমি রাজশক্তির প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া আইন অমান্য করি নাই—অন্তরের মধ্যে বিবেকের বাণী শুনিয়াই এই কার্য্য করিয়াছি।"

এই ব্যাপারে ভারতের সর্ব্বত্র আশঙ্কার সাড়া পড়িয়া গেল। মিঃ পোলাক্ ঝটিতি বাঁকিপুরে পৌঁছিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে মিঃ হাসান ইমাম, শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিং, মিঃ মজহরল হক্ প্রমুখ বেহারী নেতৃগণ, শ্রীযুক্ত গান্ধীর সাহায্যার্থ অবিলম্বে মতিহারী রওনা হইলেন। চারিদিকে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। ভারতের নানা স্থান হইতে বড়লাটের নিকট প্রতিকার প্রার্থনায় অজস্র টেলিগ্রাম আসিতে লাগিল। বাসুকির শিরঃসঞ্চালন কালে ধরিত্রী যেরূপ সহসা টলমল করিয়া উঠে, ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ সেইরূপ অকস্মাৎ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

বিহার গভরমেণ্ট অবশেষে বুদ্ধিমানের মত ব্যবস্থা করিলেন। সরকারী আদেশে মামলা প্রত্যাহৃত হইল—মহাপ্রাণ গান্ধী খালাস পাইলেন; পরন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে তদন্ত কার্য্যে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন।

তদন্ত-কমিশন।

শ্রীযুক্ত গান্ধী গ্রামে গ্রামে গিয়া শত শত রায়তের মুখে তাহাদের অভিযোগ-কাহিনী অবগত হইতে লাগিলেন। শেষে বিহারের কর্ত্তৃপক্ষ ভারত গভরমেণ্টের ইঙ্গিতে ঐ সম্বন্ধে আমূল তদন্তের নিমিত্ত মধ্য-প্রদেশের কমিশনার মিঃ শ্লাইর নেতৃত্বে পাঁচজন অবস্থাভিজ্ঞ সদস্যের সমবায়ে এক কমিশন নিয়োগ করিলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধী সেই কমিশনের সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। কমিশনের সদস্য-

গণ বেথিয়া, মতিহারী প্রভৃতি নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া প্রজাসাধারণের ও নীলকর সাহেবদলের সাক্ষ্য-সাবুদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নীলকর সাহেবদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীযুক্ত গান্ধীর বিরুদ্ধে সংবাদ-পত্রে অযথা লেখনী চালনা করিতে বিরত হন নাই। কর্ম্মবীর গান্ধী কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পূর্ণোদ্যমে প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনে ব্রতী হইলেন। তাঁহার চেষ্টায় প্রজাপক্ষের বহু দুঃখ-কাহিনী সাক্ষিগণের মুখে প্রকাশিত হইল। শেষে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গভরমেণ্ট 'চম্পারণ কৃষি আইন' পাশ করিয়া কৃষক সম্প্রদায়ের দুর্দ্দশা কতকটা মিটাইলেন। ফলে 'তিন কাঠিয়া' প্রথা তিরোহিত হইল।

পুরুষসিংহ গান্ধী এই ব্যাপারে যে দৃঢ়তা, সংযম ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা একমাত্র তাঁহাতেই সম্ভব।

চম্পারণ হাঙ্গামার সময় মিঃ আরুইন নামে জনৈক কুঠিয়াল সাহেব, শ্রীযুক্ত গান্ধীর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বিদ্রূপপূর্ণ এক পত্র 'পায়োনিয়ার' পত্রে প্রকাশ করেন। প্রত্যুত্তরে শ্রীযুক্ত গান্ধী লিখেন,—

দেশীয় পরিচ্ছদের আদর।

"পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাধুর্য্য বিশেষভাবে অনুশীলন করিয়া আমি আমার জাতীয় সাজ-সজ্জার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছি। আমি নিজে বস্ত্র বয়ন ও কৃষিকর্ম্ম করি। স্বদেশী-ব্রত আমি গ্রহণ করিয়াছি। আমার কাপড় ও জামা আমার স্বহস্তে বা সহকর্ম্মিগণের হস্তে বোনা ও সেলাই করা হইয়া থাকে। আমি ভারতবাসীর প্রকৃতির অনুরূপ জাতীয় পরিচ্ছদ

পরিধান করিয়া থাকি। আমার মতে বিলাতী পরিচ্ছদ অনুকরণ করা আমাদের অবনতি, হীনতা ও দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। আমরা জাতীয় পরিচ্ছদ পরিহার করিয়া জাতীয় পাপ অর্জ্জন করিতেছি। এদেশের জল হাওয়ার পক্ষে আমাদের দেশীয় পরিচ্ছদই উপযুক্ত। আমাদের পোষাকের মত সাদাসিধে, কৌশলসম্পন্ন অথচ সুলভ পোষাক পৃথিবীতে আর কোন জাতির নাই। উহা দ্বারা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্যক্ সিদ্ধ হয়। ইংরাজেরা যদি বৃথা অহঙ্কার ও অমূলক 'প্রেষ্টিজের' মায়া কাটাইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা বহু পূর্ব্বেই ভারতীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার আরম্ভ করিতেন। পবিত্রতার খাতিরে আমি জুতা ব্যবহার ছাড়িয়াছি। তাহার ফলে বুঝিয়াছি, সম্ভবপর হইলে জুতা ব্যবহার না করাই ভাল; কারণ তাহাই মানবের প্রকৃতিসুলভ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।"

শ্রীযুক্ত গান্ধীর জীবনের মূলমন্ত্র—সত্য। তিনি নিজে কঠোর সত্যাশ্রয়ী—অপরকেও কায়মনোবাক্যে সত্যগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকেন। তিনি জানেন, সত্যের বল—মহাবল। ছাত্রগণকে সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি আমেদাবাদে নিজের তত্ত্বাবধানে, 'সত্যগ্রহাশ্রম' নামে এক শিক্ষা-শালা স্থাপন করিয়াছেন। তথায় শিক্ষার্থিগণকে নিম্নলিখিত কয়টী পবিত্র পণ গ্রহণ করিতে হয়,—"(১) সর্ব্বদা সত্য কহিব; (২) হিংসা ত্যাগ করিব; (৩) বিবাহ করিব না; (৪) আহারে লোভ সম্বরণ করিব; (৫) পরদ্রব্য অপহরণ করিব না; (৬) নিতান্ত অপরিহার্য্য জিনিস ব্যতীত আবশ্যকাতিরিক্ত কিছুই ব্যবহার করিব না; (৭) জীবনে কাহারও নিকট ভীত হইব না; (৮) স্বদেশীর দীক্ষা লইব; (৯) পতিতোদ্ধারে ব্রতী হইব।"

সত্যগ্রহাশ্রম।

ছাত্রগণকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করাই কর্ম্মবীর গান্ধীর অভিপ্রেত। তাঁহার আশ্রমে ইংরাজী গৌণ ভাষারূপে শিক্ষাদান হইয়া থাকে। শিক্ষার কাল—দশ বৎসর। এই সময়ের মধ্যে ছাত্রগণ পিতামাতার নিকট যাইতে পায় না। তাহাদিগকে ধর্ম্ম, কৃষি ও বয়ন শিক্ষা নিয়মিত ভাবে দেওয়া হয়। দেশীয় ভাষার মধ্যে উর্দ্দু, বাঙ্গালা, তামিল, তেলেগু ও দেবনাগরী এই পাঁচ প্রকার অক্ষরে ছাত্রগণ অভ্যাস লাভ করে। ফলে, ভবিষ্যৎ জীবনে তাহারা যাহাতে স্বাবলম্বী হইতে পারে, তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা দূরদর্শী গান্ধী তাঁহার আশ্রমে করিয়াছেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ২৭শে এপ্রিল বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ড দিল্লীতে এক কন্‌ফারেন্স বা মন্ত্রণা-সভা আহ্বানের আয়োজন করেন।

দিল্লী কন্‌ফারেন্স।

জর্ম্মণীর সহিত যুদ্ধে ভারতবাসী কি উপায়ে বৃটিশরাজকে ধনবলে ও জনবলে সম্যক্ সাহায্য দান করিতে পারে, ইহাই নির্দ্দেশ করা কন্‌ফারেন্সের উদ্দেশ্য। ভারতের প্রধান প্রধান সামন্তরাজগণ ও সকল প্রদেশের প্রসিদ্ধ জননায়কগণ সভায় আহূত হইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও এ নিমন্ত্রণে বাদ পড়েন নাই। তিনি ২৬শে এপ্রিল বড়লাটকে লিখিয়া জানাইলেন যে যেহেতু লোকমতের শক্তিশালী অধিনায়ক শ্রীযুক্ত তিলক, মিসেস্ বেশান্ত ও আলি ভ্রাতৃদ্বয় নিমন্ত্রিত হন নাই, তিনিও সভায় যাইতে পারিবেন না। বড়লাট শ্রীযুক্ত গান্ধীকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার অনুরোধে শ্রীযুক্ত গান্ধী সভায় হাজির হইলেন বটে, কিন্তু

তেমন উৎসাহের সহিত বিচার-বিতর্কে যোগ দিতে পারিলেন না। তিনি সভায় উত্থাপিত প্রস্তাবগুলি হিন্দী ভাষায় সমর্থন করিলেন। বড়লাটের দরবারে সেদিন বিচিত্র বেশভূষামণ্ডিত রাজন্যবর্গের সম্মুখে, সরকারী ও বে-সরকারী শত শত পদস্থ দরবারীদের পুরোভাগে সামান্য ধুতি পরিহিত শ্রীযুক্ত গান্ধী হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করিতেছেন—এ দৃশ্য কেমন! ধুতির এ মান, হিন্দী ভাষার এমন গৌরব, পাঠক আর কোথাও দেখিয়াছেন কি?

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে গুজরাটের অন্তর্গত কয়রা জেলায় অজন্মা বশতঃ অন্নকষ্ট দেখা দেয়। ফলে, সহস্র সহস্র প্রজা সরকারী খাজনা আদায় দিতে একান্ত অপারগ হইয়া পড়ে। যে সকল গ্রামে চারি আনা ফসল জন্মে নাই, তথায় রাজস্ব-আইন অনুসারে গভরমেণ্ট প্রজাদের খাজনা মকুপ দিতে পারেন। এক্ষেত্রে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ কোন কোন গ্রামের খাজনা রেহাই দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অনেক বিপন্ন গ্রামই ঐ অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত ছিল। শেষোক্ত গ্রামবাসিগণের পক্ষে গরু-বাছুর বা তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া সরকারী খাজনা পরিশোধ দেওয়া বড়ই কষ্টকর হইতেছে বুঝিয়া, শ্রীযুক্ত গান্ধী আমেদাবাদের 'গুজরাট সভা'র মারফতে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট একদল 'ডেপুটেশন' প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন এবং কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন যে, কমিশনারের সহিত কথাবার্ত্তা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত খাজনা আদায় যেন বন্ধ রাখা হয়।

কয়রা কাণ্ড।

কমিশনার মিঃ প্রাট্ ইহাতে বিরক্ত হইলেন; তিনি 'ডেপুটেশনে'র প্রার্থনায় কর্ণপাত করা আবশ্যক মনে করিলেন না। ফলে, সংঘর্ষ পাকাপাকি হইয়া উঠিল।

২২শে মার্চ্চ হইতে শ্রীযুক্ত গান্ধী গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া প্রজাদের খাজনা দিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। তিনি সকলকে 'সত্যগ্রহে' উৎসাহিত করিয়া কহিলেন,—"তোমরা কিছুতেই বিচলিত হইও না। সরকারী কর্ম্মচারিগণের প্রতি অভদ্রতা করিও না। নিজেদের উপর অটল বিশ্বাস রাখিও। ইহা স্বত্ব-সাব্যস্তের সংঘর্ষ মাত্র।" প্রজাগণ দলে দলে সত্যগ্রহের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে মিঃ প্রাট্ কৃষকগণকে বলিলেন,—"এ ব্যাপারে তোমাদেরই ক্ষতি ষোল আনা। 'হোমরুলারে'রা তোমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগিবে না।" কমিশনার সাহেবের আদেশে 'মামলাট্‌দার' অর্থাৎ রাজস্ব-কর্ম্মচারিগণ প্রজার গরু-বাছুর, জমি-জমা নিলাম করিয়া খাজনা আদায় লইতে প্রবৃত্ত হইলেন। শত শত ব্যক্তির বিষয়-সম্পত্তি সরকারী নিলামে বিকাইয়া গেল; কিন্তু প্রজাপক্ষ কিছুতেই বিচলিত হইল না।

আত্মরক্ষায় সত্যগ্রহ।

শ্রীযুক্ত গান্ধী স্থানে স্থানে সভা আহ্বান করিয়া সহস্র সহস্র বিপন্ন প্রজাকে দৃঢ়ভাবে সঙ্কল্প স্থির রাখিবার জন্য এই মর্ম্মে উপদেশ দিতে লাগিলেন,—

"সমগ্র ভারত এখন কয়রার প্রতি উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে। যদি কয়রার কৃষকগণ এই সংঘর্ষে হারিয়া যায়, তাহা হইলে ভারতের অন্যান্য অংশের কৃষকেরা আর বহুকাল মাথা তুলিতে পারিবে না। কোন কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, সে বিষয় একাধিক বার চিন্তা করিয়া দেখা বিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি কার্য্যারম্ভের পর আমরা তাহা ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে অমানুষ বলিয়া অভিহিত হইব। ভূমির মূল্যবত্তা সেই ভূমিবাসী ব্যক্তিগণের উপর নির্ভর করে। কয়রার ভূমিসমূহে যদি লোকের বাস না রহিত, তাহা হইলে তাহার কোন মূল্যই থাকিত না। কয়রার এই সংঘর্ষ প্রকৃত পক্ষে খাজনা মকুপের সংঘর্ষ নহে—ইহা নীতি রক্ষার সংঘর্ষ মাত্র।"

এপ্রিল মাসের শেষভাগে বোম্বাই গভরমেণ্ট এই মর্ম্মে এক প্রেস-নোট প্রচার করিলেন যে, খাজনা আদায় স্থগিত রাখার বা খাজনা ছাড় পাওয়ার কথা, কয়রার প্রজারা অধিকার সূত্রে দাবী করিতেছে বটে; কিন্তু এরূপ দাবী প্রজাপক্ষ করিতে পারে না। খাজনা আদায় স্থগিত রাখা বা খাজনা ছাড় দেওয়া গভরমেণ্টের দয়া সাপেক্ষ। প্রত্যুত্তরে শ্রীযুক্ত গান্ধী জানাইলেন যে, প্রজার সম্মতি ব্যতিরেকে প্রজা শাসন করাও অসঙ্গত। ফলে, বোম্বায়ে তুমুল আন্দোলন উঠিল। তত্রত্য ধনকুবেরগণ বিপন্ন কৃষকদলকে সাহায্য দান করিতে উৎসুক হইলেন; কিন্তু তাহারা শ্রীযুক্ত গান্ধীর পরামর্শে সকল সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিল। তাঁহার মতে, কষ্ট সহ্য না করিলে শুভ মুহূর্ত্ত কাটিয়া যাইবে!

প্রজাগণ দলে দলে উৎসন্ন যাইতেছে দেখিয়া, কর্ত্তৃপক্ষ অব-

শেষে নরম হইলেন। জুন মাসের প্রারম্ভে তাঁহারা খাজনা আদায় মুলতুবি রাখিতে স্বীকৃত হইলেন ; তবে প্রজাদের মধ্যে যাঁহারা সক্ষম, তাঁহাদিগকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া খাজনা মিটাইয়া দিতে হইবে। তখন শ্রীযুক্ত গান্ধী প্রজাবর্গকে আহ্বান করিয়া এই মর্ম্মে উপদেশ দিলেন,—

"কলেক্টরের সহিত যুক্তিমতে এই ব্যবস্থা হইয়াছে। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে, আমার প্রস্তাবানুযায়ী ব্যবস্থা হইলে হাঙ্গামা সহজেই মিটিবে। আমাদের আন্দোলনের প্রথম সর্ত্ত এই ছিল যে, দরিদ্রগণের খাজনা আদায় যদি মুলতুবি রাখা হয়, তাহা হইলে সক্ষমগণ স্ব স্ব খাজনা মিটাইয়া দিবেন। এখন প্রজাসাধারণের আত্মসম্মান বজায় রহিল। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা সক্ষম, তাঁহারা খাজনা অবিলম্বে মিটাইয়া দিন এবং যাঁহারা সত্য সত্যই খাজনা দিতে অক্ষম, তাঁহাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করুন। যাহারা খুব দরিদ্র অর্থাৎ যাহাদের পক্ষে খাজনা দিতে হইলে ধার করা বা জিনিসপত্র বিক্রয় করা ছাড়া গত্যন্তর নাই, তাহারাই যেন তালিকাভুক্ত হয়। এরূপ প্রজার সংখ্যা যত কম হয়, ততই আপনাদের বাহাদুরী। আপনারা সরকারী হুকুমের অপব্যবহার করিবেন না—বিবেক-বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কার্য্য করিবেন। কোন্ প্রজা খাজনা পরিশোধ করিতে অক্ষম বা কোন্ প্রজা সক্ষম, তাহা নির্দ্ধারণের ভার গভরমেণ্ট আপনাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন।"

অতঃপর কয়রার হাঙ্গামা মিটিল ; মহাত্মা গান্ধীর জয় দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইল।

জর্ম্মণীর সহিত মহাযুদ্ধে বৃটিশ পক্ষে অস্ত্র ধারণের নিমিত্ত

ভারত গভরমেণ্ট ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যখন এদেশে সৈন্য সংগ্রহের জন্য প্রভূত চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময়ে অদ্ভুতকর্ম্মা গান্ধী সত্যগ্রহ আন্দোলনের প্রসিদ্ধক্ষেত্র কয়রা জেলায় পরমাগ্রহে সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরাজের নিকট—পৃথিবীর বীরেন্দ্র সমাজে—ভারতবাসীর যোগ্যতা প্রতিপাদনের ইহাই শুভ অবসর। ফলে, সৈন্য সংগ্রহের নিমিত্ত তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করেন,—

সৈন্য সংগ্রহ।

"বৃটিশ সাম্রাজ্যের সরিক হওয়াই যখন ভারতবর্ষের লক্ষ্য, তখন সাম্রাজ্যের জন্য তাহাকে ত্যাগ স্বীকার—এমন কি প্রাণপাত পর্য্যন্ত—করিতে হইবে। সাম্রাজ্য যদি ধ্বংস হয়, তাহা হইলে উহার সহিত আমাদের অন্তরের উচ্চাভিলাষ বিনষ্ট হইবে। যতদিন ভারতবর্ষ আত্মরক্ষার জন্য ইংরাজের মুখাপেক্ষী রহিবে, ততদিন তাহার পক্ষে ইংরাজের সমান সরিক হইবার অধিকার জন্মিতে পারে না। ভারতবাসীকে অস্ত্রের ব্যবহার শিখিতে হইবে। স্বরাজ লাভের এই সরল উপায় আয়ত্ত করিবার জন্য —সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য—তাহাদিগকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইবে। ইংরাজেরা যদি এই মহাসমরে ভারতীয় সেনার সাহায্যে জয়লাভ করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের প্রার্থনা তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। কেহ কেহ বলেন যে, উহা যদি এখনই দেওয়া না হয়, তাহা হইলে পরে আমাদিগকে বঞ্চনা করা হইবে। সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের প্রতি এই অবিশ্বাস, আমাদের আত্মশক্তির প্রতি অবিশ্বাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের যাহা ন্যায্য দাবী, তাহার জন্য আমারা কেন রাজনীতিজ্ঞগণের সৌজন্য বা দুর্ব্বলতার উপর নির্ভর করিব? আমরা স্বরাজ প্রার্থী হইলে আমাদের পক্ষে সাম্রাজ্যকে সাহায্য করিতেই হইবে। এই সাহায্য করার পুরস্কার আমরা নিঃসন্দেহ প্রাপ্ত হইব।

আমরা যদি সহুদ্দেশ্যে সরলচিত্তে কার্য্য করি, তাহা হইলে গভরমেণ্টের নিকট হইতে সদ্ব্যবহার অবশ্যই পাইব।”

উক্ত বিজ্ঞাপনে স্পষ্টবাদী গান্ধী ইহাও বলেন যে, ভারতবর্ষ যদি শত্রুর করতলগত হয়, তাহা হইলে এদেশের ত্রিশ কোটী লোককে শৌর্য্যশূন্য করিয়া রাখার অভিসম্পাত ইংলণ্ডের উপর বর্ত্তিবে। তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, ইংলণ্ডের সহৃদয়তা ব্যতীত নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার শক্তি আমাদের নাই। অতএব আমরা যদি এখন সাম্রাজ্যের জন্য ত্যাগ স্বীকারে সম্মত না হই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে উহার সরিকী অস্বীকৃত হইলে বিস্মিত হইবার কোন কারণ থাকিবে না।

শ্রীযুক্ত গান্ধী প্রত্যেক গ্রাম হইতে ২০ জন সৈন্য চাহেন। ফলে, ২২শে জুন হইতে ২৫শে জুন, এই তিন দিনের মধ্যে কয়রা জেলায় ৮২৮ জন, পাঁচ মহলে ২৬৬ জন এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে ২,২৬১ জন যুবক সৈন্যদলে প্রবেশ করে। কর্ম্মবীর গান্ধীর আহ্বানে লোকে এমনই উৎসাহিত হইয়াছিল যে, তাহারা স্বেচ্ছায় দলে দলে রাজার জন্য প্রাণ দিতে অগ্রসর হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় মানব হৃদয়ের নিখুঁত পরিচয় যেরূপ পাওয়া যায়, বৃহৎ ব্যাপারে সেরূপ সম্ভব নহে। বৃহৎ কাণ্ডে অনেক সময় কৃত্রিমতার মুখোস ঢাকা থাকে—ক্ষুদ্র ব্যাপারে তাহা সহজে ধরা পড়ে। মহাপ্রাণ গান্ধীর ভিতর ও বাহির অভিন্ন। তিনি মুখে যাহা বলেন, নিজের জীবনে তাহা অনুষ্ঠান করেন। পশ্চাল্লিখিত দুইটী ঘটনায় পাঠক তাঁহার মহদন্তঃকরণের সম্যক্ পরিচয় পাইবেন,—

মনের বল।

কয়রা জেলায় হাঙ্গামার সময় শ্রীযুক্ত গান্ধী একদিন গো-যানে আরোহণ করিয়া মফঃস্বলে কোন সুদূর পল্লী অভিমুখে যাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, গাড়োয়ান লোহার কাঁটাযুক্ত তীক্ষ্ণ যষ্টিদ্বারা নিরীহ বাহন দুইটীকে পুনঃপুন নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিতেছে এবং যন্ত্রণাকাতর বুভুক্ষু জীবদ্বয় প্রতি নিশ্বাসে যেন প্রাণের গভীর বেদনা মুহুর্ম্মুহু জ্ঞাপন করিতে করিতে অতিকষ্টে গাড়ীখানি টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। কয়েকবার নিষেধ সত্ত্বেও গাড়োয়ান তাহার কণ্টকময় যষ্টি পরিচালন বন্ধ না করায়, করুণহৃদয় গান্ধী সে মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য নীরবে সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া এগার মাইল পথ পদব্রজে ফিরিয়া আসিলেন। পরে প্রথম যাত্রার স্থান হইতে তিনি পুনরায় পদব্রজে গন্তব্য স্থান অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইহাই তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত প্রায়শ্চিত্ত! এই ঘটনার পর ঐ অঞ্চলের গাড়োয়ানেরা লোহার কাঁটাযুক্ত যষ্টি ব্যবহার একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে শ্রীযুক্ত গান্ধী দারুণ রক্তামাশয় রোগে শয্যাশায়ী হন। তাঁহার অবস্থা দিন দিন সঙ্গীণ হইয়া উঠে। চারিদিকে আশঙ্কার সাড়া পড়িয়া যায়। বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁহাকে ঔষধ সেবনের নিমিত্ত নিতান্ত জেদ্ করিতে থাকেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদে বড় বড় ডাক্তারেরা দেখিবার জন্য দলে দলে আসিতে লাগিলেন। তাঁহারাও রোগীর অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন; কিন্তু শ্রীযুক্ত গান্ধী কিছুতেই ঔষধ সেবন

করিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস, প্রকৃতি-জননী তাঁহাকে নিরাময় করিবেন। ফলে তাহাই হইল ; কয়েক দিন জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে কাটাইয়া শ্রীযুক্ত গান্ধী উত্তরোত্তর সারিয়া উঠিলেন। তাঁহার লোকাতীত মনের বল দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল।

জর্ম্মণীর সহিত যুদ্ধ বাধিবার পর, বৃটিশ গভরমেণ্ট শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্রাদি অনিষ্ট-চেষ্টা রোধ করিবার জন্য বিলাতে রাজ্য-রক্ষা আইন (Defence of the Realm Act) নামে এক কঠোর বিধান অস্থায়ী ভাবে বিধিবদ্ধ করেন। তাহার অনুকরণে ভারত গভরমেণ্ট এদেশে ভারত-রক্ষা আইন (Defence of India Act) এই মর্ম্মে পাশ করেন যে, কর্ত্তৃপক্ষ যে কোন ব্যক্তিকে সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে যতদিন ইচ্ছা আটক রাখিতে পারিবেন। ইহা ছাড়া ঐ আইন অনুসারে গভরমেণ্ট যাহাদিগকে আদালতে অভিযুক্ত করিবেন, তাহাদের বিচার সাধারণ বিচারালয়ে না হইয়া তিনজন কমিশনারের সমবায়ে গঠিত স্পেশাল আদালতে নিষ্পন্ন হইবে। কমিশনের প্রদত্ত রায়ের উপর আর আপীল চলিবে না। এই আইন, যতদিন যুদ্ধ চলিবে ততদিন এবং তাহার পর ছয়মাস কাল বাহাল থাকিবে, এইরূপ সর্ত্তে পরিগৃহীত হয়।

ভারত-রক্ষা আইন।

আইন পাশের সময়ে সকলে মনে করিয়াছিল যে, শুধু যুদ্ধের জন্য যখন এই নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে, তখন শত্রুপক্ষের সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধেই উহা প্রযুক্ত হইবে ; সাধারণ চুরি-ডাকাতি বা রাজনৈতিক মামলা, ঐ আইনের আমলে

আসিবে না। কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু ঐ অনুমান অমূলক প্রতিপন্ন হইল। কর্ত্তৃপক্ষ ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে বহু ব্যক্তিকে রাজ-দ্রোহী সন্দেহে অন্তরীণ (Intern) করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী উচ্চ শিক্ষিত দেশভক্তের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। অনেকে ডাকাতি মামলায় পড়িয়া স্পেশাল আদালতের বিচারে কঠোর দণ্ড লাভ করিল। বঙ্গভঙ্গের সময় হইতে পুলিশ এদেশে রাজনৈতিক হত্যা, ডাকাতি, দস্যুতা প্রভৃতি হাঙ্গামায় বড়ই বিব্রত হইয়াছিল। তাহারা এখন এই নূতন আইনের বলে হাজার হাজার যুবককে অন্তরীণ করিল। ইহার পর রাজনৈতিক হাঙ্গামা বহুল হ্রাস হইল বটে; কিন্তু সারা ভারতে—বিশেষতঃ বাঙ্গালায় হাহাকার পড়িয়া গেল। কারণ, অনেকে বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় প্রভৃতি আত্মীয় যুবকেরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইলেও পুলিশ তাহাদিগকে বিনাপরাধে আটক রাখিয়াছে। এই শ্রেণীর আসামীগণের মধ্যে কেহ কেহ আত্মহত্যা করায়, কেহ কেহ বা উন্মাদ হওয়ায়, সংবাদ-পত্রে ঘোরতর আন্দোলন চলিতে লাগিল।

রাউলাট কমিশন।

তখন গভরমেণ্ট প্রকৃত তথ্য ও তাহার প্রতিকারোপায় নির্দ্ধারণের নিমিত্ত বিলাতের কিংস্ বেঞ্চ ডিভিসনের জজ অনারেবল মিঃ জষ্টিস্ রাউলাটের নেতৃত্বে এক কমিশন নিয়োগ করিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কমিশনের সদস্যগণ সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ও রাজদ্রোহের ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিয়া এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট দাখিল করেন। এই

সময়ে ইউরোপে মহাযুদ্ধ শেষ হয়। কাজেই সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হইবার ছয়মাস পরে, ভারত-রক্ষা আইন পরিত্যক্ত হইলে, হয়ত রাজদ্রোহিগণকে আটক রাখা অসম্ভব হইবে, এই আশঙ্কায় গভরমেণ্ট রাউলাট কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী দুইটী বিল * ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করেন। এই দুইটী বিলের সাধারণ নাম—রাউলাট বিল। প্রথম বিলের স্থূলমর্ম্ম এই যে, সকৌন্সিল বড়লাট ইচ্ছা করিলে বৃটিশ ভারতের যে কোন স্থানে যে কোন সময়ের জন্য ভারত-রক্ষা আইনের প্রায় অনুরূপ ক্ষমতা প্রাদেশিক শাসক সম্প্রদায়ের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারিবেন ; অর্থাৎ ঐ আইন বলে যে কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখিবার অধিকার প্রাদেশিক গভরমেণ্টের হাতে থাকিবে। দ্বিতীয় রাউলাট বিলের উদ্দেশ্য, ভারতীয় ফৌজদারী আইনের বাঁধন আরও দৃঢ় করা। উহার মধ্যে কয়েকটী কঠোর ধারা এইরূপ,—

(১) কোন লোকের নিকট যদি রাজদ্রোহপূর্ণ লেখা পাওয়া যায় এবং সেই ব্যক্তি যদি প্রমাণ করিতে না পারে যে, ঐ কাগজ সে কোন বৈধ উদ্দেশ্যে রাখিয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে দুই বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

(২) গভরমেণ্ট যদি কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং সেই ব্যক্তি যদি পূর্ব্বে কোন ফৌজদারী মামলায় দণ্ডিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ব মামলায় উত্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণও বর্ত্তমান মামলায় প্রামাণ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইবে।

---

* The Indian Criminal Law (Amendment) Bill No. 1 of 1919 & the Criminal Law (Emergency Powers) Bill No. 2 of 1919.

(৩) আসামী যদি রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত কোন ব্যক্তির সহিত মিলামিশা করে, তাহা হইলে সেই দণ্ডিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উত্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণও বর্ত্তমান মামলায় প্রামাণ্যরূপে পরিগৃহীত হইবে।

প্রথম ধারাটী সিলেক্ট কমিটীর বিচারে পরিত্যক্ত হয়; কিন্তু শেষোক্ত ধারাদ্বয় সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে সিলেক্ট কমিটী পাশ করেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রস্তাবিত বিলদ্বয়ের বিরুদ্ধে সারা ভারতে তুমুল আন্দোলন পড়িয়া গেল। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর, এলাহাবাদ, নাগপুর প্রভৃতি নানা জনবহুল সহরে রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিবাদ-সভা আহূত হইতে লাগিল। জননায়কগণ একবাক্যে বলিলেন যে, প্রস্তাবিত বিলদ্বয় ন্যায় ও স্বাধীনতার মূলমন্ত্র বিরোধী এবং মানুষের সহজাত অধিকারের পরিপন্থী।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে উল্লিখিত বিল দুইটী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উঠিলে বে-সরকারী দেশীয় সদস্যগণ শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণে উহার বিরুদ্ধে লড়িলেন; কিন্তু গভরমেণ্ট কিছুতেই মূল বিল প্রত্যাহার বা পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন না। শেষে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী সদস্যগণের সংখ্যাধিক্য হেতু বিল দুইটী বে-সরকারী দেশীয় সদস্যগণের সম্মিলিত প্রতিবাদ সত্ত্বেও পাশ হইয়া গেল। তবে গভরমেণ্ট এইটুকু প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, প্রথম আইনটী কখনও রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে না এবং উহা তিন বৎসর পরে পরিত্যক্ত হইবে।

ভারতের জনসাধারণ এই ব্যাপারে সহসা সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের মধ্যে কেহ কেহ পদত্যাগ করিলেন। কোন কোন প্রতিষ্ঠাবান্ জননায়ক বড়লাট ও ভারত-সচিবকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন যে, তাঁহারা যেন সঙ্কল্পিত আইনে শেষ-সম্মতি না দেন। এদিকে বোম্বায়ের কয়েকজন রাজ-নীতিক নেতা সম্মিলিত হইয়া শ্রীযুক্ত গান্ধীর নিকট পরামর্শ-প্রার্থী হইলেন।

এবার শ্রীযুক্ত গান্ধী রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্মে সত্যগ্রহ-শপথ প্রচার করিলেন,—

"প্রস্তাবিত বিলদ্বয় অন্যায়মূলক। উহা স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচারের পরিপন্থী এবং মানুষের সহজাত অধিকারের ধ্বংসসাধক। এই ব্যক্তিগত স্বাভাবিক অধিকারের উপর সমগ্র জাতির ও রাজ্যের নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে। অতএব আমরা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি যে, উল্লিখিত বিলদ্বয় যদি আইনে পরিণত হয়, তবে সেই আইন যতদিন না প্রত্যাহৃত হইবে ততদিন আমরা উহা নিরুপদ্রবে অমান্য করিব। উহা ছাড়া অপর যে কোন আইন অমান্য করা প্রয়োজন বলিয়া আমাদের কমিটী ঘোষণা করিবেন, তাহাও ভদ্রভাবে লঙ্ঘন করিতে আমরা পশ্চাৎপদ হইব না। আমরা ইহাও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এই সংঘর্ষে আমরা সর্ব্বথা সত্যের অনুসরণ করিব এবং কাহারও প্রাণহানি, অঙ্গহানি বা সম্পত্তিনাশ করিব না।"

মার্চ্চ মাসে বোম্বাই অঞ্চলে এই প্রতিজ্ঞা-পত্র বহুলভাবে স্বাক্ষরিত হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত গান্ধীর নেতৃত্বে মিঃ পাটেল, মিঃ হর্ণিম্যান, শ্রীযুক্ত যমুনাদাস দ্বারকাদাস, শ্রীমতী সরোজিনী নায়ডু, শ্রীমতী গান্ধী প্রমুখ অনেক সম্ভ্রান্ত নরনারী প্রতিজ্ঞা-পত্রে

স্বাক্ষর করিলেন। মাদ্রাজে ও এলাহাবাদে লোকমতের নেতৃগণ এই আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হইলেন। সহসা চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

তখন বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড সত্যগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে গোপন-পরামর্শের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত গান্ধীকে দিল্লীতে আহ্বান করিলেন। বড়লাটের সহিত শ্রীযুক্ত গান্ধীর কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, জানা যায় নাই। তবে তাহার ফল কিছুই হয় নাই। সত্যগ্রহ-আন্দোলন, হবিঃপুষ্ট হুতাশনের ন্যায় উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিল। শ্রীযুক্ত গান্ধী, আইন লঙ্ঘন কল্পে স্বয়ং বোম্বাই রাজপথে কয়েকখানি নিষিদ্ধ পুস্তিকা বিক্রয়ে ব্রতী হইলেন। সারা ভারতে একটা নূতন সাড়া পড়িল। সর্ব্বত্রই 'মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়' ধ্বনি নিনাদিত হইতে লাগিল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত গান্ধী ঘোষণা করিলেন যে, রাউলাট আইন পাশ হইবার পরবর্ত্তী রবিবার যেন দেশবাসী জনসাধারণ উপবাস করিয়া নিজ নিজ ধর্ম্মমতানুসারে ভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা ও দুঃখ প্রকাশ করেন। ঐ দিন সত্যগ্রহ পালনের দিন বলিয়া দোকানপাট বন্ধ থাকিবে।

সত্যগ্রহ দিবস।

৩০শে মার্চ্চ দিল্লীতে সত্যগ্রহ পালনের দিন ভীষণ কাণ্ড বাধে। পুলিশের সহিত জনসঙ্ঘের সংঘর্ষ ফলে বহু নিরীহ নাগরিক হতাহত হয়। কর্ত্তৃপক্ষ শেষে মেশিন কামান ও গোরা ফৌজ নিয়োগ করিয়া সহরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

৬ই এপ্রিল কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর, করাচী, সিমলা,

এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মুলতান, মুঙ্গের প্রভৃতি বহু স্থানে সত্যগ্রহ-দিবস মহোৎসাহে পালিত হয়। সর্ব্বত্রই দোকানপাট বন্ধ ছিল; জনসাধারণ অনশনে ভগবৎসমীপে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। হিন্দুর মন্দিরে পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি এবং মুসলমানের মসজিদে নামাজ ও প্রার্থনা যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছিল। এদিন যান-বাহনাদির ব্যবহার প্রায় কেহ করেন নাই। হাজার হাজার নাগরিক অপরাহ্নে সাধারণ সভায় সমবেত হইয়া রাউলাট আইনের প্রতিবাদে মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং বড়লাট ও ভারত-সচিবের নিকট বিনীত প্রার্থনা জানান যে, তাঁহারা যেন ঐ আইন অচিরে রদ্ করিয়া দেন। এই দিন আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতের হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান—মারাঠী, মাড়োয়ারী, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, গুজরাটী—মহাত্মা গান্ধীর ইঙ্গিতে একই পথে ছুটিয়াছিল।

৯ই এপ্রিল শ্রীযুক্ত গান্ধী বোম্বাই হইতে দিল্লী রওনা হন। পঞ্জাব গভরমেণ্ট তাঁহাকে বোম্বায়ে পুনঃ প্রেরণ করিবার অভিপ্রায়ে পথে গ্রেপ্তার করেন। কর্ম্মবীর গান্ধী গ্রেপ্তার হইয়াছেন, এই সংবাদে কলিকাতায়, আমেদাবাদে ও পঞ্জাবে অশান্তির দাবানল সহসা জ্বলিয়া উঠে। বড় বড় সহরে 'হরতাল' ঘোষিত হয়। ১১ই হইতে ১৩ই এপ্রিলের মধ্যে একটা ঘোর অনর্থকর আশঙ্কার আলোড়ন—অচিন্ত্যপূর্ব্ব চাঞ্চল্যের প্রচণ্ড স্পন্দন—সারা হিন্দুস্থানের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত তড়িদ্বেগে বহিয়া যায়। পঞ্জাবের হাঙ্গামা প্রকাশ্য রাজ-

হরতাল।

দ্রোহে পরিণত হয়। কলিকাতা ও আমেদাবাদের দুর্ঘটনাও বড় সামান্য নহে। উভয় স্থলেই অনেক নিরস্ত্র নাগরিক গোরা ফৌজের গুলিতে প্রাণত্যাগ করে। কর্ত্তৃপক্ষ পঞ্জাবে ও আমেদাবাদে সামরিক আইন (Martial Law) জারি করিয়া কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমনে ব্রতী হন। অশিক্ষিত জনসঙ্ঘ সত্যগ্রহের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া বৃথা দাঙ্গা হাঙ্গামায় লিপ্ত হইতেছে—অনর্থক প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে—দেখিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধী সত্যগ্রহ আন্দোলন কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখেন এবং ঘোষণা করেন যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রায়শ্চিত্তকল্পে তিনি নিজে তিনদিন অনশনে কাটাইবেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় হাঙ্গামাকারিগণকে ভৎর্সনা করিয়া বলেন,—

"আমার গ্রেপ্তার জন্য কেন এত উত্তেজনা—এত চাঞ্চল্য—উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারি না। ইহা ত সত্যগ্রহ নহে—ইহা যে দুর্গ্রহেরও অধিক! যাহারা সত্যগ্রহ ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা সর্ব্ব প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াও অন্যের প্রতি বল প্রয়োগে নিবৃত্ত থাকিতে বাধ্য—তাহারা অন্যের ক্ষতি সাধনের জন্য লোষ্ট্র নিক্ষেপ প্রভৃতি অকার্য্য হইতে সর্ব্বদা বিরত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু এই বোম্বাই সহরে আমাদের লোকেরা কি করিতেছে? তাহারা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতেছে, ট্রামগাড়ী হইতে লোককে নামাইয়া দিতেছে এবং নানারূপ প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছে। ইহা সত্যগ্রহ নহে।"

ইহার পর দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ হয়। এই সকল ঘটনা অতি অল্প দিন পূর্ব্বে সংঘটিত। সুতরাং ইহার ফলাফল ভবিষ্যতের তমোময় গর্ভে দুর্নিরীক্ষ্য।

কি গার্হস্থ্য জীবনে, কি রাজনৈতিক জীবনে, মহাপ্রাণ গান্ধী

সর্ব্বত্রই তৃণাদপি সুনীচ—তরুর ন্যায় সহিষ্ণু। তাঁহার হৃদয় কিরূপ অকপট, কতদূর নিরভিমান, ইহার পরিচয় পাঠক নিম্নলিখিত ঘটনায় দেখুন,—

আদর্শ অকপটতা।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব বিপ্লব সম্পর্কে লাহোর সামরিক আদালতে অভিযুক্ত ডাক্তার কিচলুর বিচার সংস্রবে বোম্বায়ের চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গান্ধীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার পেশা কি?"

গান্ধী।—কৃষি ও বস্ত্র-বয়ন আমার পেশা।

ম্যাজিষ্ট্রেট।—(ঈষৎ হাসিয়া) আপনাকে কিন্তু ব্যারিষ্টাররূপে আহ্বান করা হইয়াছে।

গান্ধী।—পূর্ব্বে আমি ব্যারিষ্টারি করিতাম বটে, কিন্তু এখন আর সে ব্যবসা করি না।

ম্যাজিষ্ট্রেট।—আচ্ছা, আমি আপনাকে কৃষক, বয়নজীবী ও ব্যারিষ্টার (অধুনা ব্যবসাত্যাগী) বলিয়া লিখিয়া লইলাম।

এরূপ সারল্য, সত্যনিষ্ঠা ও নিরহঙ্কার কি অধুনা দুর্লভ নহে?

কর্ম্মবীর গান্ধীর প্রত্যেক বিজয় গৌরবে তাঁহার ত্যাগ ও কর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় একদিকে যেমন সুপরিস্ফুট, অন্যদিকে তেমনই একদল উদারহৃদয় ইংরাজের মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব সুপ্রতিপাদিত। দৃঢ়ব্রত গান্ধী নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের সাধনাবলে উত্তরোত্তর যতটা অগ্রসর হইয়াছেন, শক্তিশালী ইংরাজও ঠিক ততটা অধিকার ছাড়িয়াছেন। প্রকৃত অধিকারী না হইলে কোন অধিকার পাওয়া যায় না। অনধিকারী অপরের কৃপাদত্ত অধিকার রক্ষা করিতে পারে না। কাজেই অধিকার

উপসংহার।

লাভের পূর্ব্বে যোগ্যতার পরীক্ষা সকলকেই দিতে হয়। প্রতিষ্ঠাবান্ ইংরাজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কীর্ত্তিমান্ গান্ধীর নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণ যে সম্মানপ্রদ অধিকার অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই প্রশংসাসূচক। ঐ সংঘর্ষের ইতিহাসে স্যার উইলিয়ম হস্‌কেন, লর্ড এম্‌থিল, রেভারেণ্ড মিঃ ডোক, তাঁহার সহৃদয়া পত্নী, ডার্ব্বাণের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডের সহধর্ম্মিণী, মিঃ পোলাক্, মিঃ ক্যালেনব্যাক্, রেভারেণ্ড মিঃ এণ্ডরুজ, রেভারেণ্ড মিঃ পিয়ার্সন, লর্ড হার্ডিঞ্জ, মাদ্রাজের পাদরি-লাট প্রভৃতি সদাশয় ইংরাজ নরনারীর মহত্ব চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লিখিত হইবে। তাঁহাদের ন্যায় মহাপ্রাণ ইংরাজের নৈতিক বলে বৃটিশরাজ আজ বিধাতার আশীর্ব্বাদে অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর। তাঁহাদের ন্যায় ন্যায়বান্ ইংরাজেরাই একদিন বিশ্বপ্রেমের প্ররোচনায় সর্ব্বাগ্রে ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহৃদয়তায় ভারতবাসী, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে, আবার পূর্ব্ব গৌরব লাভ করিবে—এরূপ আশা অসঙ্গত নহে। তাই আজ আসমুদ্রহিমাচল কর্ম্মবীর গান্ধীর সম্মুখে নতজানু হইয়া সমস্বরে বলিতেছে,—

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ২২শে মে ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় ভারতীয় বজেটের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন,—

"ভারতীয়গণের মধ্যে শ্রীযুক্ত গান্ধীর মহত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠা সমধিক। তাঁহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ—চরিত্র সুবিমল। দেশসেবায় তাঁহার নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের তুলনা নাই। ভারত গভরমেণ্ট তাঁহাকে লইয়া যেরূপ বিব্রত হইয়াছেন, অপর কাহাকেও লইয়া সেরূপ হন নাই। শ্রীযুক্ত গান্ধীর বন্ধুবর্গের মধ্যে আমিও অন্যতম। তাঁহার অপরাপর বন্ধুগণের ন্যায় আমিও তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহার হস্তে যে বিপুল শক্তি রহিয়াছে, তাহা যেন তিনি দায়িত্ব বুঝিয়া প্রয়োগ করেন। তিনি সময়ে বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতে এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহাদের কার্য্যকলাপের উপর তাঁহার কোন হাত নাই; উহারা তাঁহার সুনাম ও সুখ্যাতির সুবিধা গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব অভিসন্ধি চরিতার্থ করিতে সচেষ্ট হয়।"

পরিশিষ্ট।

রাজভক্তি।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে মাদ্রাজে ব্যবহারাজীবগণের বার্ষিক ভোজ-সভায় শ্রীযুক্ত গান্ধী এই মর্ম্মে বলেন,—

ভারতে তিন মাস পরিভ্রমণ কালে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান সময়ে লোকে প্রায়ই আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত যে, আমি আধুনিক সভ্যতার ঘোর বিরোধী হইয়া এবং স্বদেশের হিতব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়া, কিরূপে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আমার রাজভক্তি অটল রাখিতে পারিয়াছি; এবং কিরূপেই বা আমি ইহা সঙ্গত মনে করি যে, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড পরস্পরের মঙ্গলোদ্দেশে একতাবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবে। আজ এই বিশিষ্ট সভায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আমার রাজভক্তি পুনরায় জ্ঞাপন করিবার সুবিধা পাইয়া, আমি অতীব আনন্দ বোধ করিতেছি।

আমার রাজভক্তি স্বার্থপরতার উপর প্রতিষ্ঠিত। নিরুপদ্রব-প্রতিরোধী রূপে আমি এই তথ্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছি যে, প্রকৃত নিরুপদ্রব-প্রতিরোধী যে অবস্থায় পতিত হউক না কেন, নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ ব্রতে তাহার দাবী বজায় রাখিতেই হইবে। আমি ইহাও বুঝিয়াছি যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের কয়েকটী আদর্শে আমার অনুরক্তি জন্মিয়াছে। তাহার মধ্যে একটী আদর্শ এই যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রজা নিজের শক্তি, সম্মান ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পায়। আমার ধারণা, কেবল বৃটিশ সাম্রাজ্যেই ইহা সম্ভব—অন্য কোন গভর্ণমেণ্টের

অধীনে সম্ভব নহে। আমি কোন গভরমেণ্টই ভালবাসি না, এ কথা বোধ হয় আপনারা শুনিয়াছেন। আমি বহুবার বলিয়াছি, যে গভরমেণ্ট সর্ব্বাপেক্ষা কম শাসন করেন তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বৃটিশ সাম্রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প শাসন প্রতিষ্ঠিত, ইহা আমি দেখিয়াছি। এই জন্যই আমি বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষপাতী।

সত্যগ্রহ।

'সত্যগ্রহ' কি, ইহা শ্রীযুক্ত গান্ধী নিম্নলিখিত মর্ম্মে বর্ণন করিয়াছেন,—

যে শক্তির কথা আমি এখানে বর্ণন করিতে যাইতেছি, তাহা Passive Resistance (নিরুপদ্রব প্রতিরোধ) এই ইংরাজী সংজ্ঞার দ্বারা সম্যক্ পরিস্ফুট হয় না। সত্যগ্রহ অর্থাৎ সত্যবল বলিলে উহার অর্থ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয়। সত্যবলই আত্মার বল ; উহা বাহুবলের সম্পূর্ণ বিপরীত। সত্যবল, খাঁটি ধর্ম্মমূলক অস্ত্র। যাঁহাদের চিত্ত ধর্ম্মপ্রবণ, তাঁহারাই উহা সজ্ঞানে প্রয়োগ করিতে পারেন। এই অর্থে প্রহ্লাদ, মীরাবাই প্রভৃতিকে নিরুপদ্রব-প্রতিরোধী বলা যায়। মরক্কো যুদ্ধের সময় ফরাসী গোলন্দাজেরা মরক্কোবাসী আরবগণের উপর গোলাবর্ষণ করিতেছিল। সে সময়ে আরবগণের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাহারা ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতেছে। তাহারা মৃত্যু অগ্রাহ্য করিয়া 'আল্লা' 'আল্লা' রবে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতে করিতে কামানের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল। মৃত্যু পরিহারের কোন উপায়ই তাহাদের হাতে ছিল না। তখন ফরাসী গোলন্দাজেরা আরবগণের উপর আর গোলা বর্ষণ করিতে চাহিল না। তাহারা শূন্যে টুপি নিক্ষেপ করিয়া সম্মুখে ছুটিয়া গেল এবং আনন্দধ্বনি সহকারে সাহসী আরবগণকে আলিঙ্গন করিল। ইহাই

নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের বিজয় নিদর্শন আরবেরা সজ্ঞানে নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ ব্রত গ্রহণ করে নাই—সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ তাহারা মরণ পণ করিয়াছিল। তাহাদের হৃদয়ে প্রেমের উন্মেষণা ছিল না। প্রকৃত নিরুপদ্রব-প্রতিরোধীর হৃদয়ে বিদ্বেষ-বুদ্ধি স্থান পায় না। সে ক্রোধের উত্তেজনায় মরণকে আলিঙ্গন করে না; পরন্তু নিগ্রহ ভোগের সামর্থ্য তাহার আছে বলিয়াই, সে স্বেচ্ছাচারীর নিকট মস্তক অবনত করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং নিরুপদ্রব-প্রতিরোধীর হৃদয়ে সাহস, ক্ষমা ও প্রেম থাকা প্রয়োজন।

ইমাম হুসেন ও তাহার স্বল্প সংখ্যক অনুচরদল তাহাদের চক্ষে অন্যায় বলিয়া প্রতীত আদেশবাণী মানিয়া লইতে স্বীকৃত হয় নাই। সে সময়ে তাহারা জানিত যে, তাহাদের অদৃষ্টে মৃত্যু অবধারিত। তাহারা বুঝিয়াছিল যে, ঐ আদেশ মানিয়া লইলে তাহাদের ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব বিধ্বস্ত হইবে। এই জন্য তাহারা মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিল। ইমাম হুসেন যে আদেশ অন্যায় বলিয়া বুঝিয়াছিল, তাহা মানিয়া লওয়া অপেক্ষা তাহার জন্য তাহারই অস্ত্রে তাহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রের হত্যা সাধন এবং শেষে দারুণ তৃষ্ণায় আপনার অশেষ কষ্ট ভোগ শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিল। আমার ধারণা এই যে, মুসলমান ধর্ম্মের উত্থান তরবারি বলে হয় নাই; পরন্তু মুসলমান ফকিরগণের আত্মনির্যাতনই উহার মূল। তরবারি চালনায় বাহাদুরী কিছু নাই। যে ব্যক্তি তরবারি দ্বারা আঘাত করে, সে যখন নিজের ভুল বুঝিতে পারে তখনই তাহার পাপ বোধ জন্মে—সেই সময়ে ঐ ঘটনা হত্যারূপে পরিণত হয়। তখন আঘাতকারী স্বকৃত অপরাধের জন্য অনুতাপ করিতে থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, সে যদি ভ্রমবশেও উহা করিয়া থাকে, তথাপি তাহার পক্ষে উহা বিজয় লাভ। নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ অহিংসার ধর্ম্ম। অতএব ইহা সর্ব্বত্র

সকল সময়ে পালনীয় ও বাঞ্ছনীয়। সকল ধর্ম্মেই হিংসা বর্জ্জনের ব্যবস্থা আছে। হিংসা প্রথার সমর্থকগণও হিংসা সম্বন্ধে বহুল বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের কিন্তু সেরূপ গণ্ডী কিছু নাই। নিরুপদ্রব-প্রতিরোধীর কষ্ট সহনের অক্ষমতাই উহার একমাত্র গণ্ডী।

কাহারও পক্ষে নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ আইনসঙ্গত কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর কেবল সেই ব্যক্তিই দিতে পারে—অপরে দিতে পারে না। কোন নিরুপদ্রব-প্রতিরোধী কার্য্য আরম্ভ করিবার পর, সাধারণ লোকে তাহার সম্বন্ধে কেবল মতামত প্রকাশ করিতে পারে। লোকে অসন্তুষ্ট হইতেছে বলিয়া কোন নিরুপদ্রব-প্রতিরোধী কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতে পারে না। পাটীগণিতের বাঁধা সূত্রের উপর তাহার কার্য্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত নহে। যে ব্যক্তি লাভ-লোকসান ওজন করিয়া তাহার পর তথাকথিত নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ আরম্ভ করেন, তাঁহাকে চতুর রাজনীতিক বা বিবেচক লোক বলা যাইতে পারে; কিন্তু তিনি কোন মতেই নিরুপদ্রব-প্রতিরোধী নহেন। প্রকৃত নিরুপদ্রব-প্রতিরোধী ঐ ব্রত গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই, উহা গ্রহণ করে।

মনের বল ও বাহুবল এ দুইই স্মরণাতীত যুগ হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। ধর্ম্মগ্রন্থে উভয়েরই যথাযথ সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। তাহারা যথাক্রমে সৎ ও অসৎ শক্তি নির্দ্দেশ করে। ভারতের বিশ্বাস এই যে, এদেশে এক সময়ে সৎ-শক্তির প্রাধান্য ছিল। আমাদের আদর্শ এখনও ঠিক তাহাই রহিয়াছে। অসৎ-শক্তির প্রাধান্য-নিদর্শন ইউরোপ খণ্ডে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। নীচ কাপুরুষতা অপেক্ষা এ দু'য়ের যে কোনটাই ভাল। এ দু'য়ের মধ্যে একটার আশ্রয় না লইলে আমাদের মধ্যে স্বরাজ আসিবে না—জাগরণ দেখা দিবে না। বিনাকর্ম্মে লব্ধ স্বরাজ

স্বরাজই নহে। উহা জনসাধারণের মনে কোন ধারণা উৎপাদন করিবে না। জনসাধারণ সে ক্ষমতা উপলব্ধি করিতে না পারিলে, তাহাদের জাগরণ সম্ভবপর নহে। তাহারা ও আমরা যদি নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের প্রাধান্য যথাযথরূপে জাহির না করি, তাহা হইলে নেতৃগণের অজস্র প্রতিবাদ ও গভর্ণমেণ্টের সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও বিপ্লববাদ আপনা আপনি মাথা তুলিয়া উঠিবে। আগাছা যেমন যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন রূপে জন্মায়, ইহারাও সেইরূপ। নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের আবাদ করিতে হইলে চেষ্টা ও সাহস উহার সাররূপে ব্যবহার করিতেই হইবে। আগাছা আমূল তুলিয়া না ফেলিলে, তাহা যেমন ফসলকে চাপিয়া মারে, সেইরূপ নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ উৎপাদনের নিমিত্ত আত্ম-ত্যাগের দ্বারা জমি পরিষ্কার না রাখিলে এবং ইতিপূর্ব্বেই যে বিপ্লববাদের বীজ উপ্ত হইয়াছে, তাহা ভালবাসা দ্বারা নিরসন না করিলে, আগাছার মত উহা গজাইয়া উঠিবে।

যে সকল যুবক, তাহাদের চক্ষে গভর্ণমেণ্টের জুলুম বলিয়া যাহা প্রতীত হয়, তজ্জন্য অধীর ও ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাদিগকে আমরা নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের নীতিবলে ভ্রান্তপথ হইতে সুপথে আনিতে পারি। তাহাদের বীরত্ব, তাহাদের সাহসিকতা ও তাহাদের সহনশীলতাকে নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের পোষকতায় নিয়োজিত করিয়া আমরা সৎ-শক্তির বল বৃদ্ধি করিতে পারি।

অতএব নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের ভাব যত শীঘ্র দেশময় ছড়াইয়া পড়ে, ততই ভাল। ইহা রাজা ও রায়ত উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলকর। নিরুপদ্রব-প্রতিরোধী গভর্ণমেণ্টকে বা অপর কাহাকেও কখনও বিপন্ন করিতে চায় না। সে অবিবেচকের মত কাজ করে না—কাহারও প্রতি উগ্র ব্যবহার করে না। সে 'বয়কট' (বর্জ্জন-নীতি) পরিহার করে; কিন্তু স্বদেশী

পণ গ্রহণে অগ্রসর হয়; কারণ উহা তাহার ধর্ম্মের অনুগত। স্বদেশী-সাধনায় সে কখনও পশ্চাৎপদ হয় না। একমাত্র ভগবান্‌কেই সে ভয় করে—অপর কোন শক্তির ভয় তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না। রাজশক্তির ভয়ে সে কখনও কর্ত্তব্যপথ পরিত্যাগ করে না।

আমাদের অভাব কি?

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত গান্ধী মাদ্রাজে ওয়াই-এম-সি-এ হলে ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—

আমি সাধারণের কাজে নামিয়া অবধি বরাবরই অনুভব করিয়াছি যে, একটা জিনিষ ভারতবাসীর পক্ষে নিতান্ত দরকার। সে জিনিষটা সকল জাতির পক্ষেই প্রয়োজনীয়। তবে এসময়ে আমাদের পক্ষে উহা যেমন প্রয়োজনীয়, তেমন আর কাহারও পক্ষে নহে। সে জিনিসটার নাম—চরিত্র-বল আপনারা জানেন, পরলোকগত গোখলে প্রায়ই বলিতেন যে, আমাদের দেশে চরিত্রবান্ লোকের হার, ইউরোপীয় জাতিসমূহের তুলনায় অনেক কম। তাঁহার উক্তি সমূলক কিনা, আমি বলিতে পারি না। তবে আমার বিশ্বাস এই যে, ঐ উক্তির সমর্থনে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। আমাদের মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা যে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইয়াছেন, তাহা নহে, পরন্তু তাঁহারা অবস্থার দাস হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা হউক আমি জীবনের মূলসূত্র এই ধরিয়াছি;—কোন লোক—যত উচ্চ পদস্থই হউন না কেন এবং যে কাজই করুন না কেন—তাঁহার পশ্চাতে যদি ধর্ম্মবল না থাকে, তাহা হইলে তিনি কিছুতেই প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না। পৃথিবীর ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ পাঠ

করিয়া ধর্ম্মার্জ্জনের কথা আমি কহিতেছি না। ধর্ম্ম অন্তরের জিনিষ—মস্তিষ্কের দ্বারা লাভ করা যায় না। উহা আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে না; পরন্তু ভিতর হইতেই বিকশিত হয়। উহা আমাদের মধ্যেই সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে। কেহ কেহ উহার সত্ত্বা অনুভব করিতে পারে; কেহ কেহ তাহা পারে না। তথাপি কিন্তু উহা আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। আমাদের অন্তর্নিহিত এই ধর্ম্মভাব, বহিঃশক্তির প্রভাবে জাগরিত হউক অথবা ভিতর হইতেই বিকশিত হউক—যে ভাবেই হউক—আমরা যদি কোন কাজ ঠিক ভাবে এবং স্থায়িরূপে করিতে চাই, তাহা হইলে ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত রাখিতেই হইবে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে জীবনের মূলসূত্র কতকগুলি বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেগুলি আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে।

সত্যপালন।

শাস্ত্রে পঞ্চবিধ যম * উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সত্যই প্রধান। সত্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ইহা সাধারণতঃ ঠিক তাহা নহে, পরন্তু সকল ক্ষতি সহ্য করিয়াও জীবনকে সত্যের অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত করার নামই সত্যপালন। এই সংজ্ঞার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি প্রহ্লাদের জীবনী উল্লেখ করিতে পারি। তিনি [illegible]র জন্য পিতার আদেশ পর্য্যন্ত অমান্য করিয়াছিলেন। যখন কোন কার্য্যে 'না' বলা প্রয়োজন হইবে, তখন ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সাহসের সহিত সোজাসুজি 'না' বলাই উচিত।

অহিংসা।

দ্বিতীয়তঃ অহিংসা। অহিংসা শব্দের অর্থ জীবহত্যা না করা। আমার কাছে কিন্তু অহিংসা শব্দের ব্যাপকতা আরও অধিক। প্রকৃত পক্ষে কাহারও

* অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।

বিরক্তি উৎপাদন না করার নাম অহিংসা।* এমন কি যে ব্যক্তি তোমাকে শত্রু বলিয়া মনে করে, তাহারও বিরুদ্ধে মনে কুভাব পোষণ না করার নাম অহিংসা। যিনি অহিংসা সাধনা করেন তাঁহার পক্ষে শত্রুতা সাধন অসম্ভব। ফলে, তিনি গুপ্তহত্যা করিতে পারেন না—প্রকাশ্যে কাহাকেও খুন করিতে পারেন না—এমন কি দেশের জন্য বা আপন আত্মীয়-স্বজনের ইজ্জত রক্ষার জন্য, দাঙ্গা-হাঙ্গামাও করিতে পারেন না। অহিংসা সাধনের এই নীতি অনুসারে আমরা আমাদের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত আত্মীয়-স্বজনগণকে অত্যাচারীদের হাতে তুলিয়া দিয়াই তাহাদের ইজ্জত রক্ষা করিতে পারি। ইহাতে অবশ্য মুষ্ট্যাঘাত করা অপেক্ষা অধিকতর দৈহিক ও মানসিক বলের প্রয়োজন। আপনার গায়ে হয়ত কিছু ক্ষমতা থাকিতে পারে (আমি তাহাকে সাহস বলিতেছি না) এবং সেই ক্ষমতা আপনি প্রয়োগ করিতে পারেন; কিন্তু তাহা যখন নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন কি ঘটে? সে সময়ে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রোধে ও উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া উঠে। আপনি তাহাকে আঘাত করিয়া আরও উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। কাজেই সে আপনার বিনাশ সাধন করিয়া তাহার অবশিষ্ট আক্রোশ আপনার প্রতিপাল্যগণের উপর বর্ষণ করিবে। কিন্তু যদি আপনি প্রতিহিংসাপরায়ণ না হইয়া নিজে সকল আঘাত শির পাতিয়া গ্রহণ করেন এবং আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপাল্যগণের মধ্যে গিয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে কি হয়? আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, সমস্ত অত্যাচার আপনার উপর দিয়াই কাটিয়া যাইবে এবং আপনার প্রতিপাল্য-গণ অক্ষত শরীরে রক্ষা পাইবেন।

---

* যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ গীতা—১২।১৫

ব্রহ্মচর্য্য ।

যিনি জাতীয় কর্ত্তব্য সংসাধনে প্রয়াসী অথবা প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবনের আলোক লাভে সমুৎসুক, তিনি বিবাহিত হউন বা অবিবাহিত হউন, তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেই হইবে। বিবাহের ফলে এ জগতে নর-নারীগণ এক বিশেষ রকমের বন্ধুতাসূত্রে বদ্ধ হয়। এ জীবনে বা পর জীবনে ঐ সূত্র বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। কিন্তু জীবনের এই স্তরে প্রবৃত্তির পিপাসা যে আত্ম-প্রকাশ করিবেই, ইহা আমি মনে করি না।

রসনা সংযম ।

অতঃপর রসনা সংযমের প্রয়োজন। কোন ব্যক্তি যদি নিজের পাশব প্রবৃত্তি দমন করিতে চাহে, তাহা হইলে সে স্বতই তাহা অনায়াসে করিতে পারে; রসনার ক্রীতদাস না হইয়া সে রসনা সংযত করিতে সক্ষম হয়। এই ব্রত পালন করা, সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য। আমি এইমাত্র ভিক্টোরিয়া হোটেল দেখিয়া আসিতেছি। সেখানে এতগুলি রন্ধনশালা যে, আমি দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি! জাতি-বৈষম্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম পালনের নিমিত্ত ঐ সকল রন্ধনশালা সৃষ্ট হয় নাই। পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশের আগন্তুকগণের রুচি অনুযায়ী রসনা-পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে ঐরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তা'ছাড়া ব্রাহ্মণগণের জন্য পৃথক্ পৃথক্ কামরা আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের রুচি অনুযায়ী সুস্বাদু আহার্য্য সরবরাহের জন্য পৃথক্ পৃথক্ রন্ধনশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। আমি বলি, ইহারই নাম রসনার দাসত্ব। শরীর রক্ষার জন্য ঠিক যে খাদ্য প্রয়োজন, তাহা ভোজন করিয়া যদি আমরা পরিতৃপ্ত না হই, পরন্তু খাদ্যের সহিত কতকগুলা উত্তেজক, উত্তাপবর্দ্ধক ও তীব্র মসলা উদরস্থ করি, তাহা হইলে শরীরের মধ্যে যে অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক উত্তেজনা দেখা দিবে, তাহা আমরা দমন করিতে পারিব না। জন্তু-জানোয়ারদের মত আমাদেরও পানেচ্ছা,

আহারেচ্ছা ও প্রবৃত্তির তাড়না আছে; কিন্তু গরু-ঘোড়ারা কি আমাদের মত আহারে অসংযমী? আপনারা কি মনে করেন যে, আমাদের খাদ্যের তালিকা যথেচ্ছরূপে বাড়াইয়া চলাই সভ্যতার লক্ষণ, বা প্রকৃত জীবনের নিদর্শন?

অচৌর্য্য।

পরবর্ত্তী ব্রত হইতেছে চুরি না করা। আমাদের যাহা এখনই প্রয়োজন নাই, এমন জিনিষ যদি গ্রহণ করি এবং তাহা অপর কাহারও প্রয়োজন সত্ত্বেও তাহাকে না দিই, তাহা হইলে আমরা প্রকারান্তরে চোর হইলাম। প্রকৃতির মূল বিধান এই যে, জগজ্জননী আমাদের দৈনন্দিন অভাব পূরণের নিমিত্ত যথেষ্ট দ্রব্যসম্ভার উৎপাদন করিয়া থাকেন। কাজেই, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের নিজের প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্য গ্রহণ করে এবং তদতিরিক্ত কিছু না লয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে আর দুর্ভিক্ষ থাকিবে না—অনাহারে কেহ প্রাণ ত্যাগ করিবে না। যতদিন সংসারে এই অসামঞ্জস্য থাকিবে, ততদিন আমাকে বলিতেই হইবে যে, আমরা চোর। আমি সমাজতন্ত্রী (Socialist) নহি। ঐশ্বর্য্যশালী লোকের ধনসম্পত্তি আমি কাড়িয়া লইতে চাহি না। তবে আমি এইটুকু বলি যে, আমাদের মধ্যে যাঁহারা আলোকের রাজ্য হইতে অন্ধকার দূর করিতে চান, তাঁহাদিগকে উল্লিখিত নীতি অনুসরণ করিতে হইবে। ভারতে ত্রিশ লক্ষ লোক এক বেলা আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করে। তা'ও আবার কিরূপ? একখানা চাপাটী ও এক চিমৃটি নুণ হইলেই যথেষ্ট—এতটুকু ঘি বা তৈল পর্য্যন্ত জুটে না!

স্বদেশী।

স্বদেশী-পণ গ্রহণ করা অবশ্য প্রয়োজন। আমরা যখন প্রতিবেশীদের ছাড়িয়া অপর কোন স্থানের লোকের সাহায্যে স্ব স্ব অভাব পূরণ করি,

তখনই আমাদের একটা জন্মগত পবিত্র ব্রত ভঙ্গ করা হয়। কোন ব্যক্তি যদি বোম্বাই হইতে আসিয়া এখানে জিনিষ-পত্র সরবরাহ করিতে চাহে, তাহা হইলে মাদ্রাজী ব্যবসাদার থাকিতে বম্বেওয়ালার নিকট জিনিষ ক্রয় করা আপনাদের কর্ত্তব্য নহে। স্বদেশী সম্বন্ধে আমার অভিমত এই। আপনার যে গ্রামে বাস, সে গ্রামে যদি নাপিত থাকে তাহা হইলে তাহারই পৃষ্ঠপোষকতা করা উচিত; পরন্তু মাদ্রাজ সহর হইতে আগত সৌখিন নাপিতের নিকট ক্ষৌরী হওয়া অবিধেয়। তবে আপনার গ্রামের নাপিত যাহাতে সহরের নাপিতের মত দক্ষতা লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাকে তালিম দিতে পারেন; কিন্তু সে সুদক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনার পক্ষে সহরের নাপিতের নিকট যাওয়া কিছুতেই ন্যায়সঙ্গত নহে। ইহার ফলে যখন দেখিব যে, অনেক জিনিষ আমরা পাইতে পারি না, তখন সেগুলি না লইয়াই জীবন-যাত্রা সম্পাদন করিতে সচেষ্ট হইব। আজ যে সকল জিনিষ নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার অনেকগুলি হয়ত বর্জ্জন করিতে হইবে। আপনারা বিশ্বাস করুন, যখন মনের অবস্থা ঐরূপ দাঁড়াইবে, তখন ঘাড়ের উপর হইতে যেন পাষাণ ভার নামিয়া গেল বলিয়া বোধ করিবেন।

নির্ভীকতা।

আমি সারা ভারত ভ্রমণ করিয়া বুঝিয়াছি যে, এদেশে শিক্ষিত লোকের মনে একটা অসাড়তাপ্রসূ আতঙ্ক প্রবেশ করিয়াছে। আমরা প্রকাশ্যভাবে কথা কহিতে পারি না—আমাদের ধ্রুব ধারণাসমূহ জনসাধারণের সম্মুখে ঘোষণা করিতে সাহসী হই না। আমরা গোপনে ঘরের মধ্যে যে মত প্রকাশ করি, তাহা সাধারণে জানিতে পারে না। আমরা যদি মৌনব্রত গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। কিন্তু আমরা যখন প্রকাশ্যে বক্তৃতা করি, তখন নিজে যাহা বিশ্বাস করি না, তাহাই বলিয়া

থাকি। যাঁহারা সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করেন, তাঁহাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা এইরূপ কিনা জানি না; তবে আমি বলি, একমাত্র ভগবান্ ব্যতীত অপর কাহাকেও ভয় করা নিষ্প্রয়োজন। আপনারা যদি প্রকৃতই সত্যপালন করেন, তাহা হইলে আপনাদের হৃদয়ে নির্ভীকতা আসিবেই আসিবে।

অস্পৃশ্য জাতি।

অস্পৃশ্য জাতিসমূহের সম্বন্ধে একটী ব্রত আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের ইহাই একটা দুরপনেয় কলঙ্ক। ইহা স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয়, যে সময়ে আমরা জীবনাবর্ত্তের নিম্নস্তরে পড়িয়াছিলাম, সেই সময়ে সংস্পর্শ বিষয়ক এই নীচ, জঘন্য, দাসত্ববর্দ্ধক ভাব আমাদের মধ্যে জাগিয়াছিল। তাহার কুফল আজও আমাদের সমাজে রহিয়া গিয়াছে। আমার মতে, ইহা একটা অভিসম্পাত। যতদিন ইহা বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন মনে হইবে যে, উক্ত মহাপাপের ফলে আমরা এই পুণ্যভূমে এত শাস্তি ভোগ করিতেছি। কেহ যে জাতিবৃত্তির জন্য অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে, ইহা ধারণাতীত। হে ছাত্রগণ! তোমরা যদি আধুনিক শিক্ষা লাভ করিয়াও প্রাগুক্ত পাপে লিপ্ত হও, তাহা হইলে তোমাদের পক্ষে আদৌ শিক্ষা লাভ না করাই ভাল।

রাজনীতি।

উল্লিখিত নিয়মসমূহ পালনের পর আপনারা রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে এবং প্রাণ ভরিয়া উহা আলোচনা করিতে পারেন। ধর্ম্মহীন রাজনীতির সার্থকতা কিছুই নাই। দেশের ছাত্রগণ যদি রাজনীতিক-মঞ্চে সমবেত হয়, তাহা হইলে তাহা জাতীয় উন্নতির সহায়ক হইবেই, ইহা আমি মনে করি না। পক্ষান্তরে এ কথাও বলা চলে না যে, ছাত্রজীবনে

রাজনীতি শিক্ষা করা উচিত নহে। রাজনীতি আমাদের জীবনে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আমরা জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বালোচনা করিতে চাই; আমাদের জাতীয় জীবনের গঠন কিরূপে হইতেছে, তাহাও বুঝা উচিত। আজ কাল ছোট ছোট ছেলেরা লেখা পড়া ছাড়িলেই ঘোর অন্ধকারে গিয়া পড়ে। তাহারা সামান্য সামান্য চাকুরি খুঁজিয়া বেড়ায়। তাহাদের উপার্জ্জন অতি অকিঞ্চিৎকর; ভগবানের তত্ত্ব তাহারা রাখে না। এমন কি বিশুদ্ধ বাতাস ও পরিষ্কার আলোক তাহারা পায় না। প্রাগুক্ত বিধানগুলি মানিয়া চলিলে প্রাণে যে অকৃত্রিম তেজস্বিতা ও স্বাধীনতার উদ্রেক হয়, তাহা তাহাদের অজ্ঞাত।

উপসংহার।

আজ আপনাদের সম্মুখে যে কয়টী বিধান উল্লেখ করিলাম, তাহাদের মধ্যে যে কোন একটী ধরিয়া আপনারা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব। অথবা যদি আপনারা মনে করেন যে, এ সকল উক্তি বাতুলের প্রলাপ মাত্র, তাহা হইলে তাহা স্পষ্ট বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন না; কারণ আপনাদের মন্তব্য আমি ভগ্নোৎসাহ না হইয়াও গ্রহণ করিব।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা।

জনৈক মুসলমান পত্র-লেখককে শ্রীযুক্ত গান্ধী গুজরাটী ভাষায় যে চিঠি লিখেন, তাহার কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ এইরূপ,—

হিন্দু-মুসলমানে আমি কোন বৈষম্য দেখি না। আমার মতে, উভয়েই ভারত-জননীর সন্তান। আমি জানি হিন্দুরা সংখ্যায় অনেক অধিক; তাঁহারা জ্ঞানে ও শিক্ষায় অধিকতর অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

অতএব মুসলমান ভ্রাতৃগণের জন্য তাঁহাদের পক্ষে সানন্দে অধিকতর স্বার্থ-ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। সত্যাগ্রহীরূপে আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের বাসনা সম্পূরণের নিমিত্ত হিন্দুগণের আত্মবিসর্জ্জন করা উচিত এবং তাহাতে তাঁহাদের আনন্দ বোধ করা কর্ত্তব্য। পরস্পরের প্রতি এইরূপ উদারতা প্রদর্শিত হইলে, তবে একতা আসিবে। হিন্দু-মুসলমান পরস্পর শোণিতসম্পর্কযুক্ত ভাইর মত আচরণ করিলে, ভারতে অরুণোদয়ের সম্ভাবনা।

প্রাচীন শিক্ষা বনাম আধুনিক শিক্ষা।

এলাহাবাদে মুন্সী রামপ্রসাদের উদ্যান-বাটিকায় আহূত এক বিরাট সভায় শ্রীযুক্ত গান্ধি হিন্দী ভাষায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে বক্তৃতা করেন,—

আমি আজ সলজ্জভাবে স্বীকার করিতেছি যে, হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করা আমার পক্ষে সহজ নহে। আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর ইহাই একটা বিশেষ দোষ। অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের একাংশও তাই। ইংরাজীতে বক্তৃতা করা আমার পক্ষে সহজ বটে, তথাপি আমি হিন্দী ভাষায় আমার বক্তব্য প্রকাশ করিব।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থানুসারে ছাত্রগণের প্রকৃত শিক্ষা লাভ ১৬।১৭ বৎসর বয়সে, কলেজে প্রবেশ করিবার পর, আরম্ভ হয়। তৎপূর্ব্বে স্কুলে লব্ধ শিক্ষা কোন কাজের নহে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, এদেশের ছাত্রেরা ইংলণ্ডের ভৌগোলিক বিবরণ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে, কিন্তু স্বদেশের ভৌগোলিক জ্ঞান প্রচুররূপে অর্জ্জন করে না। ভারতের যে ইতিহাস তাহারা পাঠ করে, তাহা অনেকটা বিকৃত। সরকারী চাকুরী লাভ করাই তাহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ লাভ, তাহাদের

জীবনের চরম লক্ষ্য। এদেশের বালকেরা পৈত্রিক পেশা ছাড়িয়াছে—মাতৃভাষা বিসর্জ্জন দিয়াছে। তাহারা ইংরাজী ভাষা, ইউরোপীয় আদর্শ ও ইউরোপীয় সাজসজ্জা ধরিয়াছে। তাহারা ইংরাজীতে চিন্তা করে, সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ইংরাজীতে চালায় এবং মনে করে যে, ইংরাজী ভাষা ছাড়িলে কিছুতেই চলিবে না। তাহাদের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ইংরাজী ছাড়া গত্যন্তর নাই। ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দানের ফলে এদেশের শিক্ষিত শ্রেণী ও জনসাধারণ, এই উভয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান দেখা দিয়াছে। ইহারই ফলে গৃহাশ্রমেও বিচ্ছেদ-বীজ উপ্ত হইয়াছে। ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তির চিন্তা ও আদর্শ তাহার পরিজনভুক্ত মহিলাগণের মনোবৃত্তির অনুরূপ নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরাজী-শিক্ষিত বক্তির শেষ লক্ষ্য সরকারী চাকুরি লাভ, অথবা বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ লাভ। যে শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে সমাজে এমন বৈষম্য দেখা দিয়াছে, তাহা আমি কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি না। ঐ ভাবে শিক্ষিত ব্যক্তি, দেশের কোন উপকার করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায় না। অবশ্য আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, ইংরাজী-শিক্ষিত নেতৃগণ জনসাধারণের জন্য দুঃখ বোধ করেন না। বরং আমি স্বীকার করি যে, তাঁহারাই এদেশে কংগ্রেস ও অন্যান্য জনহিতকর আন্দোলন পরিচালন করিতেছেন। তথাপি আমার ধারণা এই যে, তাঁহারা যদি মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা ইতিমধ্যে আরও অধিক উন্নতি সাধিত হইত। দুর্ভাগ্যের বিষয়, নেতৃগণের মনে এই ভাব জাগিয়াছে যে, তাঁহাদের অনুসৃত পথ ছাড়া উন্নতির অন্য উপায় নাই। তাঁহারা যেন নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু নিজেদের অসহায় বোধ করা, মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে।

এখন প্রাচীন কালের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা আলোচনা করা যাউক। সেকালে গ্রাম্য পাঠশালে গুরু মহাশয়েরা ছাত্রগণকে এমন শিক্ষা দিতেন, যাহা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগিত। তদুপরি উচ্চশিক্ষা যাহারা লাভ করিত তাহারা অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিত। শিক্ষার পথে বাধা কিছু ছিল না। রাজশক্তি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না—ব্রাহ্মণেরাই জনসাধারণের মঙ্গলা-মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উহার গতি-প্রকৃতি বাঁধিয়া দিতেন। সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য সেকালে শিক্ষার ভিত্তি ছিল। ঐরূপ শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই আজ ভারতীয় সভ্যতা হাজার হাজার বর্ষের বিপ্লব-ঝঞ্ঝা সহ্য করিয়াও সজীব; আর গ্রীস, রোম ও মিশরের প্রাচীন সভ্যতা অতীতের অন্ধকারে বিলুপ্ত। অধুনা ভারতের উপর দিয়া নূতন সভ্যতার তরঙ্গ ছুটিয়াছে; কিন্তু ইহা অস্থায়ী। আমার স্থির বিশ্বাস, এ তরঙ্গ অচিরে তিরোহিত হইবে—ভারতীয় সভ্যতা আবার ভাস্বর হইয়া উঠিবে। পুরাকালে জীবনের মূলভিত্তি ছিল—সংযম; এখন ভোগ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। ফলে, লোকে অধুনা শক্তিহীন, কাপুরুষ ও সত্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বৈদেশিক সভ্যতার অধীনে ন্যস্ত হওয়ায়, হয়ত আমাদের সভ্যতাকে কোন কোন বিষয়ে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া লওয়া প্রয়োজন হইবে; কিন্তু যে সভ্যতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতও স্বীকার করিয়াছেন, তাহার আমূল পরিবর্ত্তন কিছুতেই সমীচীন নহে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার নিদানভূত জড়শক্তির সম্মুখীন হইতে হইলে সেই সভ্যতানুকূল পদ্ধতি ও উপকরণ অবলম্বন করিতেই হইবে। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার আদিভূত আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট জড়শক্তি কিছুই নহে। সকল দেশের তুলনায় এই ভারতবর্ষই ধর্ম্মভূমি ছিল। সেই ভাব রক্ষা করা প্রত্যেক ভারতবাসীর চরম ও পরম কর্ত্তব্য। আত্মার

শক্তি অর্থাৎ ভগবানের শক্তি হইতে তাঁহারা শক্তি লাভ করিবেন। এই পথ যদি তাঁহারা পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে স্বরাজ স্বতই তাঁহাদের করায়ত্ত হইয়া পড়িবে।

তৃতীয় শ্রেণীর রেল-যাত্রীর দুর্দ্দশা।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত গান্ধী রাঁচি হইতে সংবাদ-পত্রসমূহে এই মর্ম্মে লিখিয়া পাঠান,—

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আসিয়া অবধি আমি আড়াই বৎসরের উপর ভারতে রহিয়াছি। ইহার মধ্যে প্রায় আট মাস কাল আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ভারতীয় রেলপথসমূহের তৃতীয় শ্রেণীতে পরিভ্রমণ করিয়াছি। উত্তরে লাহোর হইতে দক্ষিণে ট্রাঙ্কুবার পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে করাচী হইতে পূর্ব্বে কলিকাতা পর্য্যন্ত, কোথাও বেড়াইতে আমার বাকী নাই। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা কিরূপ অবস্থায় রেলপথে ভ্রমণ করে, তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনই, আমার তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য। সুতরাং আমি যতদূর পারিয়াছি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই কয়-মাসে আমি এদেশের অধিকাংশ রেলপথেই বিচরণ করিয়াছি এবং যখন যেখানে যে ব্যবস্থার ক্রটী দেখিয়াছি, তখনই তাহা সেখানকার রেল-কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিয়া জানাইয়াছি। আমার মনে হয়, দীর্ঘকাল হইতে যাত্রীরা যে সব অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে—যদিও ইহার মধ্যে অধিকাংশই সহজ-প্রতিকারসাধ্য—তাহা দূর করিবার জন্য দেশের সংবাদ-পত্রসমূহকে এবং জনসাধারণকে একযোগে যত্নপর হইতে আহ্বান করিবার সময় আসিয়াছে।

আমি গত ১২ই তারিখে বোম্বাই হইতে মেল ট্রেণে মাদ্রাজ যাইবার

জন্য ১৩৷৴০ টাকা দিয়া টিকিট ক্রয় করি। যে কামরায় আমি উঠিয়াছিলাম, তাহাতে লেখা ছিল—২২জন যাত্রী বসিবে। ইহাতে কেবল বসিবার আসন মাত্র ছিল ; বাঙ্ক (Bunk) ছিল না যে, কেহ একটু আরাম করিয়া স্বচ্ছন্দে শুইবে। মাদ্রাজে পৌঁছিবার পূর্ব্বে ঐ ট্রেণে দুইটী রাত্রি কাটাইতে হইয়াছিল। ট্রেণ পুণায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই যদি আমাদের কামরায় ২২ জনের অধিক যাত্রী না উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কেবল বলবান আরোহীদের প্রতিরোধের ফলে। দুইজন কি তিনজন নাছোড়বান্দা আরোহী ব্যতীত আর সকলকেই সারা রাত্রি বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতে হইয়াছিল। রায়চরে ট্রেণ পৌঁছিলে, ভিড় অসহনীয় হইয়া উঠে। কিছুতেই যাত্রীদের ঠেল সামলাইতে পারা যায় নাই। আমাদের কামরায় যে সকল যাত্রী বাহির হইতে কাহাকেও উঠিতে না দিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছিল, তাহাদের পক্ষেও আর আটকাইয়া রাখা সাধ্যাতীত হইয়া উঠে। ট্রেণের গার্ড বা অন্যান্য রেলকর্ম্মচারীরা আসিয়া আরও কতকগুলি যাত্রীকে ভিতরে ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

বাক্সে মাছ বোঝাই করার মত এই কামরাটীতে যে মানুষ বোঝাই করা হইতেছিল, ইহার প্রতিবাদ বোম্বাই অঞ্চলের একজন রোখা মুসলমান বণিক্ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, ট্রেণে তাঁহার চারি রাত্রি কাটিয়াছে, ইহা পঞ্চম রাত্রি ; কিন্তু সকলই বৃথা হইল। গার্ড তাঁহাকে অপমানিত করিয়া বলিলেন, শেষ ঠিকানায় গিয়া তিনি যেন এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। ঐ রাত্রিতে অধিকাংশ সময়ই অন্যূন ৩৫ জন আরোহী আমাদের গাড়ীতে ছিল। অনেককে ময়লার মধ্যে মেঝের উপর বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল ; অনেককে দাঁড়াইয়া থাকিতেও হইয়াছিল। একবার দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম ঘটিয়াছিল ; কেবল কয়েকজন প্রাচীন বয়স্ক,—যাঁহারা ঔদ্ধত্য দেখাইয়া অস্বস্তি আর বাড়াইতে চাহেন না—এমন আরোহীর জন্যই তাহা হইতে পায় নাই।

'পথে আরোহীরা তৈয়ারী চা আনাইলেন। কিন্তু সে ত চা নহে— খানিকটা চা-ধোয়া জল। একটু ময়লা চিনি, আর দুধ বলিয়া কথিত একটু সাদা রঙের তরল পদার্থের মিশ্রণে ঐ জলটা ঘোলা দেখাইতেছিল। উহার চেহারা সম্বন্ধে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি; স্বাদের সম্বন্ধে যাত্রীদের কথাই প্রামাণ্য।

এতখানি পথের মধ্যে একটীবারও আমাদের কামরায় ঝাড়ু পড়ে নাই—কেহ তাহা পরিষ্কার করিয়াও দেয় নাই। ফলে, মেঝের উপর দিয়া যাইতে হইলেই—মেঝের উপর উপবিষ্ট যাত্রীদের ভিড় ঠেলিয়া এক পা অগ্রসর হইতে হইলেই—ময়লার উপর দিয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় ছিল না। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পায়খানাটী একবারও পরিষ্কার করা হয় নাই। তা' ছাড়া ট্যাঙ্কেও জল ছিল না।

যাত্রীদের জন্য যে খাবার বিক্রয় হইতেছিল, তাহাও অপরিষ্কার। যে লোকটী খাবার দিতেছিল, তাহার হাতখানি আরও অপরিষ্কার। যে পাত্রটা হইতে খাবার দেওয়া হইতেছিল, তাহাও ময়লায় পরিপূর্ণ। যাহাতে করিয়া ওজন করা হইতেছিল, তাহা ততোধিক ময়লা। উহাতে আবার লাখ লাখ মাছি পড়িয়াছিল। এই সকল খাবার লইবার জন্য যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম। অনেকেই খাবারের সম্বন্ধে চোখা চোখা কথা শুনাইয়া দিলেন; তবে ইহাও বলিলেন যে, উহা না খাইয়া আর উপায় কি?

ষ্টেশনে নামিয়া দেখিলাম, গাড়ীওয়ালারা যে ভাড়া চাহিতেছে, তাহা না পাইলে তাহারা আমাকে লইবে না। আমি মৃদুভাবে বলিলাম যে, তাহাদিগকে আমি নির্দ্ধারিত হারে ভাড়া দিব। এখানে আমাকে নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ পন্থাবলম্বন করিতে হইয়াছিল। আমি তাহাদিগকে স্পষ্ট বলিয়াছিলাম,—আমি কিছুতেই গাড়ী হইতে নামিব না; হয়

আমাকে গাড়ী হইতে টানিয়া বাহির করিতে হইবে, নতুবা পুলিশ ডাকিতে হইবে।

পুনর্যাত্রাও ইহাপেক্ষা ভাল অবস্থায় হয় নাই। গাড়ী পূর্ব্ব হইতেই যাত্রীপূর্ণ হইয়াছিল। একজন বন্ধুর সাহায্য না পাইলে, আমি হয়ত বসিবার স্থানই পাইতাম না। সেই কামরায় যতজনের বসিবার কথা, তাহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; তথাপি আমি তাহাতে প্রবেশ করিলাম। উহাতে ৯ জন লোকের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল: কিন্তু লোক বসিয়াছিল ১২ জন। এক স্থানে একজন বিশিষ্ট রেল-কর্ম্মচারী একটা লোককে অনেক চেষ্টা করিয়া গাড়ীর ভিতর পূরিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং একজন আরোহী বাধা দিতেছিল বলিয়া তাহাকে অভিসম্পাত করিলেন; অধিকন্তু প্রহারের ভয়ও দেখাইলেন। এই কামরায় একটী পায়খানা ছিল; কিন্তু সেটা কেবল নামে মাত্র। উহা ইউরোপীয় ধরণে ব্যবহারোপযোগী পায়খানা; কিন্তু সেভাবে ব্যবহৃত হইত না। উহার ভিতর জলের নল ছিল; কিন্তু তাহাতে জল ছিল না। তা'ছাড়া উহা এত অপরিষ্কার যে, পীড়াজনক। এই কামরাটাই অতি কুদৃশ্য। কাঠের উপর ময়লা জমিয়া পুরু হইয়াছিল; কখনও যে সেখানে সাবান বা জল পড়িয়াছে, এমন মনে হয় না।

এই কামরায় নানা শ্রেণীর নানা রকমের লোক ছিল; তিনজন দীর্ঘকায় পাঞ্জাবী মুসলমান, দুইজন শিক্ষিত তামিল এবং শেষে আসিয়াছিলেন দুইজন মুসলমান বণিক্। বণিকেরা স্বচ্ছন্দে যাইবার জন্য কিরূপে ঘুষ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিলেন। পাঞ্জাবীদের মধ্যে একজন তিন রাত্রি ভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তথাপি তিনি একটু শুইতে পান নাই। তিনি বলিলেন, টিকিট কিনিবার জন্য যাত্রীরা কিরূপ ঘুষ দিতে বাধ্য হইতেছিল, তাহা তিনি সারাদিন

সেণ্ট্রাল রেল ষ্টেশনে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আর একজন বলিলেন,— টিকিট কিনিবার জন্য এবং বসিবার স্থান পাইবার জন্য তিনি নিজেই পাঁচ টাকা ঘুষ দিয়াছেন। এই তিনজন যাত্রী লুধিয়ানা যাইতেছিলেন; কাজেই তাঁহাদের রাত্রি জাগরণ এইখানেই শেষ হয় নাই।

আমি যাহা বর্ণন করিলাম, ইহা অতিরঞ্জিত বা অস্বাভাবিক নহে— সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমি রায়চর, ধোন্দ, শোণপুর, চক্রধরপুর, পুরুলিয়া, আসানসোল এবং অন্যান্য জংশন ষ্টেশনে নামিয়া ষ্টেশন-সংলগ্ন মুসাফির-খানাসমূহ পরিদর্শন করিয়াছি। ঐ স্থানগুলি অতি কদর্য্য—শান্তি-শৃঙ্খলা বর্জ্জিত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নামমাত্র সেখানে নাই—কেবল গণ্ডগোল আর হৈ চৈ। তথায় বসিবার বেঞ্চি নাই অথবা বসিবার উপযুক্ত স্থানও নাই। সকলকেই ময়লা মেঝের উপর বসিয়া, ময়লা খাদ্য আহার করিতে হয়। সকলেই যেথানে সেথানে খাদ্যের পরিত্যক্ত অংশ নিক্ষেপ করে, থুথু ফেলে, তামাক খাইয়া গুল প্রভৃতি ঢালে। ঐ সকল স্থানের পায়-খানার কথা আর বলিতে হইবে না। শ্লীল ভাষার নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া উহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই। সংক্রামকতা নিবারণের জন্য ছাই বা অন্য কোন বস্তু ঐখানে দেওয়া হয় না। মাছিগুলা ভন্ ভন্ করিয়া ঐ সকল স্থান ব্যবহার করিতে নিষেধ করিতেছে; কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের আর কোন উপায়ই নাই! এই সব স্থানে যাওয়া আর যমের বাড়ী যাওয়া সমান হইলেও, যাত্রীরা অনুযোগ করিতে চাহে না। আমি জানি, অনেক যাত্রী শুধু ট্রেণের কষ্ট কমাইবার জন্য উপবাস করিয়া থাকেন। শোণপুরে মাছিরা কিছু করিতে না পারায় বোল্‌তা পর্য্যন্ত আসিয়া যাত্রীদিগকে এবং কর্ত্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। ভারতের রাজধানীতে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট-ঘর একটী অন্ধকূপ বিশেষ; উহা ভাঙ্গিয়া ফেলাই উচিত।

ভারতে যে প্লেগ সংক্রামক হইয়াছে, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়? যেখানে যাত্রীরা কোথাও যাইলেই, কিছু-না-কিছু ময়লা বৃদ্ধি করিয়া থাকে এবং ফিরিবার সময় অধিকতর ময়লা লইয়া আইসে, সেখানে ঐরূপ না হওয়াই অসম্ভব। কেবল ভারতীয় রেলসমূহের যাত্রীরাই সকল গাড়ীতে—এমন কি স্ত্রীলোকের সম্মুখেও—তামাক সিগারেট প্রভৃতি অবাধে খাইয়া থাকে; যাহারা ধূমপানে অভ্যস্ত নহে, তাহাদের নিষেধও মানে না। ধূমপানে অনভ্যস্ত যাত্রীরা তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কামরায় থাকিলে, তাহাদের বিনানুমতিতে সেখানে ধূমপান করা রেল-আইন অনুসারে নিষিদ্ধ; তথাপি ধূমপানকারীরা ঐরূপ করিয়া সাজা পায় না।

এই সব অপরিচ্ছন্নতা অপসারণের পক্ষে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ কোনরূপেই পরিপন্থী হইতে পারে না। যুদ্ধের জন্য যে ট্রেণে অস্বাভাবিক ভিড় ও ময়লা সহ্য করিতে হইবে, এমন কিছু কথা নাই। এরূপ স্থলে বরং ট্রেণে লোক যাতায়াত, একেবারে বন্ধ হইতে পারে; তথাপি যাহাতে উল্লিখিতরূপে লোকের স্বাস্থ্য ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি নষ্ট হয়, এরূপ ব্যবস্থা চলিতে দেওয়া আদৌ উচিত নহে।

এইবার প্রথম শ্রেণীর আরোহীদের সহিত তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদের অদৃষ্ট তুলনা করা যাউক। মান্দ্রাজের ব্যাপারে প্রথম শ্রেণীর ভাড়া তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়ার পাঁচগুণের কিছু অধিক। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা যে আরাম উপভোগ করে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা কি তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ—এমন কি দশ ভাগের এক ভাগ—আরাম ভোগ করিতে পায়? যে যেমন পয়সা দেয়, সে তেমন সুবিধা ভোগ করিবে—ইহা ত ন্যায়সঙ্গত দাবী।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের পয়সা হইতেই যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের চির বর্দ্ধমান বিলাস-ব্যসনের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, ইহা

সুবিদিত সত্য। জীবন রক্ষার জন্য যাহা নিতান্ত প্রয়োজন, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা তাহা অবশ্যই দাবী করিতে পারে।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের উপেক্ষা করার ফলে লক্ষ লক্ষ প্রজাকে শৃঙ্খলা রক্ষা বিষয়ে, স্বাস্থ্যনীতি পালন বিষয়ে এবং সুরুচি পোষণ বিষয়ে শিক্ষাদানের সুযোগ নষ্ট হইতেছে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা রেলপথে ভ্রমণকালে এমন অবস্থায় কাল কাটাইতে বাধ্য হয় যে, তাহার ফলে ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষা লাভের পরিবর্ত্তে তাহাদের ভদ্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অনুভূতি পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়।

প্রাগুক্ত কুপ্রথাবলীর উচ্ছেদকল্পে অনেক প্রকার ব্যবস্থা উল্লেখ করা যাইতে পারে; কিন্তু আমার মতে প্রথমে এইরূপ ব্যবস্থা করা হউক,—বড়লাট, জঙ্গীলাট, রাজা-মহারাজগণ, বড়লাটের মন্ত্রিসভার সদস্যগণ এবং যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সাধারণতঃ উচ্চশ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়া থাকেন তাঁহারা, পূর্ব্বে কাহাকেও কিছু না জানাইয়া, মাঝে মাঝে তৃতীয় শ্রেণীতে যাইতে আরম্ভ করুন। তাহা হইলে শীঘ্রই আমরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অবস্থার কিছু বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইব এবং অভিযোগ-বিমুখ প্রজাবর্গ সাধারণ জীবের যোগ্য আরামে রেলে যাতায়াত করিবার আশায় যে পয়সা ব্যয় করে, তাহার কতকাংশ উশুল হইল বলিয়া মনে করিতে পারিবে।

নিরুপদ্রব-প্রতিরোধীর আদর্শ।

দক্ষিণ-আফ্রিকাপ্রবাসী তামিলগণকে নিরুপদ্রব-প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত গান্ধী এই মর্ম্মে বলেন,—

মনে রাখিও, আমরা নিরুপদ্রব-প্রতিরোধীদলের পবিত্র আদর্শ প্রহ্লাদ ও সুধন্বার বংশধর। তাঁহাদিগকে শ্রীভগবানের নাম ত্যাগ করিতে বলায়, তাঁহারা পিতার আদেশ পর্য্যন্ত অমান্য করিয়াছিলেন।

সহস্র নির্যাতন সহ্য করিয়াও তাঁহারা নির্যাতনকারীর উপর প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হন নাই। ট্রান্সভালে আমাদিগকে ভগবানের নাম ত্যাগ করিতে অর্থাৎ মনুষ্যত্ব বর্জ্জন করিতে, প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইতে এবং জাতির অপমান শির পাতিয়া লইতে বলা হইয়াছে। এ সঙ্কটে আমরা কি পিতৃ-পুরুষের অপেক্ষা কোন অংশে হীনতার পরিচয় দিব ?

আর্থিক উন্নতি বনাম নৈতিক উন্নতি।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে মিয়োর সেণ্ট্রাল কলেজের অর্থ-নীতি সভায় শ্রীযুক্ত গান্ধী নিম্নলিখিত মর্ম্মে বক্তৃতা করেন,—

আর্থিক উন্নতি কি প্রকৃত উন্নতির পরিপন্থী ? আর্থিক উন্নতি বলিলে আমরা অসীম ধনসম্পত্তি বৃদ্ধির কথা বুঝি। প্রকৃত উন্নতির অর্থ নৈতিক উন্নতি ; অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যে স্থায়ী উপাদান আছে, তাহার পরিপুষ্টি। বিষয়টী ঘুরাইয়া এইরূপে বলা যাইতে পারে,— মানুষের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কি নৈতিক উন্নতি হয় না ? এ সমস্যাটী অবশ্য আলোচ্য সমস্যা অপেক্ষা বৃহত্তর ; কিন্তু আমার ধারণা এই যে, ক্ষুদ্র বিষয়ের আলোচনা কালেও আমরা প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তর বিষয়েরই চর্চ্চা করিয়া থাকি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে আমরা ইহা বেশ অনুভব করিতে পারি যে, নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম বা স্থিতি বলিয়া কোন জিনিষ নাই। অতএব আর্থিক উন্নতি যদি নৈতিক উন্নতির পরিপন্থী না হয়, তবে উহার পরিপোষক হইবেই। যাঁহারা বৃহত্তর প্রস্তাবের সমর্থন করিতে পারেন না, তাঁহারা সময়ে সময়ে আলোচ্য বিষয়টী এরূপ জটিল ভাবে উত্থাপন করেন যে, আমরা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতে পারি না। পরলোকগত স্যার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টারের সেই উক্তি—অর্থাৎ ভারতের তিন কোটী লোক দৈনিক একাহারে জীবন ধারণ করে—এই দৃষ্টান্ত দ্বারা

তাঁহারা অভিভূত হইয়া পড়েন। কাজেই তাঁহারা বলেন যে, দেশবাসী জনসাধারণের নৈতিক উন্নতির কথা ভাবিবার পূর্ব্বে, তাহাদের দৈনন্দিন অভাব পূরণ করিতে হইবে। এই অজুহাতে তাঁহারা নৈতিক উন্নতির পরিবর্ত্তে অগ্রে আর্থিক উন্নতির পক্ষপাতী।

উক্ত সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াই তাঁহারা এক লাফে বলিয়া উঠেন,—'তিন কোটী লোকের জন্য যাহা দরকার, সারা বিশ্বের জন্যও তাহাই দরকার।' তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, বর্জ্জিত দৃষ্টান্ত হইতেই যত কুনিয়মের সৃষ্টি। প্রাগুক্ত সিদ্ধান্ত যে কতদূর হাস্যকর ও অসঙ্গত, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য একথা কেহ বলে না যে, দারুণ দারিদ্র্যের নির্ম্মম নিষ্পেষণে নৈতিক অবনতি ছাড়া আর কিছু হইতে পারে। মানুষ মাত্রেরই বাঁচিবার অধিকাব আছে। সুতরাং নিজের জীবন ধারণের উপযোগী আহার্য্য, পরিধেয় ও গৃহাদি সংস্থানে সকলেই অধিকারী। কিন্তু সেজন্য অর্থনীতির বা অর্থনীতিবিদের সাহায্য প্রয়োজন হয় না।

'কল্যকার জন্য ভাবিও না' ইহাই পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন। সুশৃঙ্খল সমাজে লোকের জীবনোপায় সংগ্রহ, অতি সহজ হওয়া উচিত এবং তাহাই হইয়া থাকে। কোন্ দেশ কতটা সুশৃঙ্খল, ইহা পরীক্ষা করিতে হইলে, সে দেশে কয়জন লক্ষপতি আছেন দেখিলে চলিবে না; পরন্তু দেখিতে হইবে যে, সে দেশের জনসাধারণ অন্নকষ্ট হইতে কতটা মুক্ত। শুধু এই সিদ্ধান্তটুকু পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, সম্পদ বৃদ্ধি বলিলে নৈতিক উন্নতি বুঝায়—ইহা সত্য বলিয়া ঘোষণা করা যায় কি না।

কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া যাউক। রোমরাজ্য সম্পদের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া নৈতিক বল হারাইয়াছিল। মিশরের অবস্থাও ঠিক তাই। পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসেই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পরিস্ফুট। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র, পৌত্র ও আত্মীয়গণ অর্থসম্পদে গা ঢালিয়া

অধঃপাতে গিয়াছিলেন। আধুনিক ধনকুবের রকফেলার বা কর্ণেগির বংশধরেরা যে, সাধারণ হিসাবে নৈতিক-বলসম্পন্ন, ইহা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু তাঁহাদের চরিত্র বিচার কালে আমরা স্বভাবতঃ অনেকটা কোমল হই। অর্থাৎ তাঁহারা যে জীবনে শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ রক্ষা করিবেন, এমন আশা আমরা করি না। তাঁহারা অর্থসম্পদ লাভ করিয়াছেন বলিয়াই যে নৈতিক সম্পদের অধিকারী হইবেন, এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার স্বদেশবাসিগণের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সৌভাগ্য-সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে আমি দেখিয়াছি, যাঁহার ধন-সম্পদ যত অধিক, তাঁহার নৈতিক জঘন্যতাও তত বেশী। সেখানে আমাদের স্বদেশীয় দরিদ্র লোকেরা নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের নৈতিক যুদ্ধে যেরূপ একাগ্রভাবে যোগ দিয়াছিল, ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ সেরূপ ভাবে অগ্রসর হন নাই। দরিদ্রগণের আত্মসম্মানে যেমন ঘা লাগিয়াছিল, ধনাঢ্যগণের সেরূপ লাগে নাই। যদি বিপদে পড়িবার আশঙ্কা না থাকিত, তাহা হইলে আমি এদেশের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতাম যে, লোকে অর্থশালী হইয়াছে বলিয়াই প্রকৃত উন্নতির পথে বাধা জন্মিতেছে। আমার মতে অর্থনীতি সম্বন্ধে অধুনা প্রকাশিত পুস্তকাবলী অপেক্ষা পৃথিবীর শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও দোষহীন। আজ যে প্রশ্ন আমরা এই সভায় উত্থাপন করিয়াছি, ইহা নূতন নহে। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে, যিশুকে লোকে ঠিক এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। সেণ্ট মার্ক সে দৃশ্য জলন্ত ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন। যিশু তখন ভাবমগ্ন—একান্ত অকপট। তিনি অমরত্ব লাভের কথা কহিতেছিলেন। সংসারের গতি-প্রকৃতি তাঁহার অবিদিত নহে। সে সময়ে তাঁহার মত অর্থনীতিবিদ্ আর কেহই ছিল না। স্থান ও কালের প্রভাব তিনি অতিক্রম করিয়াছিলেন। একজন লোক তাঁহার

সম্মুখে ছুটিয়া আসিয়া নতজানু হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"সৎ প্রভু! অমরত্ব লাভের জন্য কি করিতে হইবে?" প্রত্যুত্তরে যিশু বলিলেন,—"আমাকে সৎ বলিতেছ কেন? জগতে এক ভগবান্ ব্যতীত সৎ বস্তু আর কিছুই নাই। তুমি ত দশটী অনুশাসন জান। পর স্ত্রী গমন করিও না, হত্যা করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, জাল-জুয়াচুরি করিও না, পিতা মাতাকে সম্মান করিও।" আগন্তুকটী যিশুকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"প্রভু, আমি শৈশব হইতে ঐ সকল নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছি।" যিশু আগন্তুকের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া আবার বলিলেন,—"একটা বিষয়ে তোমার গলতি আছে। যাও, তোমার বিষয়-সম্পত্তি যাহা আছে, বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদের দান কর; স্বর্গে তুমি অনন্ত রত্নের অধিকারী হইবে। এস, ক্রুশ গ্রহণ কর; আমার অনুবর্ত্তী হও।" এই কথা শুনিয়া আগন্তুক বিষণ্ণ মনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল; কারণ তাহার ধনসম্পদ যে যথেষ্ট! যিশু চারিদিকে শিষ্যদের প্রতি তাকাইয়া বলিলেন,—'যাহাদের ধনসম্পত্তি আছে, তাহাদের পক্ষে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা কত কঠিন!' শিষ্যগণ এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। যিশু পুনরায় বলিলেন,—"বৎসগণ, অর্থই যাহাদের সর্ব্বস্ব তাহাদের পক্ষে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা বড়ই দুষ্কর। ছুঁচের ছিদ্র দিয়া উটের যাতায়াত বরং সম্ভব, তথাপি ধনাঢ্য ব্যক্তির ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ সম্ভবপর নহে।" জীবনের সনাতন নীতি ইহাপেক্ষা যোগ্যতর ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু যিশুর শিষ্যগণ আমাদেরই মত মাথা নাড়িয়া াস জানাইলেন। আমরা যেমন আজকাল বলি. তাঁহারাও সেইরূপ যিশুকে বলিলেন,—"দেখুন আপনার নীতি কাজে লাগাইতে গেলে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমরা যদি সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলি, তবে ইব কি? অর্থ চাই; নচেৎ নৈতিক জীবন ধারণ করা, আমাদের পক্ষে

অসম্ভব হইবে।” শিষ্যগণ নিতান্ত বিস্মিত হইয়া নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিলেন,—‘তবে আর কে রক্ষা পাইবে?’ যিশু তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“মানুষের পক্ষে উহা অসম্ভব; কিন্তু ভগবানের পক্ষে নহে। কারণ ভগবানের পক্ষে সকলই সম্ভব।” প্রত্যুত্তরে পিটার বলিলেন,—‘দেখুন আমরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আপনার অনুসরণ করিতেছি।’ যিশু বলিলেন,—“আমি ঠিক জানাইতেছি যে, আমার জন্য বা আমার উপদেশের জন্য কেহ ঘরবাড়ী, ভাইভগ্নী, মাতাপিতা, স্ত্রীপুত্র বা জমিজরাত ত্যাগ করিয়া আসে নাই। কিন্তু তাহারা এখন ধর্ম্মের জন্য নির্যাতন সহ্য করিয়া শত শত ঘর বাড়ী, ভাইভগ্নী, মাতাপুত্র ও জমিজরাত পাইবে এবং পর জীবনে অমরত্ব লাভ করিবে। তবে যাহারা অগ্রে আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকে শেষে পড়িবে এবং যাহারা শেষে আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকে অগ্রগণ্য হইবে।”

আপনারা এখানে দেখিতে পাইবেন যে, নিয়মানুবর্ত্তনের ফল বা পুরস্কার কি। অন্যান্য অ-হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে এইরূপ উদাহরণ আমি আর উদ্ধৃত করিতে চাহি না, এবং আমাদের ঋষিগণের লিখিত গ্রন্থ হইতেও যিশুর উক্তির সমর্থনে কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগকে অবজ্ঞা করিতে ইচ্ছা করি না। আমাদের শাস্ত্র গ্রন্থে বাইবেল অপেক্ষা উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পৃথিবীর মহাপুরুষগণের জীবনী হইতে আমরা এবিষয়ে অভ্রান্ত প্রমাণ পাইতে পারি। যিশু, মহম্মদ, বুদ্ধ, নানক, কবীর, চৈতন্য, শঙ্কর, দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ—ইহাঁদের প্রভাব সংসারে হাজার হাজার লোকের চরিত্রে প্রতিভাত হইয়াছে। ইহাঁদের আগমনে জগৎ আজ উন্নত; অথচ ইহাঁরা স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

অধুনা জড়-জগতের উন্নতিকে যেমন আমরা জীবনের চরম আদর্শ বলিয়া বোধ করিতেছি, তেমনই আমাদের প্রকৃত উন্নতির পথে বাধা

পড়িতেছে, এই বিশ্বাস যদি আমার না থাকিত তাহা হইলে আমার বক্তব্য এত বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিতাম না। আমার ধারণা, আর্থিক উন্নতি প্রকৃত উন্নতির পরিপন্থী। এই জন্যই পূরাকালে ধনার্জ্জনের একটা সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হইত। তাহাতে অবশ্য ধনার্জ্জন লিপ্সা একেবারে তিরোহিত হইত না। আমাদের মধ্যে এমন একদল লোক বরাবরই আছে ও থাকিবে, যাহারা ধনার্জ্জনকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করে। কিন্তু তাহারা যে আদর্শ হইতে অধঃপতিত ইহা আমরা বেশ জানি। পক্ষান্তরে একথাটি অতি সুন্দর যে, আমাদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা ধনাঢ্য তাঁহারাও স্বেচ্ছায় দরিদ্রের ন্যায় জীবন যাপন করা, উন্নতিলাভের উপায় বলিয়া বোধ করেন। টাকা ও ভগবান্, দু'য়ের পূজা এক সঙ্গে চলে না—ইহা ধ্রুব সত্য। এখন দু'য়ের মধ্যে যে কোন একটীকে আমাদের বাছিয়া লইতে হইবে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহ জড়বাদ দৈত্যের নিপ্পেষণে আর্ত্তনাদ করিতেছে। তাহারা টাকা-আনা-পাই দিয়া উন্নতির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করে। মার্কিণ-বিত্ত তাহাদের চক্ষে চরমোন্নতির মানদণ্ড। অন্যান্য জাতিসমূহ মার্কিণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষায় ফাটিয়া মরে। আমাদের দেশেও অনেকের মুখে এ কথা শুনিয়াছি যে, আমরা মার্কিণের মত ঐশ্বর্য্যশালী হইব, অথচ উহার প্রণালী পরিগ্রহ করিব না। আমার মতে ঐরূপ চেষ্টা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে। একই সময়ে জ্ঞানী, সংযমী অথচ ক্রোধোন্মত্ত হওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। আমরা যাহাতে নৈতিক বলে জগতে গুরুর আসন অধিকার করিতে পারি, সেইরূপ শিক্ষা নেতৃগণ আমাদের দিন। শুনিয়াছি, আমাদের এদেশে পূর্ব্বে দেবতারা বাস করিতেন। যে দেশ কল-কারখানার চিম্‌নি-নির্গত ধূমপুঞ্জে ও অশ্রান্ত ঘর্ঘর শব্দে বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে—যে দেশের রাজপথসমূহে ইঞ্জিন-চালিত বেগবান্ বাষ্পীয় রথ নিয়ত শত শত গাড়ী টানিয়া ছুটিয়াছে—গাড়ীর

যাত্রিগণ জানে না যে তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি, বরং তাহারা প্রায়ই অন্যমনস্ক, ঝাঁকার মাছের মত ঠাসাঠাসি ভাবে আবদ্ধ হইয়া তাহারা চির অস্বস্তি ভোগ করিতেছে—সম্পূর্ণ অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে এমন অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হইয়াছে যে, সুযোগ পাইলেই তাহারা উহাদের উচ্ছেদ করিবে অথবা উহারা তাহাদের উচ্ছেদ করিবে—এমন দেশে দেবতার বাস সম্ভবপর নহে। দেশের এইরূপ অবস্থা ধনসম্পদ বৃদ্ধির নিদর্শন বলিয়াই, আমি একথা এখানে উল্লেখ করিলাম। ইহাতে কিন্তু আমাদের সুখ বৃদ্ধি এতটুকুও হয় না। এ সম্বন্ধে খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ওয়ালেস নিম্নলিখিত মর্ম্মে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—

"আদিম যুগের ইতিহাস যতদূর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে, সে কালে লোকের ন্যায়নিষ্ঠা, নৈতিক আদর্শ ও চরিত্র-বল আজকালের তুলনায় কোন অংশে ন্যূন ছিল না। ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ জাতির অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে? দ্রুত ধন বৃদ্ধি এবং প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বৃদ্ধির ফলে, আমাদের স্থূল সভ্যতার আড়ম্বর অত্যন্ত বাড়িয়াছে, খ্রীষ্টানীর বাহ্যিক জাঁকজমক ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক দুশ্চরিত্রতা এত সম্প্রসারিত হইয়াছে যে, তাহা ভাবিলেও অবাক্ হইতে হয়। সমাজের এমন দুরবস্থা পূর্ব্বে ছিল না। নরনারী ও বালক বালিকার রক্ত শোষণ করিয়া কল-কারখানাগুলি চারিদিকে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। দেশের ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ নৈতিক অধঃপাতের মুখে ছুটিয়াছে। আয়ুক্ষয়কর ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, ব্যভিচার, উৎকোচ, জুয়াখেলা প্রভৃতি ইহার নিদর্শন। দেশের ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়ের পথ কলুষিত হইয়াছে, অতিরিক্ত মদ্য পানের ফলে মৃত্যু ও আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়িয়াছে, অকালপ্রসূত বিকলাঙ্গ সন্তানের হার উত্তরোত্তর অধিক হইয়া পড়িয়াছে এবং বেশ্যাবৃত্তি একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

• ডাইভোর্স (বিবাহ-বিচ্ছেদ) আদালতের কার্য্য-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে ধনবত্তার ও অবসর-বাহুল্যের আর একটা দিক্ ধরা পড়ে। আমার জনৈক বন্ধু বহুদিন লণ্ডন সমাজে বসবাস করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে নিশ্চয়তার সহিত জানাইয়াছেন যে, তথায় কি সহরে কি পল্লীবাসে সর্ব্বত্রই সময়ে সময়ে এরূপ নৈশ আমোদ-প্রমোদের আড্ডা বসিয়া থাকে যে, সেকালে নিতান্ত স্খলিত চরিত্র সম্রাটদের সময়েও সেরূপ দেখা যাইত না; যুদ্ধ সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাহি না। রোম রাজ্যের উত্থান অবধি পৃথিবীতে যুদ্ধ ত লাগিয়াই আছে। এখন সভ্য লোকেরা অবশ্য যুদ্ধের পক্ষপাতী নহেন। তথাপি রাজশক্তিসমূহের ভাণ্ডারে যুদ্ধের জন্য যে প্রভূত অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত রহিয়াছে, তাহা হিসাব করিয়া দেখিলে (তাঁহারা শান্তির পক্ষে মুখে যতই কেন সাধুতা ঘোষণা করুন না) ইহা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হইবে যে, তাঁহাদের মধ্যে নৈতিক বলের প্রভাব প্রায় নাই।"

বৃটিশ শাসনাধীনে থাকিয়া আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছি। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, বৃটেনের অন্তর্নিহিত নৈতিক শিক্ষা হইতে আমরা কিছুই লাভবান হইব না; বরং আমরা যদি সাবধান না হই, তাহা হইলে সেদেশের অধিবাসিগণ জড়বাদরূপ ব্যাধির আক্রমণে যে গুরুতর পাপে নিমজ্জিত হইয়াছে, আমরাও তাহাতে গিয়া পড়িব। আমরা যদি আমাদের সভ্যতা ও আমাদের নীতি ঠিক অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি, অর্থাৎ আমরা যদি অতীত গৌরবের জন্য বৃথা আস্ফালন না করিয়া, আমাদের জীবনে প্রাচীন নৈতিক মহত্ত্ব ফুটাইয়া তুলি এবং আমাদের জীবন অতীত গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ গঠন করি, তাহা হইলেই বৃটিশ সংস্রবে আমরা লাভবান হইতে পারিব। ঐরূপ পন্থাবলম্বন করিলে আমরা বৃটেনের উপকার করিতে পারিব এবং নিজেরাও লাভবান হইব। পক্ষান্তরে এদেশের শাসক সম্প্রদায় বৃটেন হইতে আসেন বলিয়া যদি আমরা সেদেশের অনুকরণ করি, তাহা

হইলে তাঁহারা ও আমরা উভয়েই অধঃপাতে যাইব। আদর্শ দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে না। তাহা কার্য্যে পরিণত করাও নিতান্ত দুরূহ নহে। স্বর্ণ অপেক্ষা সত্য যখন আমাদের অধিক আয়ত্ত হইবে, ক্ষমতা ও ধনের আড়ম্বর অপেক্ষা নির্ভীকতার সমাদর যখন আমরা শিখিব, স্বার্থপরতা অপেক্ষা ত্যাগের মহিমায় যখন আমরা গৌরব বোধ করিব, তখন আমরাই প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণ জাতি বলিয়া জগতে পরিগণিত হইব। আমরা যদি আবাস গৃহ হইতে—রাজপ্রাসাদ হইতে—দেব-দেউল হইতে—বৈভব-ভূষা মুছিয়া তাহার স্থানে নৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠা করি, তাহা হইলে ভাড়াটিয়া সৈন্য পোষণের বিপুল ব্যয় বহন না করিয়াও যে কোন শত্রুর সহিত যুদ্ধ চালাইতে পারিব। আসুন, আমরা অগ্রে ভগবানের রাজ্য খুঁজিয়া লই—তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা অনুসরণ করি। তাহা হইলে তাঁহারই অখণ্ডনীয় অঙ্গীকার অনুসারে আমরা সকল সম্পদ লাভ করিব। ইহাই প্রকৃত অর্থনীতি। আমরা যেন ইহা আয়ত্ত করিতে এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করিতে পারি।

কায়িক বল বনাম মনের বল।

মানুষের কায়িক বল অপেক্ষা মনের বল কত অধিক শক্তিশালী, শ্রীযুক্ত গান্ধী নিম্নলিখিত কয়েকটী কথায় অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,—

'নিরুপদ্রব-প্রতিরোধ যেন সর্ব্বদিকশাণিত তরবারির মত কার্য্যকারী। যে কোনরূপে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। যিনি ইহা ব্যবহার করেন তাঁহার যেরূপ মঙ্গল লাভ হয়, যাঁহার বিরুদ্ধে ইহা ব্যবহৃত হয় তিনিও সেইরূপ মঙ্গল লাভ করেন; অথচ ইহার ফলে এক বিন্দু রক্তপাত পর্য্যন্ত হয় না। ইহার ফল বহুদূরগামী। ইহাতে মড়িচা ধরে না;

কেহ ইহা চুরি করিতেও পারে না। নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের প্রতিযোগিতায় কোন পক্ষই ক্লান্ত হইয়া পড়ে না। নিরুপদ্রব-প্রতিরোধরূপ কৃপাণ রক্ষার নিমিত্ত পিধানের প্রয়োজন নাই; কেহ উহা জোরপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতেও পারে না।

স্বদেশী-পণ।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে শ্রীযুক্ত গান্ধী ভারতের জনসাধারণকে "স্বদেশী" ব্রত গ্রহণের নিমিত্ত নিম্নলিখিত অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে উপদেশ প্রদান করেন,—

ভগবান্‌কে সাক্ষী রাখিয়া আমি শপথপূর্ব্বক ঘোষণা করিতেছি যে, অদ্য হইতে আমার নিজের জন্য যে বস্ত্র প্রয়োজন হইবে, তাহা ভারতীয় তুলা, রেশম বা পশম দ্বারা ভারতে নির্ম্মিত বসনেই পূরণ করিব—বিদেশী বস্ত্র ব্যবহারে সম্পূর্ণ বিরত থাকিব এবং আমার নিকট যে সকল বিদেশী বস্ত্র আছে, তাহা সমস্তই বিনষ্ট করিয়া ফেলিব।

শপথ পালনের উপায়।

এই শপথ নিখুঁতভাবে পালন করিতে হইলে, হাতে কাটা সূতা দ্বারা যে কাপড় হাতে বোনা হয়, সেই কাপড় ব্যবহার করাই প্রয়োজন। ভারতীয় তুলা হইতে বিদেশে সূতা প্রস্তুত হইয়া, সেই সূতা যদি এদেশে আমদানী হয় এবং তাহা দ্বারা যদি এদেশেই বস্ত্র বয়ন করা যায়, তাহা হইলে সেই বস্ত্র স্বদেশী বস্ত্র নহে। আমাদের দেশের চরকায় যদি এদেশজাত তুলা হইতে এদেশেই সূতা কাটা হয় এবং সেই সূতায় এদেশের হস্তচালিত তাঁতে বস্ত্র বয়ন করা হয়, তবেই আমরা প্রকৃত স্বদেশী-বস্ত্র পাইতে পারি এবং সেই অবস্থায় আমাদের স্বদেশী, খাঁটী স্বদেশী বলিয়া

পরিগণিত হইবে। কিন্তু উপরে যে শপথের কথা লিখিত হইল, তাহা রক্ষার নিমিত্ত এতটা কড়াকড়ি না করিলেও চলিবে। বিদেশ হইতে আনীত কলে ভারতীয় তুলায় সূতা কাটিয়া, সেই সূতা দ্বারা ঐরূপ কলে যে কাপড় বয়ন করা হয়, তাহা ব্যবহার করিলেই আমাদের শপথ রক্ষিত হইবে।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, স্বদেশী-পণ গ্রহণকারিগণ শুধু স্বদেশী-বস্ত্র ব্যবহার করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবেন না; তাঁহারা অন্যান্য জিনিষের সম্বন্ধেও এই পণ যথাসম্ভব বিস্তারে সচেষ্ট হইবেন।

ইংরাজ মালিকের কাপড়ের কল।

শুনিয়াছি যে, ভারতে এমন কতকগুলি কাপড়ের কল আছে, যাহাদের মালিকেরা ইংরাজ; ঐ সকল কলে ভারতীয় অংশীদারদের লওয়া হয় না। এই সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমার মতে ঐ সকল কলে নির্ম্মিত বস্ত্র, বিদেশী বলিয়াই গণ্য হইবে। বিশেষতঃ ঐরূপ বস্ত্র, বিদ্বেষের কলঙ্কে অনুলিপ্ত। ঐরূপ বস্ত্র যতই সুনির্ম্মিত হউক না কেন, তাহা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। এ সকল বিষয়ে অধিকাংশ লোকই চিন্তা করিয়া দেখে না। সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে দেশের হিত বা অহিত সাধিত হইতেছে কিনা, ইহা চিন্তা করিয়া দেখিবে বলিয়া আশা করা যায় না। কিন্তু যাঁহারা শিক্ষিত—যাঁহারা চিন্তাশীল—যাঁহাদের বিচারশক্তি পরিপক্ক হইয়াছে—যাঁহারা স্বদেশসেবায় ব্রতী হইতে ইচ্ছা করেন—তাঁহাদের পক্ষে আপনার প্রত্যেক কার্য্য (তাহা ব্যক্তিগতই হউক বা জাতিগতই হউক) উল্লিখিত উপায়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। পরে যে সকল আদর্শ জাতির পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং যাহার শুভ ফল ব্যবহারলব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা সুপ্রতিপাদিত হইবে, তাহা জনসাধারণের

সম্মুখে উপস্থাপিত করা উচিত; কারণ গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

এ পর্য্যন্ত দেশের চিন্তাশীল নরনারীগণ এই ভাবে আত্মপরীক্ষায় ব্রতী হন নাই। এই অবহেলার জন্যই এ জাতি অনেক দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছে। ধর্ম্মের অনুভূতি মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিলে, তবে ঐরূপ আত্মপরীক্ষা সম্ভব বলিয়া আমি মনে করি।

ভ্রান্ত ধারণা।

হাজার হাজার লোকের বিশ্বাস এই যে, ভারতীয় কলসমূহে নির্ম্মিত বস্ত্র ব্যবহার করিলেই স্বদেশী-পণ রক্ষিত হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে অধিকাংশ মিহি কাপড়, ভারতের বাহিরে বিদেশী তুলায় উৎপাদিত মিহি সূতা দ্বারা বয়ন করা হয়। সুতরাং ঐরূপ বস্ত্রের বয়ন ব্যতীত অপর কোন কাজই ভারতে হয় না। এমন কি হস্তচালিত তাঁতেও বিদেশী সূতা দ্বারা মিহি কাপড় বয়ন করা হইয়া থাকে। ঐরূপ বস্ত্র ব্যবহার করিলে স্বদেশী-পণ রক্ষা করা হয় না; পরন্তু আত্ম প্রবঞ্চনা করা হয়। স্বদেশী ব্যাপারেও সত্যগ্রহ অর্থাৎ সত্যপালন প্রয়োজন। পুরুষগণ যখন বলিবে,—'কেবল কোমরে জড়াইবার কাপড় পাইলেই হইল, তথাপি আমরা খাঁটী স্বদেশী পালন করিব' এবং স্ত্রীলোকগণ যখন বলিবে,—'লজ্জাশীলতা বজায় রাখিতে পারা যায়, এইরূপ কাপড় পাইলেই আমাদের যথেষ্ট, তথাপি আমরা খাঁটী স্বদেশী পালন করিব'—সেই সময়েই স্বদেশীর মহাপণ পালনে আমরা কৃতকার্য্য হইব। কয়েক সহস্র মাত্র নরনারী যদি এইভাবে স্বদেশী-পণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে অপর সকলে যতটা সম্ভব তাহাদের অনুকরণ করিতে সচেষ্ট হইবে। ক্রমে তাহারা তাহাদের গৃহস্থালীর

তাবৎ পরিচ্ছদ স্বদেশী কিনা, ইহা পরীক্ষা করিতে থাকিবে। যাহারা বিলাসব্যসনে মত্ত নহে, তাহারা এদেশে স্বদেশী-সাধনা অনেকটা জাগাইয়া তুলিতে পারে, ইহা আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি।

আর্থিক দুর্গতির প্রতিকার।

সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে, ভারতে এমন গ্রাম খুব কমই আছে, যেখানে তন্তুবায় নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদের গ্রামে গ্রামে কৃষক, কর্ম্মকার, চর্ম্মকার, সূত্রধর, তন্তুবায় প্রভৃতি কারুজীবিগণ বসবাস করিতেছে। এখন কিন্তু কৃষকেরা নিতান্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। জোলা-তাঁতীর কাপড় গরীব লোকেরাই পরে। আমরা যদি ভারতীয় তুলায় ভারতে-কাটা সূতা তাহাদিগকে যোগাইতে পারি, তাহা হইলে তাহারাই আমাদের বস্ত্রের অভাব মিটাইতে পারে। প্রথম প্রথম কিছু দিন তাহা মেটা হইতে পারে, কিন্তু অনবরত চেষ্টা করিলে আমাদের এই সব গ্রাম্য তন্তুবায় মিহি সূতা দ্বারা মিহি কাপড় প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিবে। ইহাতে আমাদের তাঁতী ও জোলাদের অবস্থা উন্নত হইবে। তাহার পর আর একটু অগ্রসর হইলেই, আমরা বিপদ্‌-সাগর সহজেই অতিক্রম করিতে পারিব। আমরা অনায়াসেই আমাদের সন্তানসন্ততিদের সূতা কাটিতে ও কাপড় বুনিতে শিখাইতে পারি। ইহাতে আপন গৃহে যে বস্ত্র প্রস্তুত হইবে, তাহাপেক্ষা বিশুদ্ধ বস্ত্র আর কি হইতে পারে? আমার নিজের অভিজ্ঞতা বশে আমি বলিতে পারি যে, এই ভাবে কার্য্য করিলে আমরা অনেক দুর্দ্দশা এড়াইতে পারিব এবং অনেক অনাবশ্যক জিনিষের অভাব হইতে মুক্তিলাভ করিব। তখন আমাদের জীবন আনন্দময় ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ হইবে। আমার কাণে সর্ব্বদাই এই দৈব-বাণী হয় যে, এক সময়ে ভারতে লোকের জীবন প্রকৃতই ঐরূপ ছিল।

ভারতের এই অবস্থার কথা যদি কবি-হৃদয়ের আশার স্বপ্নও হয়, তাহাতেও কিছুই আসে যায় না। এখন ভারতবর্ষকে ঐরূপে গড়িয়া তোলা কি প্রয়োজন নহে? আমাদের পুরুষার্থ কি উহাতেই নিবদ্ধ নহে? আমি সারা ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছি। দরিদ্রের করুণ ক্রন্দন আর আমি সহ্য করিতে পারি না। বালক বৃদ্ধ সকলেরই মুখে এক কথা,—'আমরা সুলভে বস্ত্র পাই না, বেশি দাম দিয়া কাপড় কিনিবার শক্তি আমাদের নাই। খাদ্য-দ্রব্য, কাপড় প্রভৃতি সকল জিনিষই অগ্নিমূল্য, এখন আমরা কি করি?' তাহাদের মুখমণ্ডল নৈরাশ্যের অবসাদে মলিন। এই সকল লোককে একটা সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। প্রত্যেক দেশসেবকেরই এই উত্তর দেওয়া উচিত; কিন্তু আমি কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিতেছি না। আমাদের দেশের সমস্ত কাঁচা মাল ইউরোপে রপ্তানী হইবে এবং তজ্জন্য আমাদিগকে উচ্চ মূল্য দিতে হইবে, এই কথা চিন্তা করিলে প্রত্যেক চিন্তাশীল ভারতবাসীর পক্ষেই তাহা অসহনীয় হইয়া উঠে। ইহার প্রতিকারের একমাত্র পন্থা—স্বদেশী। কাহারও নিকট আমাদের দেশের তূলা বিক্রয় করিতে আমরা বাধ্য নহি। সারা হিন্দুস্থান যখন স্বদেশী-ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিবে, তখন তূলা উৎপাদনকারী কোন কৃষকই বিদেশে জিনিষ প্রস্তুতের জন্য তূলা বিক্রয় করিবে না। স্বদেশী-মন্ত্রে দেশ যখন সমাচ্ছন্ন হইবে তখন সকলেরই মনে এই চিন্তা জাগিবে যে—যে দেশে তূলা জন্মে সেই দেশেই উহা পরিস্কৃত, সূত্রাকারে পরিবর্ত্তিত ও বস্ত্র-রূপে নির্ম্মিত না হইবে কেন? স্বদেশী-মন্ত্র যখন সকলের কর্ণকুহরে বাজিয়া উঠিবে, তখন লক্ষ লক্ষ লোক ভারতের আর্থিক দুর্গতি মোচনের জন্য বদ্ধ পরিকর হইবে। ইহার নিমিত্ত হাজার হাজার বৎসর শিক্ষানবিশী করিতে হইবে না। ধর্ম্মের ভাব যখন জাগিয়া উঠিবে, তখন এক মুহূর্ত্তের মধ্যে লোকের চিন্তাস্রোত সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে ছুটিবে। ঐ জন্য কেবল: নিঃস্বার্থ

আত্মত্যাগই একান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমানে এই আত্মত্যাগের ভাব ভারতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই শুভ মুহূর্ত্তে যদি আমরা স্বদেশী প্রচারে অসমর্থ হই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমাদিগকে মহা নৈরাশ্যে হাত গুটাইতে হইবে। প্রত্যেক হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শি. খৃষ্টান, ইহুদী—যিনি আপনাকে এদেশের অধিবাসী বলিয়া বিশ্বাস করেন—তাঁহাকেই আমি স্বদেশী-পণ গ্রহণ করিবার জন্য অনুনয় করিতেছি। আমি তাঁহাদের নিকট আরও অনুনয় করিতেছি যে, তাঁহারা আপনাদের আত্মীয়-স্বজনগণকেও এই স্বদেশী-পণ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করুন। আমার বিশ্বাস এই যে, আমরা যদি আমাদের দেশের জন্য এই সামান্য কার্য্যটুকু করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের এদেশে জন্ম বৃথা। যাঁহারা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে, এইরূপ স্বদেশীর মধ্যেই খাঁটী অর্থনীতি নিহিত রহিয়াছে। আশা করি প্রত্যেক নরনারী আমার এই বিনীত প্রস্তাব নিবিষ্টভাবে অনুধাবন করিবেন। ইংরাজের অর্থনীতির অনুকরণ করিতে গেলে, আমরা কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়া ধ্বংসের পথে পরিচালিত হইব।

স্বদেশী ও বয়কট্।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই এপ্রিল দিল্লী রওনা হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত গান্ধী স্বদেশবাসীকে নূতন উদ্যমে স্বদেশী-পণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। তৎকালে তিনি স্বদেশী ও বয়কটের পার্থক্য নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে বলেন,—

স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন এক নহে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, স্বদেশীর ভিত্তি ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশীয় শিল্পের উন্নতি বিধানে সকলেরই যত্নপর হওয়া কর্ত্তব্য। উৎসাহের অভাবে অনেক স্বদেশী

শিল্প প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা বলেন, বর্ত্তমান অবস্থায় স্বদেশী শিল্পের উন্নতি হইতে পারে না, তাঁহাদের যুক্তি আমি ন্যায়সঙ্গত মনে করি না; কারণ বর্ত্তমান অবস্থায় কেবল কয়েক লক্ষ মাত্র লোক স্বদেশী-পণ গ্রহণ করিলে, তাহারই চাহিদা স্বদেশজাত দ্রব্যে পূরণ হওয়া সম্ভবপর নহে। আমি বিলাতী জিনিষ 'বয়কটে'র বিরোধী; কারণ উহার মধ্যে অশান্তি ও বিরক্তির ভাব বিদ্যমান। আমলাতন্ত্রের (Bureaucrats) সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই। সত্যগ্রহের নীতি অনুসারে শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন কুভাব আমরা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারি না। এজন্য আমি 'বয়কট্'-নীতির সমর্থন করিতে অপারগ। স্বদেশীর অর্থ, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের পক্ষেই আত্মত্যাগ। অতএব স্বদেশী দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই স্বদেশহিতৈষীরূপে সততায় ও ত্যাগ-স্বীকারে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। যাঁহারা স্বদেশী-পণ গ্রহণে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে স্ব স্ব বিদেশী দ্রব্য সর্ব্বাগ্রে দগ্ধ করিতে হইবে। এই পণ গ্রহণে দু'দিন বিলম্ব করিলে কোন ক্ষতি নাই; তবে বর্ত্তমান আন্দোলনের সাফল্য লাভকল্পে পণগ্রহণকারীর সংখ্যা যত অধিক হয়, ততই ভাল।

ভারতীয় শাসন-সংস্কার।

ভারতীয় শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু ও বড়লাট লর্ড চেম্‌স-ফোর্ডের প্রস্তাবিত 'স্কিম্' প্রকাশিত হইবার পর, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই জুলাই শ্রীযুক্ত গান্ধী মাদ্রাজের জননায়ক শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি চিঠি লিখেন,—

সম্প্রতি প্রকাশিত শাসন-সংস্কার 'স্কিম্' সম্বন্ধে আমার অভিমত সাধারণকে জানাইবার জন্য আপনি আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। 'কংগ্রেস' ও 'লিগ' প্রণীত শাসন-সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়নে আমি বিশেষ

উৎসাহ বোধ করি নাই, তাহা আপনি জানেন। দেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলন চলিতেছে, তাহার ভিতর আমি নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া দিতে পারি নাই। কোনরূপ আড়ম্বর না করিয়া আমি ইহাও জানাইতেছি যে, উৎসাহী ও তীক্ষ্ণধী রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে প্রস্তাবিত স্কিম্‌টী যেমন অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা কর্ত্তব্য, আমি এখনও সেরূপভাবে উহা পাঠ করিতে পারি নাই।

আমার মতে, এই সংস্কার 'স্কিম্‌টী' রচনা-কৌশলে 'কংগ্রেস' ও 'লিগ' প্রণীত শাসন-সংস্কার প্রস্তাব হইতে শ্রেষ্ঠতর। আমি ইহা স্বীকার করি যে, মিঃ মণ্টেগু ও লর্ড চেম্‌সফোর্ড উভয়েই উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ২০শে আগষ্টের মহাঘোষণা পরিপূরণে ও ভারতের কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হইয়াছেন। উক্ত জটিল ও দুরূহ কর্ত্তব্য সাধনের জন্য তাঁহারা বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। আমি ইহা না বলিয়াই পারি না যে, আমরা নির্ব্বিচারে অবিলম্বে ঐ সংস্কার 'স্কিমটী' বর্জ্জন করিলে উহা ভারতের পক্ষে মহা দুর্ভাগ্যের কারণ হইবে। আমার মতে এই সংস্কার স্কিম্‌টীকে সরাসরি নস্যাৎ না করিয়া, সহৃদয়তার সহিত উহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য; কারণ উহা নানা রকমে সংশোধন করিয়া, সংস্কারকগণকে গ্রহণ করিতে হইবে। মোটামুটি 'কংগ্রেস' ও 'লিগ' প্রণীত সংস্কার প্রস্তাবই আমাদের মাপকাঠি। 'কংগ্রেস' ও 'লিগ' প্রণীত শাসন-সংস্কার প্রস্তাব যতই স্থূল হউক না কেন, তদন্তর্গত যাবতীয় প্রার্থিত অধিকারগুলি এই 'স্কিমের' অন্তর্ভূক্ত করিয়া লইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ চেষ্টা করিতে হইবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি যে, শাসন-ব্যাপারে বাটোয়ারা-নীতি বর্জ্জন করা হউক। প্রাদেশিক শাসনক্ষেত্রে দ্বৈত (Dual) পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে, প্রাথমিক পরীক্ষায় সাফল্যলাভ আদৌ ঘটিবে কিনা, ইহাই আমার আশঙ্কা; অথচ আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি ঐ সাফলের উপরই নির্ভর

করিতেছে। অতএব কোন কোন বিভাগের কর্ত্তৃত্ব, সরকারী কর্ম্মচারীদের হাতে একচেটিয়া করিয়া রাখার কল্পনা একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে। আলোচ্য 'স্কিমে' একটা শোচনীয় সন্দেহ পরিস্ফুট হইয়াছে যে, আমরা যেন খাঁটী বৃটিশ স্বার্থ ও খাঁটী ভারতীয় স্বার্থ—এই উভয়ের মধ্যে ব্যবহারের তারতম্য করিব। এই সন্দেহের নিদর্শন, সংরক্ষিত বিষয়-সমূহের (Reserved Subjects) সুদীর্ঘ তালিকায় পরিদৃষ্ট হইবে। আমার মতে ঐ সকল স্বার্থ সম্বন্ধে সরলভাবে নিঃসঙ্কোচে স্পষ্টাপষ্টি বোঝাপড়া হওয়া আবশ্যক। বৃটিশ রাজনীতিকগণ পৃথক্‌ভাবে অথবা বৃটিশ ও ভারতীয় রাজনীতিকগণ সম্মিলিত হইয়া যত বড় স্কিমই প্রস্তুত করুন না কেন, ঐরূপ বোঝাপড়া হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন বলিয়া আমি মনে করি। আমি একান্ত শিষ্টভাবে অথচ অতীব দৃঢ়তার সহিত ইহাই বলিতে চাই যে, ঐ সকল স্বার্থের আলোচনাকালে সারা ভারতের উন্নতির দিকে দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে রাখিতে হইবে। সুতরাং যে স্বার্থ ভারতের উন্নতির যতটুকু প্রতিকূল তাহা ততটুকু খর্ব্ব করিতেই হইবে।

অতএব আমার যদি ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আমি এদেশের সামরিক ব্যয় হ্রাস করিতাম। আমাদের স্বদেশজাত যে সকল দ্রব্যকে বৈদেশিক জিনিষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়, আমার সাধ্য থাকিলে, সেই সকল শিল্প রক্ষার জন্য বিদেশাগত দ্রব্যজাতের উপর গুরু করভার নির্দ্দেশ করিতাম। আমি সরকারী কার্য্য হইতে বৃটিশ কর্ম্ম-চারীর সংখ্যা হ্রাস করিতাম—কেবল উপদেশ দান ও কার্য্য পরিচালনার জন্য যতগুলি দরকার ততগুলি রাখিতাম।

বিজেতার দাবী ব্যতীত অপর কোন দাবী তাঁহাদের আছে বলিয়া আমি মনে করি না। আমাদের হৃদয়ে দেশাত্মবোধ জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে

আমরা যেমন প্রনষ্ট শক্তি লাভ করিতে থাকিব, তেমনই তাঁহাদের দাবীও খর্ব্ব হইতে থাকিবে। অবশ্য ইহা তাঁহাদের পক্ষে প্রশংসার কথা যে, তাঁহারা বিজেতা বলিয়া কোন দাবী উথাপন করেন নাই।

শাসন-সংস্কার রিপোর্টে ভারতীয় সিভিল-সার্ভিসের কর্ত্তব্য সাধনে নিষ্ঠা ও দক্ষতা সম্বন্ধে যে সুখ্যাতি করা হইয়াছে, তাহার সহিত আমরা একমত না হইয়া পারি না। আর্থিক হিসাবে ঐ শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা যোগ্যতার অতিরিক্ত বেতন ও পুরস্কার পাইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের গুণাবলী আয়ত্ত করাই আমাদের পক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায়। এদেশে শাসন কার্য্যে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের জন্য যে অত্যধিক ব্যয় হইতেছে, তাহা ধ্বংসকর। যে শাসন-সংস্কার ঐ ব্যয়ভার লাঘব না করিবে, তদ্দ্বারা দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে না। আইন, সুশাসন ও শান্তি উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিবার জিনিষ। কিন্তু আমাদের জনসাধারণ ভীষণতম দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হইতেছে। অতএব সংস্কারকগণকে ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, এদেশের জনসাধারণ যে গুরু করভারে প্রপীড়িত হইতেছে, তাহা যেন লঘু হয়—কর যেন আর কিছুতেই বর্দ্ধিত না হয়। এই মূল নীতিটী যদি কর্ত্তৃপক্ষ স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। আমি নিশ্চিন্ত চিত্তে বলিতে পারি যে, অন্যান্য বিষয়ে বৃটিশ স্বার্থ তাঁহাদের নিজেদের হাতে যেমন সুরক্ষিত, ভারতীয়গণের হাতেও ঠিক তেমনই সুরক্ষিত রহিবে।

কংগ্রেস ও মোসলেম লিগ, সিভিল-সার্ভিসের উচ্চ পদগুলির শতকরা পঞ্চাশটী দেশীয়গণের জন্য এখনই দাবী করিয়াছেন। আমরা সম্মান সহকারে, দৃঢ়তার সহিত, ঐরূপ দাবীই করিব।

জাতীয় ভাষা।

ভারতের জাতীয় ভাষা (*Lingua franca*) কি হইবে, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত গান্ধী বলেন,—

এদেশের জাতীয় ভাষা এমন হওয়া চাই, যাহা দ্বারা নিম্নলিখিত পাঁচটী সর্ত্ত পূরণ হইতে পারে,—

(১) রাজপুরুষগণ যেন তাহা সহজে আয়ত্ত করিতে পারেন।

(২) জনসাধারণ যেন তাহা দ্বারা ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে পরস্পরের মনোভাব সহজে আদান-প্রদান করিতে পারে।

(৩) অধিকাংশ লোক যেন সেই ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে।

(৪) সাধারণ লোকে যেন সহজে সেই ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিতে সক্ষম হয়।

(৫) ঐ ভাষা কেবল সাময়িক প্রয়োজন সাধনের জন্য অস্থায়ী-ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া যেন বিবেচিত না হয়।

উল্লিখিত পাঁচটী সর্ত্তের কোনটীই ইংরাজী ভাষার দ্বারা পূরণ হওয়া সম্ভবপর নহে। একমাত্র হিন্দী ভাষা, এই কয়টী সর্ত্ত পূরণে সক্ষম। মুসলমান রাজত্বকালেও হিন্দী এদেশের জাতীয় ভাষা ছিল। মুসলমান বাদসাহগণ হিন্দীর পরিবর্ত্তে আরবী বা ফারসী ভাষা প্রবর্ত্তন করা যুক্তিযুক্ত বোধ করেন নাই।

উত্তর ভারতে হিন্দু ও মুসলমানগণ হিন্দী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। ঐ ভাষা দেবনাগরী ও আরবী, এই দুইরূপ অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে। হিন্দী, ঠিক সংস্কৃত নহে—আরবী নহে—ফারসীও নহে; কিন্তু দেশের জনসাধারণের ভাষা। উহার মধ্যে আমি যে বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই, তাহা লক্ষ্ণৌর ফারসী মিশ্রিত ভাষায় বা প্রয়াগের

পণ্ডিতমণ্ডলীর কথিত সংস্কৃত মিশ্রিত ভাষায় দেখিতে পাই না। আশা করি হিন্দী ও উর্দ্দূ পরস্পর মিলিত হইয়া অনন্তকাল প্রচলিত থাকিবে; মুসলমানেরা ফারসী ও হিন্দুগণ দেবনাগর অক্ষর ব্যবহার করিবেন। উভয়বিধ অক্ষরই জাতীয় বলিয়া পরিগৃহীত হইবে। মুসলমানেরা উর্দ্দূকে জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এখন যদি হিন্দী-উর্দ্দূ বিতণ্ডা মিটিয়া যায়, তাহা হইলে জাতীয় ভাষার সমস্যা সহজেই সমাধান হইবে। আমাদিগকে যদি ইংরাজী ভাষার বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে হিন্দী-উর্দ্দূ বিতণ্ডা বন্ধ করিতেই হইবে। আমি ইংরাজী ভাষার বিরোধী নহি; তবে মনে করি যে, কেবল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ইংরাজীর সাহায্যে অর্জ্জিত হইতে পারে।

মাতৃভাষার উপযোগিতা।

ডাক্তার মেটার লিখিত "স্বায়ত্ত-শাসন সিরিজ" নামক পুস্তকাবলীর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত গান্ধী এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন,—

ছাত্রগণকে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করা জাতীয়তার হিসাবে নিতান্ত প্রয়োজন। মাতৃভাষা উপেক্ষা করিলে জাতির আত্মহত্যা ঘটে। ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দানের সমর্থনকারী অনেক মাতব্বর ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়গণ এদেশে দেশহিতকর ও জনহিতকর তাবৎ অনুষ্ঠানের পরিচালক; সুতরাং ইংরাজী না শিখিলে কিছুতেই চলিবে না। বস্তুতঃ এদেশে সমস্ত শিক্ষাই ইংরাজীতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে আমরা শিক্ষার জন্য যতটা সময় ক্ষেপণ করি, তদনুরূপ ফল পাই না। জনসাধারণের উপর আমাদের কোন হাত নাই।

এ সম্বন্ধে সম্প্রতি বড়লাট যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধান-যোগ্য। তিনি ঐ সমস্যার সমাধান কিছু করিতে পারেন নাই বটে; কিন্তু, আমাদের বিদ্যালয়সমূহে মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের উপযোগিতা বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছেন। পূর্ব্ব ও মধ্য ইউরোপের ইহুদীগণ পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়াইয়া থাকিলেও তাঁহারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা ও ভাব বিনিময়ের নিমিত্ত একটী সাধারণ ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া, ইহুদী ভাষার উন্নতি সাধন করিয়াছেন। পৃথিবীর সাহিত্যে সুবিখ্যাত শ্রেষ্ঠ পুস্তকরাজি ইহুদী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইহুদীরা বহু বৈদেশিক ভাষায় অভিজ্ঞ হইলেও, তাঁহাদের প্রাণের পিপাসা তাহাতে মিটে নাই। উচ্চশিক্ষিত ইহুদীগণ সাধারণ ইহুদীদের বৈদেশিক ভাষা শিখাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন না। ফলে, যে ইহুদীভাষা এক সময়ে শুধু মৌখিক ভাষারূপে প্রচলিত ছিল—ইহুদী সন্তানগণ যাহা জননীর মুখে শুনিয়া শিখিত—তাহাই আজ পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার আয়ত্ত করিয়া গৌরবের আসন অধিকার করিয়াছে। ইহা সত্য সত্যই অদ্ভুত! এক পুরুষের মধ্যেই এতটা উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সেকালে ওয়েব্‌ষ্টার অভিধানে এই ভাষার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল যে, ইহা নানা ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন মৌখিক ভাষা—নানা দেশের ইহুদীরা ইহা নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এখন কিন্তু ইহুদী ভাষার সংজ্ঞা ঐরূপ নির্দ্দেশ করিলে পূর্ব্ব ও মধ্য ইউরোপের ইহুদীগণ অসম্মান বোধ করিবেন। ইহুদী পণ্ডিতেরা যদি এক পুরুষের মধ্যে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের সকলকে এমন একটা গৌরবজনক উন্নত ভাষার অধিকারী করিয়া তুলিতে পারেন, তবে আমাদের সুমার্জ্জিত মাতৃভাষার উন্নতি সাধন কি তাহাপেক্ষা সহজ নহে?

দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসেও এই শিক্ষা পরিস্ফুট। তথায় 'তাল' (ওলন্দাজ ভাষার অশুদ্ধ সংস্করণ) ও ইংরাজী ভাষার মধ্যে সংঘর্ষ

চলিয়াছিল। বুয়র জনক-জননী, সন্তান-সন্ততিগণের সহিত যে 'তাল' ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন, তাহার পরিবর্ত্তে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করিলে ছেলে-পুলেরা উহার চাপে মুস্‌ড়াইয়া যাইবে, ইহা অনুধাবন করিয়া বুয়রগণ কিছুতেই ইংরাজী চালাইতে সম্মত হন নাই। সেখানেও ইংরাজী চালাইবার পক্ষে অনেক মাতব্বর ব্যক্তি দাঁড়াইয়াছিলেন; কিন্তু শেষে বুয়রগণের স্বদেশ-হিতৈষণার নিকট ইংরাজীর পরাজয় হইয়াছিল। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বুয়রগণ উচ্চ-অঙ্গের ওলন্দাজী ভাষাও বর্জ্জন করিয়াছিলেন। কাজেই বিদ্যালয়ের যে সকল শিক্ষক পূর্ব্বে বিশুদ্ধ ওলন্দাজী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন, তাঁহারা সহজ 'তাল' ভাষা শিখাইতে বাধ্য হইলেন। ফলে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ লোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, সেই 'তাল' ভাষায় অধুনা অনেক সুন্দর সাহিত্য রচিত হইতেছে।

এদিকে আমরা আত্মবিশ্বাসের অভাব হেতু মাতৃভাষার উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছি। ইহা ধ্বংসের পূর্ব্ব লক্ষণ। মাতৃভাষার উপর যদি আমাদের শ্রদ্ধা না থাকে, তাহা হইলে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার যতই উদারতা ও সহৃদয়তার সহিত প্রদত্ত হউক না কেন, আমরা কিছুতেই স্বায়ত্ত-শাসনশীল জাতিতে পরিণত হইতে পারিব না।

বিদেশী ভাষায় শিক্ষাদানের কুফল।

বোম্বাই—বরোচে 'গুজরাট শিক্ষা সম্মেলনে'র সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত গান্ধী এই মর্ম্মে বলেন,—

ছাত্রগণকে কোন্ ভাষায় শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, ইহা সর্ব্বাগ্রে নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে দুই রকম মত শুনিতে পাওয়া যায়। একদল

বলেন, মাতৃভাষায় (গুজরাটী) শিক্ষাদান করা উচিত; আর একদল ইংরাজীর পক্ষপাতী। উভয় দলেরই উদ্দেশ্য সৎ। উভয় দলের লোকে-রাই দেশের মঙ্গল কামনা করেন; কিন্তু সঙ্কল্প সাধু হইলেই ত ইপ্সিত সুফল লাভ হয় না। সাংসারিক অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয় যে, উদ্দেশ্য সৎ হইলেও লোকে অনেক সময়ে অসৎ পথে গিয়া পড়ে। অতএব উভয় মতের ভালমন্দ বিচার করিয়া দেখা যাউক। এই জটিল সমস্যাটী সারা ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য। তবে প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসিগণ সর্ব্ব-সাধারণের একতার অপেক্ষা না করিয়া স্ব স্ব সুবিধানুযায়ী মীমাংসাও করিতে পারেন।

এই সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত অন্যান্য প্রদেশে কিরূপ চেষ্টা ও আন্দোলন চলিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে আমাদের সিদ্ধান্ত অনেকটা সহজ হইবে। বঙ্গ-ভঙ্গের সময়ে বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষাদানে সমুৎসুক হইয়াছিলেন। ঐ উদ্দেশ্যে তাঁহারা বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং অনেক টাকা ঢালিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে তাঁহাদের চেষ্টা বিফল প্রতিপন্ন হয়। আমার মতে ঐ কার্য্যের ব্যবস্থাপকগণ ও শিক্ষকগণ নিজেদের উপর বিশ্বাসবান ছিলেন না বলিয়াই, তাঁহাদের উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছিল। সে সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালীরা ইংরাজী ভাষার মোহ কাটাইতে পারেন নাই।

কেহ কেহ বলেন, বাঙ্গালীরা ইংরাজী ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন বলিয়াই বাঙ্গালা ভাষার সৌকর্য্য সাধনে সমর্থ হইয়াছেন। ইহার উত্তরে আমি বলি যে, স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত সুললিত বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার ইংরাজী জ্ঞানের ফল নহে। ভারতের আব্‌হাওয়ায় তিনি ঐ ভাব-সম্পদ্ অর্জ্জন করিয়াছেন। উহা উপনিষদের দান। মহাত্মা মুন্সীরাম ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা খাটে।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী হিন্দী ভাষার যে উন্নতি-বিধান করিয়াছেন, তাহা ইংরাজী শিক্ষার ফলে নহে। তুকারাম ও রামদাস প্রমুখ যে সকল লেখক মারাঠী ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা ইংরাজীর নিকট আদৌ ঋণী নহেন। কবি প্রেমানন্দ ও শ্যামল ভাট হইতে আরম্ভ করিয়া দলপৎরাম পর্য্যন্ত যে সকল সুধী সাহিত্যিক গুজরাটী ভাষার সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের উপর ইংরাজী ভাষার দাবী কিছুই নাই।

ভাষার গঠন কিরূপে হয়? আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেক জাতির চরিত্র অনুসারে তাহার ভাষা সংগঠিত হইয়া থাকে। যে জাতির প্রকৃতি ও কার্য্য-কলাপ যেরূপ, তাহার ভাষাও সেইরূপ। আমরা যে সাতিশয় সুমার্জ্জিত ও ছন্দোবদ্ধ ভাষা ব্যবহার করি, ইহাতে বুঝা যায় যে, এ জাতি বহু পুরুষ যাবৎ পরাধীন রহিয়াছে। ইংরাজী ভাষায় বহু নাবিক (nautical) শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। গুজরাটী ভাষায় তাহা আনয়ন করা যায় না; তবে যদি আমরা কখনও জাহাজ চালাইতে আরম্ভ করি তাহা হইলে নাবিক শব্দ আপনা আপনি আমাদের ভাষায় দেখা দিবে।

আর্য্য-সমাজের নেতৃগণ গুরুকুল বিদ্যালয়ে হিন্দী ভাষায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিয়া প্রভূত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। অভিজ্ঞ শিক্ষকগণের অভিমত এই যে, যে বিষয় ইংরাজী ভাষায় আয়ত্ত করিতে ছাত্রগণের ষোল বৎসর লাগে, তাহা তাহারা মাতৃভাষায় দশ বৎসরে শিখিয়া ফেলে। মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদত্ত হইলে এদেশে হাজার হাজার ছাত্রের শিক্ষাকাল যদি ছয় বৎসর বাঁচিয়া যায়, তবে তাহা জাতির পক্ষে বড় কম লাভ নহে! বিদেশী ভাষার মারফতে শিক্ষালাভ করিতে হয় বলিয়া আমাদের দেশের যুবকেরা দিন দিন শক্তিহীন, উৎসাহহীন ও প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছে। তাহারা বিবর্ণ—চিররুগ্ন—পরানুকরণে অভ্যস্ত! বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উৎসাহ, উদ্যম, মৌলিকতা, সাহসিকতা, বিচারশক্তি

ও নির্ভীকতা সঙ্কুচিত হয়। তাহারা যাহা আরম্ভ করে, তাহা শেষ করিয়া উঠিতে পারে না। তাহাদের মধ্যে দু'একজন যদি বা উৎসাহের পরিচয় দেয়, তাহারা অল্প বয়সেই প্রাণত্যাগ করে।

দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসিগণ যেমন সংযমী তেমনই সবলকায়। আমাদের মত বাল্য-বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথা তাহাদের ভিতর নাই। কিন্তু সেখানে ওলন্দাজী ভাষায় শিক্ষা প্রদত্ত হওয়ায় তাহারাও আমাদের মত দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা এখন পাশ্চাত্য রীতি-নীতির বিফল অনুকরণে নিবিষ্ট। মাতৃভাষা হারাইয়া তাহারা সমস্ত উদ্যম ও মৌলিকতা বিসর্জ্জন দিয়াছে।

ইংরাজী-শিক্ষিত আমরা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না যে, ইংরাজী শিক্ষার ফলে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। জনসাধারণের উপর আমাদের প্রভাব কতটুকু, ইহা ভাবিয়া দেখিলে ক্ষতির পরিমাণ কতকটা ধরা পড়ে। আমাদের মধ্যে জনৈক 'বসু' বা জনৈক 'রায়' জন্মিয়াছেন বলিয়া আমরা গর্ব্ব প্রকাশ করি। কিন্তু আমি জোরপূর্ব্বক বলিতেছি যে, গত পঞ্চাশ বৎসর যদি আমরা দেশীয় ভাষায় শিক্ষা লাভ করিতাম, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে এত 'বসু' বা এত 'রায়' জন্মিতেন যে, তাঁহাদের নামে আর বিস্ময় প্রকাশ করিতে হইত না। জাপানীরা মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করে বলিয়াই অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে। শিক্ষা-বলে তাহারা নূতন প্রাণ পাইয়াছে—তাই সারা পৃথিবী তাহাদের কার্য্য-কলাপে অবাক্! বৈদেশিক ভাষায় শিক্ষালাভের কুফল অনেক। মাতৃ-স্তন্যের সঙ্গে যে শিক্ষা-দীক্ষা আমরা পাই, তাহার সহিত বিদ্যালয়ে অর্জ্জিত শিক্ষার সামঞ্জস্য থাকা চাই। বিদেশী ভাষায় শিক্ষা লাভ করিলে, এ সামঞ্জস্য থাকে না। যিনি এই সামঞ্জস্য ভাঙ্গিয়া দেন, তাঁহার উদ্দেশ্য যতই সৎ হউক, তিনি দেশের শত্রু। ইহার কুফল কেবল এইটুকু

নহে। বৈদেশিক ভাষায় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ফলে, এদেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ব্যবধান জন্মিয়াছে।

বিপ্লববাদ।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে কলিকাতায় কলেজ স্কয়ারে 'ষ্টুডেণ্টস হল' ভবনে বঙ্গীয় শাসন-পরিষদের তৎকালীন সদস্য অনারেবল মিঃ লায়নের সভাপতিত্বে আহূত সভায়, শ্রীযুক্ত গান্ধী ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া এই মর্ম্মে বলেন,—

যদিও আমার পরলোকগত গুরু মিঃ গোখেল আদেশ করিয়াছিলেন যে, এখানে অবস্থানকালে আমি শুধু সকল কথা শুনিয়া যাইব, পরন্তু কোন উচ্চবাচ্য করিব না, তথাপি এই সভায় বক্তৃতা করিবার প্রলোভন আমি ত্যাগ করিতে পারিলাম না। আমার স্বর্গীয় গুরুদেব বলিতেন যে, ছাত্রগণের পক্ষে রাজনীতি চর্চ্চা একেবারে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত নহে। আমারও অভিমত তাই। ছাত্রগণ কেন রাজনীতি অধ্যয়ন করিবে না এবং কেনই বা তাহারা রাজনীতির সংস্রবে থাকিবে না, ইহার হেতু আমি বুঝিতে পারি না। আমার মতে রাজনীতি ধর্ম্মবর্জ্জিত হওয়া উচিত নহে। ছাত্রগণ! আশা করি আপনারা আমার সহিত, আপনাদের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের সহিত এবং সম্মানভাজন সভাপতির সহিত এ বিষয়ে একমত হইবেন যে, সাহিত্য শিক্ষার ফলে যদি আপনাদের চরিত্র গঠিত না হয়, তাহা হইলে সে শিক্ষার মূল্য কিছুই নাই। ইহা কি বলা যাইতে পারে যে, এদেশের ছাত্রগণ ও জননায়কগণ সম্পূর্ণ নির্ভয়? আমি এতদিন বিদেশে ছিলাম বটে, কিন্তু এই প্রশ্নই সর্ব্বদা আমার মনে জাগিত। রাজনৈতিক ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড কি, আমি বুঝি। এই বিষয়টী আমি বিশেষ প্রণিধান সহকারে চিন্তা করিয়াছি এবং শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এদেশের কতকগুলি ছাত্র

প্রবল স্বদেশ-প্রেমে ও অতুল উত্তেজনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু তাহারা জানে না যে, দেশ-হিতৈষণার শ্রেষ্ঠ পন্থা কি। আমার বিশ্বাস, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অতি নীচ উপায় অবলম্বন করিয়াছে; কারণ ভগবানের ভয় তাহারা রাখে না—পরন্তু মানুষের ভয়ে পরিচালিত হইয়া থাকে। আমি যদি রাজদ্রোহের পক্ষপাতী হইতাম, তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে তাহা প্রকাশ করিতাম এবং তাহার ফল নিজেই শির পাতিয়া লইতাম। এরূপ করিলে ভণ্ডামির কলঙ্ক গায়ে লাগে না। ছাত্রগণ ভারতের আশাস্থল—বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভরসাস্থল। তাহারা যদি ভগবানের ভয় না রাখে, পরন্তু মানুষের ভয়ে—কর্ত্তৃপক্ষের ভয়ে অর্থাৎ গভরমেণ্টের ভয়ে (গভরমেণ্টের প্রতিনিধিগণ বৃটনবাসী হউন বা এদেশবাসীই হউন) পরিচালিত হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে দেশের সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে।

ছাত্রগণ! তোমরা ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া মন সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিও। যে সকল যুবক ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইয়াছে, তাহারা বিপথে ছুটিয়াছে। তাহাদের সহিত কোন সংস্রব রাখা উচিত নহে। তাহারা নিজের শত্রু—দেশের শত্রু; তবে তাহাদিগকে ঘৃণা করিও না। গভরমেণ্টের উপর আমার বিশ্বাস নাই—কোন গভরমেণ্টই আমি চাহি না। আমার মতে যে গভরমেণ্ট সর্ব্বাপেক্ষা কম শাসন করেন, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমার ব্যক্তিগত অভিমত যাহাই হউক, আমি একথা বলিতে বাধ্য যে বিপথচালিত যুবকেরা উন্মাদনার বশে ডাকাতি ও গুপ্তহত্যা করিয়া কোন উপকার করিতে পারিবে না। ডাকাতি ও গুপ্তহত্যা ভারতবাসীর স্বভাবসিদ্ধ নহে। ঐ ভাব বিদেশ হইতে আসিয়াছে। উহা এদেশ স্থায়ী হইবে না। ইতিহাস প্রমাণ দিতেছে যে, অহিতকারীকেও ঘৃণা করিতে নাই; তাহাকে হত্যা করিবার অধিকার কাহারও নাই। গুপ্তহত্যা পাশ্চাত্য ভাবের ফল। আপনারা

সাবধান হউন—পাশ্চাত্য কুভাব অনুকরণ করিবেন না। ঐ ভাব দেশে কি ক্ষতিই না করিয়াছে! যুবকগণ যদি মনে করিয়া থাকেন যে, ঐ ভাব অনুকরণ করিয়া তাঁহারা ভারতের বিন্দুমাত্র মঙ্গল সাধন করিবেন, তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

ভারতের পক্ষে কোন্ গভরমেণ্ট—বৃটিশ গভরমেণ্ট, না পূর্ব্বতন গভরমেণ্ট—ভাল, ইহা আমি আলোচনা করিব না। তবে আমার ধারণা এই যে, বৃটিশ গভরমেণ্টের বহুল উন্নতি হওয়া এখনও প্রয়োজন।

হে নবীন বন্ধুগণ! তোমরা জীবনে নির্ভয় হইও, মনে মুখে এক রাখিও এবং সতত ধর্ম্মনীতি মানিয়া চলিও। দেশের প্রতি যদি তোমাদের কিছু কর্ত্তব্য থাকে, তবে তাহা প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করিও। ধর্ম্ম ও নীতি তোমাদের পথ-প্রদর্শক হউক। ঐ দুইটী জিনিষ বজায় রাখিবার জন্য যদি তোমরা প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হও, আমিও তোমাদের সহযাত্রী হইব। তখন তোমাদের উপদেশ আমি মানিয়া চলিব। কিন্তু তোমরা যদি দেশে বিপ্লব উৎপাদন করিতে উদ্যত হও, তাহা হইলে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইব।

জননায়কের পুরস্কার কি?

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে মহীশূর-বাঙ্গালোরে নাগরিকগণের প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে শ্রীযুক্ত গান্ধী বলেন,—

লোকে আমার সম্মানার্থ গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইবে, ইহা আমি পছন্দ করি না। পছন্দ না করিবার একটা কারণ আছে। জনসাধারণ যদি নেতৃগণকে গাড়ীতে বসাইয়া টানিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। নেতৃগণের পক্ষে নীরবে কর্ম্ম করাই ভাল। তাঁহারা লোকের নিকট সম্মানিত হইবার আশায় কাজে

লাগিবেন, এই ভাব বাড়িতে দেওয়া উচিত নহে। বরং তাঁহারা মনে রাখিবেন যে, লোকে হয়ত তাঁহাদের প্রতি ঢিল ছুড়িবে, অবজ্ঞা করিবে, তথাপি দেশকে ভালবাসিতে হইবে—কারণ স্বদেশ-সেবাই তাঁহাদের একমাত্র পুরস্কার।

আমাদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ উঠিয়াছে যে, জাতি হিসাবে আমরা বড়ই আড়ম্বরপ্রিয়; কর্ম্মোপযোগী সংযমশীলতা আমাদের নাই। আমরা এ দোষ বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লইতেছি। এখন আমরা আধুনিক কর্ম্ম-প্রবণতার অনুকরণ করিব, না এত দিনের প্রচণ্ড সংঘর্ষেও যে প্রাচীন সভ্যতা জীবিত রহিয়াছে তাহার অনুসরণ করিব? আসুন আমরা আধ্যাত্মিক দিক্ হইতে রাজনীতি-মঞ্চে কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রতী হই; তাহা হইলে আমরা বিজেতাকেও জয় করিতে পারিব। আমরা যখন আপনাদিগকে ইংরাজের সমকক্ষ নাগরিক বলিয়া মনে করিতে সক্ষম হইব, তখনই অরুণোদয় হইবে। সে দিন শীঘ্রই আসিবে; কিন্তু কবে আসিবে, নির্দ্দেশ করা দুরূহ। সৌভগ্যক্রমে আমি অনেক চরিত্র-বান, ধর্ম্মপ্রাণ, সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী ইংরাজের সহিত মিলামিশার সুবিধা পাইয়াছিলাম। আমি আপনাদিগকে নিশ্চয়রূপে জানাইতেছি যে, আধুনিক কর্ম্ম-প্রবণতার তরঙ্গ কাটিয়া যাইতেছে; শীঘ্রই জগতে এক অভিনব মহত্তর সভ্যতা আবির্ভূত হইবে।

ভারতবর্ষ বৃটিশ সম্রাজ্যের অন্তর্গত বৃহৎ দেশ; তাহার মধ্যে মহীশূর একটী প্রধান দেশীয় রাজ্য। আপনারা যে দিন বৃটিশ শাসক সম্প্রদায়ের নিকট ও বৃটিশ রাজ-নীতিকগণের নিকট এই বার্ত্তা প্রেরণ করিতে পারিবেন যে, মহীশূরে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং আপনারা বশিষ্ঠের মত সর্ব্ব-জনমানিত মন্ত্রী পাইয়াছেন, সেই দিন বিজেতার নিকট আপনাদের দাবী উত্থাপনের সময় আসিবে।

অহিংসা।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে 'মডারণ রিভিউ' পত্রের অক্টোবর সংখ্যায় শ্রীযুক্ত গান্ধীর লিখিত একখানি চিঠি এই মর্ম্মে প্রকাশিত হয়,—

অতিরিক্ত অহিংসা অভ্যাসের ফলে আমাদের পুরুষোচিত গুণ নষ্ট হইবে, এরূপ আশঙ্কার ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু নাই। গত দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে আমরা জাতি হিসাবে প্রভূত সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু গৃহ-বিচ্ছেদে আমাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে। ফলে এখন স্বদেশ-প্রীতির পরিবর্ত্তে স্বার্থপরতা আমাদের হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছে; অর্থাৎ আমরা ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া অধর্ম্মের পথে ছুটিয়াছি।

জৈনগণের বিরুদ্ধে পুরুষত্বহীনতার অভিযোগ কতদূর আরোপিত হইতে পারে, আমি বলিতে পারি না। তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। বৈষ্ণবের গৃহে আমার জন্ম—কাজেই বাল্যকাল হইতে অহিংসাচরণে আমি শিক্ষিত হইয়াছি। আমার ধর্ম্মজ্ঞান, জৈনশাস্ত্র পাঠ করিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ আলোচনা করিয়া অনেকটা গঠিত হইয়াছে। পরলোকগত জৈন দার্শনিক রাজচাঁদ কবির সংসর্গে বাস করিরা আমি অনেকটা লাভবান হইয়াছি। পৃথিবীর নানা ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে আমার মনে অহিংসা সম্বন্ধে যে ধারণা গঠিত হইয়াছে, তাহার পোষকতার নিমিত্ত আর ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োজন বোধ করি না। উহা যেন আমার জীবনের অংশ হইয়া পড়িয়াছে। সহসা যদি কোন শাস্ত্রগ্রন্থে আমার ধারণার বিপরীত কথা দেখি, তাহা হইলেও অহিংসা সম্বন্ধে অমার পূর্ব্ব সিদ্ধান্তই অটুট রহিবে। ইহার কারণ কি, পরে বলিতেছি,—

আমাদের শাস্ত্রের শিক্ষা এই যে, যে ব্যক্তি কায়োমনবাক্যে অহিংসা সাধনা করেন, তাঁহার পদতলে সারা পৃথিবী লুঠাইয়া পড়ে। তাঁহার

চারিদিকে এমনই একটা প্রভাব বিচ্ছুরিত হয় যে, সর্পাদি হিংস্র জন্তুও তাঁহার কোন অপকার করে না। শুনা যায়, আসিসির সেণ্ট্ ফ্রান্সিস এ বিষয়ে একজন ভুক্তভোগী।

অহিংসা শব্দের পরোক্ষার্থ এই যে, কোন জীবের দৈহিক বা মানসিক ক্লেশ উৎপাদন না করা। অতএব প্রকৃত অহিংসা সাধক, অন্যায়কারীর শরীরে আঘাত করিতে কিম্বা তাহার প্রতি কুভাব পোষণ করিয়া মনে কষ্ট দিতে পারেন না। কিন্তু যদি কুভাবে উদ্বুদ্ধ না হইয়া শুধু স্বাভাবিক কার্য্য সম্পাদন কালে আমি কোন অন্যায়কারীর ক্লেশ উৎপাদন করি, তাহা হইলে তাহা হিংসা পদবাচ্য হইবে না। ধরুন, কোন ব্যক্তি যদি এক বালককে মারিতে উদ্যত হয়, তবে সেই আততায়ীর সম্মুখ হইতে বালককে সরাইয়া লইলে আমি অহিংসা-ভ্রষ্ট হইব না। বরং যে কোন রূপেই হউক, আমি ঐ বালকটীর অভিভাবক হইলে, তাহাকে আততায়ীর কবল হইতে রক্ষা করাই আমার পক্ষে অহিংসা সাধনের প্রকৃত পন্থা। অতএব দক্ষিণ আফ্রিকার নিরুপদ্রব-প্রতিরোধিগণ ইউনিয়ন্ গভরমেণ্টের সঙ্কল্পিত অনিষ্টাচরণে বাধা দিয়া ন্যায়সঙ্গত কাজই করিয়াছিলেন। ইউনিয়ন্ গভরমেণ্টের প্রতি তাঁহাদের কোন বিদ্বেষ ছিল না। যখনই সাহায্যের প্রয়োজন হইয়াছিল, তখনই তাঁহারা গভরমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন। গভরমেণ্টের আদেশ অমান্য করিয়াই তাঁহারা বাধা দিয়াছিলেন; ইহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্কল্প ছিল। অহিংসা সাধনা করিতে হইলে স্বেচ্ছায় আত্মনিগ্রহ ভোগ করিতে হয়—অনিষ্টকারীর ক্ষতি ইচ্ছাপূর্ব্বক করা চলে না।

অহিংসা শব্দের প্রত্যক্ষার্থ—বিশ্বপ্রেম বা শ্রেষ্ঠতম ত্যাগ। অহিংসা সাধক হইতে হইলে শত্রুকেও ভালবাসিতে হয়। অপকারী পিতা বা পুত্রের প্রতি যে নীতি অবলম্বনীয়, অনিষ্টকারী শত্রু বা অপরিচিতের

প্রতিও ঠিক সেই নীতিই প্রযোজ্য। এই কার্য্যকরী অহিংসার মধ্যে সত্যবাদিতা ও নির্ভীকতা বিরাজমান। মানুষ ভালবাসার পাত্রকে কখনও ঠকাইতে পারে না, তাহাকে ভয় করে না, বা ভয় দেখায় না। জীবন দানের তুল্য দান জগতে আর নাই। যে জীবন দান করে, তাহার প্রতি কাহারও বিদ্বেষ থাকে না; তাহার সহিত সকলের সখ্য সহজেই জন্মে। ভয়শূন্য না হইলে কেহ জীবন দান করিতে পারে না। কাজেই কাহারও পক্ষে কাপুরুষ ও অহিংসা-সাধক একসঙ্গে হওয়া সম্ভবপর নহে। অহিংসা সাধনা করিতে হইলে অসীম সাহসের প্রয়োজন। সৈনিক-জীবনের তাবৎ বীরত্বের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ বীরত্ব।

জেনারেল গর্ডনের একটী বিখ্যাত প্রতিমূর্ত্তির হাতে মাত্র একগাছি ছড়ি আমরা দেখিতে পাই। ইহা অহিংসার পথে অনেকটা অগ্রগমনের নিদর্শন বটে; তবে যে সৈনিক ছড়ির সাহায্য গ্রহণ করেন, তিনি প্রকৃত সৈনিকের আদর্শ হইতে ঐটুকু কম। যিনি জানেন, কিরূপে মরিতে হয় এবং কিরূপেই বা অজস্র গুলিবৃষ্টির মধ্যে নিজের কোট অটল ভাবে বজায় রাখিতে হয়, তিনিই আদর্শ সৈনিক। রাজা অম্বরীষ এই শ্রেণীর সৈনিক। তিনি দুর্ব্বাসার দারুণ কোপে পড়িয়াও অবিচলিত চিত্তে নিজের কোট রক্ষা করিয়াছিলেন। ফরাসী গোলন্দাজদের গোলায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াও মুরগণ যখন আল্লা আল্লা রবে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতে করিতে দলে দলে কামানমুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল, তখন তাহারাও ঐরূপ সাহস দেখাইয়াছিল; তবে তাহাদের সাহস হতাশা-সম্ভূত, আর অম্বরীষের সাহস ভালবাসা-সঞ্জাত। মুরগণ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে উন্মুখ হইয়া যে, সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহার ফলে গোলন্দাজেরা হার মানিল। তাহারা বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া টুপি নাড়িতে নাড়িতে কামান দাগা বন্ধ করিল এবং অরাতিদলকে

বন্ধুভাবে কোল দিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় এইরূপ হাজার হাজার নিরুপদ্রব-প্রতিরোধী সামান্য ব্যক্তিগত স্বচ্ছন্দতার বিনিময়ে আত্মসম্মান বিক্রয় করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিল। ইহাই অহিংসার কার্য্যকরী মূর্ত্তি। ইহা আত্মসম্মান বিক্রয়ের ঘোর বিরোধী। কেহ যদি কোন অসহায়া যুবতীকে কেবল অস্ত্রবলে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার নিকট যতটা নিরাপত্তার সম্ভাবনা, তদপেক্ষা অধিকতর সুনিশ্চিত নিরাপত্তা অহিংসা-সাধকের নিকট পাওয়া সম্ভব। শেষোক্ত স্থলে আশ্রয়দাতাকে নিধন না করিয়া আততায়ী কিছুতেই তরুণীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না; কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে আশ্রয়দাতাকে জয় করিতে পারিলেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। প্রথম স্থলে আশ্রয়দাতা দৈহিক বলে যথাশক্তি যুঝিলেই তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইবে; কিন্তু শেষোক্ত ক্ষেত্রে আশ্রয়দাতা আততায়ীর দৈহিক বলের বিরুদ্ধে আপনার আত্মাকে নিয়োগ করেন; কাজেই আততায়ীর আত্মাও জাগ্রত হইবার সম্ভাবনা খুব অধিক। সুতরাং যুবতীর ইজ্জত রক্ষার পক্ষে অন্য যে কোন উপায় অপেক্ষা, ইহাতেই অধিকতর সাফল্যের সম্ভাবনা। অবশ্য যুবতীর নিজের সাহসের নিকট অপর যে কোন উপায়ই নিষ্প্রভ।

আজ যদি আমরা পুরুষোচিত শৌর্য্যহীন হইয়া থাকি, তবে তাহার হেতু—অপরকে আঘাত করিতে না জানা নহে; পরন্তু মরণকে ভয় করাই তাহার কারণ। যে ব্যক্তি মরণাশঙ্কায় প্রকৃত বা কাল্পনিক বিপদের মুখ হইতে পলায়ন করে এবং ভাবে যে, অপর কোন ব্যক্তি সেই বিপদের উৎপাদককে হনন করিয়া বিপদ নাশ করিবে, সে জৈনাবতার মহাবীরের উপাসক নহে—বুদ্ধের বা বেদের আদেশও সে অনুসরণ করে না। কোন ব্যক্তি যদি ব্যবসায়ের ফাঁদে ফেলিয়া কাহাকেও তিল তিল করিয়া

মারিয়া ফেলে, অথবা বাহুবলে কসাইকে বিনাশ করিয়া কয়েকটী গবীর উদ্ধার সাধন করে, কিম্বা দেশ-হিতৈষণার উত্তেজনায় জনকয়েক রাজ-কর্ম্মচারীকে হত্যা করিতে ছুটে, তাহা হইলে তাহাকে অহিংসা-সাধক বলা চলে না। এই সকল কার্য্য ভয়, বিদ্বেষ ও কাপুরুষতার ফল। এখানে দেশের প্রতি বা গবীর প্রতি ভালবাসা কিছুই নহে; পরন্তু উহা নিজের আত্মম্ভরিতা পোষণের উপলক্ষ্য মাত্র।

আমার বিনীত অভিমত এই যে, অহিংসা শব্দের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে পার্থিব ও অপার্থিব সর্ব্ববিধ বিপদের প্রতিকার, আমাদের মুঠার মধ্যে আসিবে। এ জগতে অতিরিক্ত অহিংসা-সাধন কখনই সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমান সময়ে আমরা অহিংসা-সাধন আদৌ করি না। অহিংসা-সাধনে ব্রতী হইলে অন্যান্য সাধন পণ্ড হয় না; পরন্তু অহিংসার মূল-সূত্রগুলি অভ্যস্ত হইবার পূর্ব্বেই অন্যান্য সাধন আরও অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। মহাবীর, বুদ্ধ ও টলষ্টয়—ইঁহারা তিনজনেই যোদ্ধা। তবে ইঁহারা গভীর অন্তর্দৃষ্টিবলে যোদ্ধার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া সত্য সত্যই সুখময় সম্মানপ্রদ দেবতুল্য জীবন লাভ করিয়াছিলেন। আমরা যদি ঐ সকল উপদেষ্টার গুণভাগী হইতে পারি, তাহা হইলে এদেশ আবার দেবতার বাসভূমিতে পরিণত হইবে।

যুদ্ধ ও অস্ত্র-আইন

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত গান্ধী বোম্বায়ে সৈন্য সংগ্রহ কালে নিম্নলিখিত নয়টি উপদেশ স্বদেশবাসিগণকে প্রদান করেন,—

(১) তোমার দেশ ও সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এখনই সৈন্যদলে প্রবেশ কর।

(২) মনে করিও না যে, যুদ্ধের পর অস্ত্র-আইনের বলে তোমাকে অস্ত্রহীন করা হইবে।

(৩) স্মরণ রাখিও, তুমি অস্ত্র পরিচালনে অভ্যস্ত হইলে জগতের কোন শক্তি তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অস্ত্রহীন করিতে পারিবে না।

(৪) গভরমেণ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। গভরমেণ্ট এত নির্ব্বোধ নহেন যে, তুমি অস্ত্র ব্যবহারে একবার শিক্ষিত হইলে তোমাকে অস্ত্রহীন করিতে আর প্রয়াসী হইবেন। সেরূপ নির্ব্বোধ হইলে গভরমেণ্ট দেশ শাসন করিতে পারিতেন না।

(৫) সত্যাগ্রহরূপ মহাস্ত্র তোমার সঙ্গে সতত রহিয়াছে, এই ভাব হৃদয়ে পোষণ কর।

(৬) স্মরণ রাখিও, যে মরিতে ভয় করে, সে সত্যাগ্রহী হইতে পারিবে না।

(৭) শারীরিক শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা অর্জ্জন করিও। সত্যাগ্রহের প্রকৃত গুণ অবধারণের নিমিত্ত শারীরিক শক্তির প্রয়োজন।

(৮) অহিংসা অভ্যাস করিও।

(৯) ভুলিও না, যে, কেবল সেই ব্যক্তিই অহিংসা অভ্যাস করিতে পারে—যে বধ করিতে জানে ; অর্থাৎ হিংসা কি তাহা অবগত আছে।

কারা-কাহিনী।

ট্রান্সভালে অবস্থান কালে শ্রীযুক্ত গান্ধী তিনবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দ্বিতীয় বারের কারাবাস-কাহিনী তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে বর্ণন করিয়াছেন,—

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া কয়েদীগণকে স্ব স্ব বিছানা গুটাইয়া, যথাস্থানে রক্ষা করিতে হয়। ৬টার মধ্যে শৌচাদি ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক

কাজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হওয়া বিধেয়; ঘণ্টা বাজিলেই কাজে রওনা হইতে হইবে। ৭টার সময় কাজ আরম্ভ হয়। নানা রকমের কাজে কয়েদীদের নিয়োগ করা হইয়া থাকে। আমাদিগকে যে জমি খুঁড়িতে দেওয়া হইত, তাহা অত্যন্ত শক্ত। কোদালের দ্বারা তাহা খনন করা নিতান্ত কষ্টকর। সে সময়টা দারুণ গরম। আমাদিগকে জেল হইতে দেড় মাইল দূরে লইয়া গিয়া কাজে লাগান হইত। প্রথমে আমরা সকলেই খুব উৎসাহের সহিত কাজে লাগিয়াছিলাম; কিন্তু আমাদের মধ্যে কেহই ঐরূপ কর্ম্মে অভ্যস্ত না থাকায়, সকলেই অল্পক্ষণ মধ্যে শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, ততই কাজটা আরও কঠোর বলিয়া বোধ করিতে লাগিলাম। আমাদের ওয়ার্ডারটী খুব কড়া মেজাজের লোক। সে যখন তখন চীৎকার করিয়া বলিত,—'চালাও, চালাও।' ইহাতে ভারতীয়গণ ভীত ও ত্রস্ত হইয়া পড়িত। দেখিলাম, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কাঁদিতেছে। একজনের পদতল ফুলিয়াছিল। এই সকল দৃশ্যে আমার প্রাণ জ্বলিতেছিল; তবুও আমি তাহাদিগকে কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলাম। বলিলাম—'ওয়ার্ডারের কথায় বিচলিত না হইয়া সরল অন্তঃকরণে যতটা পার কাজ করিয়া যাও।' আমি নিজেও নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার হাতে অনেকগুলি ফোস্কা উঠিয়াছিল; সেগুলি গলিয়া জল বাহির হইতে লাগিল। আমি আর কোদাল তুলিতে পারিতেছিলাম না—মনে হইতেছিল, সেটা যেন এক মণ ভারি! তখন ভগবানের নিকট মনে মনে এই প্রার্থনা জানাইলাম,—'লজ্জানিবারণ! আমার মান বজায় রাখ—হাত পা যেন অবশ হইয়া না যায়—নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সমাপনের উপযোগী বল আমাকে দাও।' ভগবানের উপর স্থির বিশ্বাস রাখিয়া আমি আপন কাজ করিতে লাগিলাম। শ্রান্তি মোচনের জন্য মাঝে মাঝে একটু থামিলেই ওয়ার্ডার আমাকে ধমক্ দিতে সুরু করিল। আমি

তাঁহাকে বলিলাম যে, আমাকে কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না— আমার শক্তিতে যতটা কুলায় ততটা কাজ আমি করিব।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত ঝিনাভাই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। আমি তাঁহার মস্তকে জল সিঞ্চন করিতে করিতে ভাবিলাম,—'অধিকাংশ ভারতবাসী আমার কথায় নির্ভর করিয়া জেলে আসিয়াছে। আমার উপদেশ যদি ভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে ভগবানের চক্ষে আমি কতটা দোষী হইব! শুধু আমার উপদেশে ইহারা এত কষ্ট সহ্য করিতেছে!' মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া আমি একটী গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। ভগবানকে সাক্ষী রাখিয়া আর একবার ঐ বিষয়টী চিন্তা করিয়া দেখিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিলাম যে, ঠিক পথেই চলিয়াছি। আমি ইহা বেশ অনুভব করিলাম যে, ভারতীয়গণকে যে পরামর্শ দিয়াছি তাহা ছাড়া অপর কোন পরামর্শ বর্ত্তমান অবস্থায় প্রদত্ত হইতে পারে না। ভবিষ্যতে সুখ লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে কঠোরতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই হইবে। তাহাতে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ অপরিহার্য্য—সেজন্য দুঃখিত হইলে চলিবে না। 'ইনি না হয় এখন অজ্ঞান হইয়াছেন; কিন্তু যদি ইহাঁর প্রাণ বিয়োগ হয়, তাহা হইলে ভারতীয়গণের প্রতি আমার উপদেশ, কিরূপে পরিবর্ত্তন করিব!' এই প্রশ্নের মীমাংসা সঙ্গে সঙ্গে হইয়া গেল,—চিরকাল ক্রীতদাস হইয়া থাকা অপেক্ষা এমন মৃত্যু গৌরবজনক।

এক সময়ে একজন ওয়ার্ডার আমার নিকট আসিয়া দুইজন লোক চাহিল। তাহাদিগকে পায়খানা পরিষ্কার করিতে হইবে। আমি নিজে ঐ কাজে যাইব, বলিলাম। ঐরূপ কর্ম্মে আমার আপত্তি কিছুই ছিল না; বরং উহাতে অভ্যস্ত হইয়া থাকা আমি প্রয়োজন মনে করি।

কাফ্রী রোগীদের ওয়ার্ডে আমার শুইবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেখানে সমস্ত রাত্রি অতি কষ্টে ও ভয়ে ভয়ে কাটাইয়াছিলাম। তখন

জানিতাম না যে,পরদিন আমাকে ভারতীয় কয়েদীদের ওয়ার্ডে লইয়া যাওয়া হইবে। বিকটাকার কাফ্রীদের সঙ্গে একত্রে আবদ্ধ রহিবার আশঙ্কায় আমি ত্রস্ত ও বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম। তথাপি মনকে দৃঢ়ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম যে, যেরূপ যন্ত্রণাই আসুক না কেন, তাহা সহ্য করা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। ঐ অবস্থার উপযোগী কয়েকটী শ্লোক ভগবদ্গীতা হইতে পাঠ করিয়া নিবিষ্টচিত্তে তাহা অনুধ্যান করিলাম। ফলে, মন স্থির হইল।

প্রাগুক্ত কক্ষে কয়েকজন খুনে, অসভ্য, কদাচার কাফ্রী ও চীনা কয়েদী আটক ছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া আমি ত্রস্ত ও ভীত হইয়াছিলাম। তাহাদের ভাষা আমি বুঝি না। তাহাদের মধ্যে একজন কাফ্রী আমাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল। ভাবভঙ্গীতে বুঝিলাম, লোকটা আমাকে কুৎসিত রকমের বিদ্রূপ করিতেছে। তাহার প্রশ্ন আমি বুঝিতে পারি নাই, কাজেই কোন উত্তর দিলাম না। তখন সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল,—'তোমাকে এখানে আনিয়াছে কেন?' আমি স্বল্প কথায় ইহার উত্তর দিলাম; তাহার পর নীরব রহিলাম।

অতঃপর একজন চীনা আমাকে উত্যক্ত করিতে আসিল। এ লোকটা আরও খারাপ। সে আমার বিছানার নিকট আসিয়া একদৃষ্টে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল। আমি কথা কহিলাম না। সে তখন উক্ত কাফ্রীর শয্যাভিমুখে ফিরিয়া গেল। তাহারা পরস্পর কুৎসিৎ ভাবে রঙ্গভঙ্গ করিতে লাগিল এবং শরীরের অশ্লীলাংশ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইল। সম্ভবতঃ এই উভয় কয়েদীই হত্যা বা ডাকাতি অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিল। এই সকল বীভৎস ব্যাপার দর্শন করিয়া কি আমার আর ঘুম আইসে?

একবার আমি প্রস্রাব করিবার জন্য পায়খানার নিকট বসিয়াছি, এমন সময়ে একজন গুণ্ডা-গোছের অসভ্য কাফ্রী আসিয়া দেখা দিল। সে আমাকে সরিয়া যাইতে বলিল ও গালাগালি দিতে লাগিল। আমি

বলিলাম,—'আমার বেশী দেরি হইবে না।' লোকটা আমাকে কোল-পাঁজা করিয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিল। সৌভাগ্যবশতঃ আমি একটা কপাট ধরিয়া ফেলিয়াছিলাম ; নচেৎ হাড়-গোড় ভাঙ্গিয়া যাইত। এবার কিন্তু তেমন ভীত হই নাই। আমি হাসিমুখে সেস্থান হইতে সহজভাবে চলিয়া আসিলাম। কিন্তু যে দু'একজন ভারতীয় কয়েদী সে দৃশ্য দেখিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাদের চক্ষু বাহিয়া দরবিগলিতধারা ছুটিল!

গো-রক্ষা।

গুজরাট রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত গান্ধী গো-রক্ষা প্রসঙ্গে বলেন,—

ভারতে গো-রক্ষা একটী প্রধান সমস্যা। প্রাচীনকাল হইতে এ দেশে গো-রক্ষা প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। দেশের অবস্থানুরূপ প্রয়োজন সাধনের জন্য এই প্রথার সৃষ্টি। যে দেশে শতকরা ৭৩ জন লোক কৃষি কর্ম্মের দ্বারা জীবনোপায় সংগ্রহ করে এবং যেখানে কৃষিকার্য্যের জন্য গো-ধনই একমাত্র অবলম্বন, সে দেশে গো-জাতির রক্ষা-বিধান সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এমন দেশে মাংসাহারী ব্যক্তিগণের পক্ষে গো-মাংস ত্যাগ করাই বিধেয়। উল্লিখিত প্রাকৃতিক কারণগুলি ভারতে গো-হত্যা নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু এই সমস্যার সমাধানকালে আমরা একটা অভিনব অবস্থার ভিতর গিয়া পড়ি। গো-রক্ষার প্রধান অর্থ সাধারণতঃ এই মনে হয় যে, গরুগুলি যেন মুসলমান ভ্রাতাদের হাতে না যায় এবং তাঁহারা যেন উহা খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে না পারেন। ওদিকে শাসক-সম্প্রদায়ের জন্য গো-মাংস দরকার। তাঁহাদের প্রয়োজনে প্রত্যহ হাজার হাজার গরু নিহত হইতেছে। ইহার প্রতিরোধ-কল্পে আমরা কোন চেষ্টাই করি

না। কলিকাতার কোন কোন হিন্দু গোয়ালা গাভীদের উপর অবর্ণনীয় প্রক্রিয়া দ্বারা দুগ্ধের শেষ বিন্দুটুকু পর্য্যন্ত বাহির করিয়া লইবার জন্য যে নির্ম্মম অত্যাচার করে, তাহার প্রতিবিধান-কল্পে আমরা আদৌ উদ্‌যোগী নহি। গুজরাটে হিন্দু গাড়োয়ানেরা লোহার কাঁটাযুক্ত যষ্টি দ্বারা গরু হাঁকাইয়া থাকে। এই সকল ব্যাপারে আমরা নীরব। আজকাল সহরে যে সকল বলদ আমরা দেখিতে পাই, তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বস্তুতঃ গো-জাতির রক্ষা-সমস্যা বড়ই গুরুতর। আমরা মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া এ বিষয়টীকে যেন মুসলমান ভ্রাতৃগণের সহিত বিবাদের একটা ছুতা করিয়া তুলিয়াছি। এই রেষারেষির ফলে গো-হত্যার সংখ্যাও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। কোন মুসলমান ভ্রাতা যদি গো-কোরবাণি ত্যাগ না করেন, তবে তাঁহাকে হত্যা করা ধর্ম্মের লক্ষণ নহে; পরন্তু উহা অধর্ম্মমূলক। আমার স্থির বিশ্বাস এই যে, মুসলমান ভ্রাতৃগণের সহিত যদি আমরা ঐ বিষয়ে ভালবাসার ভাবে কথাবার্ত্তা কহি, তাহা হইলে তাঁহারা ভারতের বিশেষ অবস্থা উপলব্ধি করিবেন এবং গো-রক্ষা কার্য্যে আমাদের সহযোগী হইবেন। শুধু ভদ্রতার খাতিরে বা সত্যগ্রহের অজুহাতে তাঁহারা ঐ কার্য্যে ব্রতী হইবেন বলিয়া মনে হয় না। পরন্তু এদেশে গো-রক্ষার ফলাফল কি, ইহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই তাঁহারা আমাদের মতানুবর্ত্তী হইবেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে হত্যা করা অপেক্ষা নিজেরাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া বিধেয়। গরুর প্রকৃত মূল্য অবধারণ করিতে পারিলে এবং তাহাদের জন্য প্রাণে অকৃত্রিম ভালবাসা জাগিলে, আমরা ঐ কার্য্যে সক্ষম হইব। এই একটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বহু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তখন হিন্দু-মুসলমান শান্তিতে বসবাস করিবে, বিশুদ্ধ দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি সুলভ ও সুপ্রাপ্য হইবে এবং আমাদের দেশের গো-ধন অন্যান্য দেশের তুলনায়

শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে। প্রকৃত তপস্যাচরণ দ্বারা আমরা ইংরাজের, মুসলমানের ও হিন্দুর গো-হত্যা বন্ধ করিতে পারি। এই একটী কার্য্যের ফলে স্বরাজ আমাদের অনেকটা নিকটে আসিয়া পড়িবে।

ধর্ম্মঘট।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ২রা মার্চ্চ মাদ্রাজ সহরে ট্রামের ধর্ম্মঘটকারী কর্ম্মচারিগণকে সম্বোধন করিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধী বলেন,—

আপনাদের ধর্ম্মঘট সংক্রান্ত বিবরণ আমি কতক কতক শুনিয়াছি। আপনাদের দাবী কি, তাহাও আমি মোটামুটি জানি; কিন্তু সমস্ত সমস্যাটী আগাগোড়া প্রণিধান সহকারে আলোচনা করি নাই। পক্ষান্তরে আপনাদের নিয়োগকারী কোম্পানীর তরফের কথাও আমি অবগত নহি। কাজেই আপনাদের দাবী সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত কিনা, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। তবে আপনাদের দাবী ন্যায়সঙ্গত, মনে করিয়া আমার স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ধর্ম্মঘট ঘোষণা দ্বারা আপনারা অন্যায় কিছু করেন নাই।

শ্রমিকগণ যেখানে নিয়োগকর্ত্তাদের নিকট আপনাদের অভাব-অভিযোগের কথা পুনঃ পুনঃ জ্ঞাপন করিয়াও কোন প্রতিকার পায় না সেখানে ধর্ম্মঘটই একমাত্র অস্ত্র। সুতরাং ধর্ম্মঘটে সাফল্য লাভ করিতে হইলে উহার মূলহেতু ন্যায়সঙ্গত ও অকৃত্রিম হওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মঘটকারিগণ যেন কখনও অত্যাচার-অনাচারে প্রবৃত্ত না হয়। অর্থাৎ আপনারা নিয়োগকারিগণকে অথবা যাহারা ধর্ম্মঘটে যোগ দেয় নাই, তাহাদিগকে আঘাত করিতে পারিবেন না। যে কোন কষ্ট আসুক না কেন, আপনারা কখনও সত্যভ্রষ্ট হইবেন না। ধর্ম্মঘটের সময়

সহস্র যাতনা শির পাতিয়া লইতে—এমন কি অনশনে দিনপাত করিতেও আপনারা প্রস্তুত থাকিবেন। ধর্ম্মঘট ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং উহার জয় অবশ্যম্ভাবী। আশা করি আপনাদের ধর্ম্মঘটও ঠিক ঐ ধরণের। আপনাদের মধ্যে আর কেহই কাজে নিযুক্ত নাই, এই অপূর্ব্ব একতা লক্ষ্য করিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। তা'ছাড়া আপনারা শান্ত ও সুশৃঙ্খল ভাবে চলিয়াছেন, ইহাও আনন্দের কথা। আপনারা যখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তখন আশা করি দাবী পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট ছাড়িবেন না।

তবে একটা কথা আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। তাহা এই যে, আপনাদের দাবী কি তাহা স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া ধর্ম্মঘটকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে জানাইয়া দিবেন; এবং মীমাংসার সময় আসিলে দাবীর পরিমাণ আর বাড়াইবেন না। দাবীর মাত্রা যদি মাঝে মাঝে চড়াইয়া দেন বা পরিবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে আপনাদের পক্ষে তাহা ন্যায্য হইবে না। ধর্ম্মঘট মিটাইবার জন্য যদি মধ্যস্থতার কথা উঠে এবং মধ্যস্থগণ যদি বিশ্বাসযোগ্য লোক হন, তাহা হইলে সে প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। কারণ মধ্যস্থগণ আপনাদিগকে, নিয়োগকর্ত্তাগণকে এবং সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে পারিবেন যে, আপনাদের দাবী ন্যায়সঙ্গত কিনা।

আপনাদের দাবী যদি ন্যায়সঙ্গত হয় এবং উল্লিখিত সর্ত্তগুলি যদি আপনারা পূরণ করেন, তাহা হইলে দীর্ঘকাল ধর্ম্মঘট চলিলে কি করিবেন? আপনাদের সকলের হাতে অবশ্য এত টাকা নাই যে, অনন্ত কাল ধর্ম্মঘট চলিলেও সহিয়া থাকিতে পারিবেন। আপনারা সকলেই শ্রমজীবী —আপনাদের শরীর সুস্থ ও সবল। এরূপ স্থলে আপনারা সাধারণের প্রদত্ত চাঁদায় নির্ভর করিবেন না, ইহাই আমার পরামর্শ। যাঁহাদের হাত-পা কার্য্যক্ষম তাঁহাদের পক্ষে সাধারণের চাঁদায় জীবন ধারণ করা নীচতার

পরিচায়ক। অতএব আপনারা সকলে অস্থায়ী ভাবের কোন কাজকর্ম্ম সন্ধান করুন। পৃথিবীতে যে কোন বৃত্তি দ্বারা সদুপায়ে অর্থার্জ্জন নিন্দনীয় নহে। আপনাদের অবস্থায় পড়িলে আমি কোদাল পাড়িতেও পশ্চাৎপদ হইতাম না ; তথাপি ধর্ম্মঘট বজায় রাখিতাম। আমেদাবাদের ধর্ম্মঘট-কাহিনী বিস্তৃতভাবে বলিবার অবসর আমার নাই—সেখানে তেইশ দিন ধর্ম্মঘট চলিয়াছিল। বন্ধুবান্ধবের নিকট আপনার ঐ ঘটনার বিবরণ অবগত হইবেন ; তবে আমি এইটুকু জানাইতে চাই যে, সেখানে চল্লিশ টাকা বেতনভোগী কর্ম্মচারীরাও ধর্ম্মঘটের সময় কোদাল পাড়িতে এবং দ্বারে দ্বারে মাটি বহিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। এইরূপে দৈনিক চারি আনা উপার্জ্জন করিয়াও তাঁহারা সংসার প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ফলে, দশ হাজার লোক সেই ধর্ম্মঘটে সাফল্য লাভ করিয়াছিল। আশা করি আপনাদের দাবী ন্যায়সঙ্গত। আপনারা যদি উপরোক্ত উপায় অবলম্বন করেন, তাহা হইলে শেষে সাফল্য লাভ হইবেই হইবে।

বণিকগণের প্রতি—

বোম্বাই—বরোচে বণিকগণের প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে শ্রীযুক্ত গান্ধী বলেন,—

নূতন পন্থাবলম্বনের উপযোগী সাহস, বুদ্ধি ও ধন সাধারণতঃ বণিক্ সম্প্রদায়ের ভিতরই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গুণ না থাকিলে কেহ ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে পারে না। এখন কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ে স্বদেশ-হিতৈষণার উদ্বোধ হওয়া দরকার। ধর্ম্মার্জ্জনের জন্যও স্বদেশ-হিতৈষণা প্রয়োজন। ধর্ম্মের ভিতর দিয়া যদি স্বদেশ-প্রেম পরিস্ফুট হয়, তাহা হইলে সেই ভাব অপূর্ব্ব উজ্জ্বলতা বিস্তার করিবে। অতএব বণিক সম্প্রদায়ের হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেম উদ্বুদ্ধ করা আবশ্যক।

অধুনা বণিকগণ সাধারণের কার্য্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মিলামিশা করিতেছেন। তাঁহারা স্বদেশ-হিতৈষণাবশে রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে স্বরাজ অনেকটা মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িবে। আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত সবিস্ময়ে মনে করিতেছেন যে, স্বরাজ আসিবে কিরূপে? আমি বুকে হাত দিয়া নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি যে, বণিকগণ স্বদেশ-হিতৈষণায় অনুপ্রাণিত হইলে, স্বরাজ আমাদের সহজলভ্য হইবে। তখন উহা আপনা-আপনি হাতে আসিয়া পড়িবে।

স্বদেশীর পণ গ্রহণ স্বরাজ লাভের একটী প্রধান পন্থা। বণিকগণ স্বদেশী-পণ গ্রহণে দেশবাসীকে বাধ্য করিতে পারেন। আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, আপনারা সাহসের সহিত ঐ কাজে অগ্রসর হউন। তাহা হইলে দেখিবেন, কি অদ্ভুত কার্য্য আপনাদের দ্বারা নিষ্পন্ন হইবে।

আমি সদুঃখে জানাইতেছি, বণিক সম্প্রদায় স্বদেশীর সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। অধুনা বাঙ্গালায় জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে অনুযোগ উঠিয়াছে। তাঁহাদের একটী অনুযোগ, গুজরাটের বিরুদ্ধে খাটে। বাঙ্গালায় ধুতির দর অসম্ভব চড়িয়াছে। ঐ ধুতি গুজরাট হইতে সরবরাহ হয়। আপনাদিগকে অর্থার্জ্জন করিতে কেহ নিষেধ করিবে না; কিন্তু সৎপথে থাকিয়া ন্যায়সঙ্গত উপায়ে অর্থার্জ্জন করাই কর্ত্তব্য। বণিকগণ অসৎ উপায়ে অর্থার্জ্জন যেন না করেন।

ভারতের শক্তি বণিকগণের উপর যতটা নির্ভর করিতেছে, সৈনিকগণের উপর ততটা নহে। ব্যবসা-বাণিজ্যই যুদ্ধের হেতু; যুদ্ধের মূলসূত্র বণিক সম্প্রদায়ের হস্তে ন্যস্ত। বণিকগণ অর্থ সরবরাহ করিলে, তবে তদ্দ্বারা সৈন্য সংগৃহীত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড ও জর্ম্মণীর ক্ষমতা, বণিক্ সম্প্রদায়ের প্রভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমার পক্ষে বণিকগণের নিকট হইতে অভিনন্দন লাভ, সৌভাগ্যের নিদর্শন মনে করিতেছি। ভবিষ্যতে যখনই

বরোচের কথা স্মরণ হইবে, তখনই জানিতে চেষ্টা করিব যে, আজ যে বণিকগণ আমাকে অভিনন্দিত করিলেন—তাঁহারা যথার্থ ধর্ম্মপ্রবণ ও স্বদেশ-হিতৈষী কিনা? তখন যদি ঐরূপ প্রমাণ না পাই, তবে মনে করিব যে, সে সময়ে ভারতে অভিনন্দন-দানের একটা হুজুগ আসিয়াছিল মাত্র. তাহারই অংশভাক্ আমি হইয়াছিলাম।

ছাত্রগণের প্রতি

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ২৭শে এপ্রিল মাদ্রাজে 'ইয়ং মেন্স ক্রিশ্চান এসোসিয়েশন' ভবনে তত্রত্য ছাত্রগণের প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে শ্রীযুক্ত গান্ধী এই মর্ম্মে বলেন,—

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত—'বন্দে মাতরম্' গানে কবি মাতৃভূমির বর্ণনায় বহুল বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। ঐ স্তোত্র গান করিবার অধিকার কি আমাদের আছে? কবি আমাদের সম্মুখে কেবল একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতের ভবিষ্যৎ-ভরসা তোমাদিগকে সে আদর্শ লাভ করিতে হইবে। তোমরা কি সেই শিক্ষা লাভ করিতেছ, যাহাতে উল্লিখিত উচ্চ আদর্শ বাস্তবে পরিণত করিতে পারিবে—যাহাতে তোমাদের সদ্‌গুণরাজি ফুটিয়া উঠিবে? অথবা তোমাদের শিক্ষা-মন্দিরগুলি সরকারী কর্ম্মচারী গঠনের বা সওদাগরী অফিসের কেরাণী গঠনের কারখানা মাত্র? তোমরা কি কেবল চাকুরী লাভের আশায় লেখাপড়া শিখিতেছ? তোমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তোমাদের দ্বারা কবির আদর্শ পূরণ হইবে না—ইহাই আমার আশঙ্কা।

হয়ত তোমরা শুনিয়াছ যে, আমি আধুনিক সভ্যতার ঘোর বিরোধী। আজকাল ইউরোপে কি ভীষণ বিপ্লবাগ্নি জ্বলিয়াছে চাহিয়া দেখ। উহা আধুনিক সভ্যতার ফল বলিয়া যদি বুঝিতে পার, তাহা হইলে এদেশে

ঐ সভ্যতা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে দুইবার চিন্তা করিয়া দেখা তোমাদের ও তোমাদের অভিভাবকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন,—'রাজপক্ষ উহা এদেশে আনিয়াছেন; সুতরাং আমরা বাধা দিব কিরূপে?' তোমরা গ্রহণ না করিলে রাজপক্ষ ঐ সভ্যতা তোমাদের ভিতর চালাইয়া দিবেন, ইহা আমি মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্বাস করি না। আমার মতে ঐ সভ্যতা বর্জ্জনের শক্তি আমাদের অন্তরে নিহিত রহিয়াছে। আমরা রাজপক্ষকে বর্জ্জন না করিয়াও পাশ্চাত্য সভ্যতা বর্জ্জন করিতে পারিব।

কৃষি-শিল্প শিক্ষা।

কনখল গুরুকুল বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসবে পঠিত প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত গান্ধী ছাত্রগণের শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে এই মর্ম্মে বলেন,—

গুরুকুলের ছাত্রগণকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে হইলে তাহাদিগকে শিল্পশিক্ষা অবশ্যই দিতে হইবে। আমাদের দেশের শতকরা পঁচাশী জন অধিবাসী কৃষিজীবী এবং শতকরা দশজন লোক কৃষকদলের অভাব মোচনে নিযুক্ত। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণ যাহাতে কৃষি ও বয়ন বিদ্যা মোটামুটি অর্জ্জন করিতে পারে, তদ্রূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। তাহারা যদি যন্ত্রপাতি ঠিক ঠিক ব্যবহার করিতে পারে, সোজাসুজি তক্তা চিরিতে পারে, মজবুত দেওয়াল গাঁথিয়া তুলিতে পারে, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। এইরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক সংসার-সংগ্রামে কখনও নিজেকে অসহায় বোধ করিবে না; কারণ তাহার কাজের ভাবনা থাকিবে না।

বর্ণাশ্রম ও বিদেশ-যাত্রা।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কথোপকথন প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত গান্ধী বলেন,—

আমরা ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হইয়া অনেকটা আত্মসম্মান হারাইয়াছি। আমরা এখন ইংরাজীতে চিন্তা করি—ইংরাজী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহি। তাহার ফলে আমাদের মাতৃভাষার দারিদ্র্য বৃদ্ধি হয়—আমরা দেশবাসী জনসাধারণের মনের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। মাতৃভূমির কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত ইংরাজী ভাষা শিক্ষা নিতান্ত অপরিহার্য্য নহে। হিন্দুর বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় প্রভূত শক্তি নিহিত রহিয়াছে—উহাই হিন্দুত্বের গুপ্ত রহস্য।

বর্ত্তমান সভ্যতা ইউরোপে তথা ভারতে অভিসম্পাতের মত কুফল প্রসব করিয়াছে। যুদ্ধ বর্ত্তমান সভ্যতার মুখ্য ফল। পৃথিবীর সকল রাজশক্তি এ যাবৎ যুদ্ধের আয়োজনে ব্রতী ছিল।

নিরুপদ্রব-প্রতিরোধের নৈতিক বল বড় সামান্য নহে। ইহা দুর্ব্বল ও সবল সকলকেই রক্ষা করে। আত্মিক বল কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করে না। আমাদের আদর্শ বাস্তবে পরিণত করিতে হইবে ; নচেৎ তাহার সার্থকতা কি ? বর্ত্তমান সভ্যতা পশুবলের নামান্তর মাত্র।

কামিনী, কাঞ্চন ও ভূসম্পত্তি—এই তিনটী অনর্থের মূল। বিলাস-ব্যসনের নিমিত্ত কামিনী, কাঞ্চন ও ভূসম্পত্তি আমি চাহি না। অপরে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমিও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইব না।

আদর্শ রক্ষায় সচেষ্ট হইলে কুপ্রবৃত্তি আমাদের ভিতর তেমন মাথা তুলিতে পারিবে না। দেশহিতকর কার্য্যে জনসাধারণের আগ্রহ উৎপাদন করিতে হইবে।

জড় জগতের ঈর্ষামূলক কর্ম্মশীলতা আদৌ মঙ্গলপ্রদ নহে। উহার ফলে

লোকের বিলাসিতার উপকরণ দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর আধুনিক কর্ম্মপ্রবণতার দারুণ চাপ আরোপ করা উচিত নহে—হিন্দু আদর্শে উহা পুনর্গঠন করিতে হইবে। এদেশে পুণ্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি, অন্য দেশের লোকে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। দশরথ পত্নীর নিকট যে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করায়, অন্য দেশের লোকে তাঁহাকে মূর্খ বলে। কিন্তু ভারতবাসীর ধারণা—প্রতিজ্ঞা সর্ব্বত্রই পালনীয়। এ আদর্শ অতি উচ্চ। জড় জগতের কর্ম্মপ্রবণতা বিদ্বেষোৎপাদক। সত্যের জয় শেষে হইবেই।

বিদেশে উপনিবেশিক প্রেরণের ফলে কোন দেশ কখনও লাভবান হয় নাই। উপনিবেশিকগণ যখন স্বদেশে ফিরিয়া আইসে, তখন তাহাদের চরিত্র পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল দেখা যায় না। তাই সমগ্র ব্যবস্থাটী হিন্দু-নীতির বিরুদ্ধ। বিদেশে মন্দিরাদি সমৃদ্ধিলাভ করে না—উৎসবাদিও তেমন জাঁকজমকের সহিত সম্পাদনের সুবিধা নাই। পুরোহিত পাওয়া দুষ্কর—যদিবা পাওয়া যায়, তাহারা নিতান্ত বাজে লোক। উপনিবেশিকগণ অনেক অনাচার করে—তাহাদের দ্বারা সমাজ কলুষিত হয়। উহা নূতন পথ প্রদর্শনের সৎসাহস নহে। তাহারা বিদেশে গিয়া স্বল্পায়াসে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করে, অর্থাৎ বিশেষ পরিশ্রম করিতে তাহারা নারাজ এবং অর্থার্জ্জন ব্যাপারে সাধুসম্মত উপায় অবলম্বন করিতেও প্রস্তুত নহে। উপনিবেশিকগণ সাধারণের অপেক্ষা সুখী নহে—বরং তাহাদের পার্থিব অভাব অনেক অধিক।

স্বরাজ।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ৩রা নভেম্বর 'গুজরাট রাজনৈতিক সম্মেলনে'র সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত গান্ধী গুজরাটী ভাষায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে বক্তৃতা করেন,—

যাঁহারা বলেন, স্বরাজ লাভ করিতে হইলে সর্ব্বসাধারণের লেখাপড়া শেখা দরকার, তাঁহারা ইতিহাসে অনভিজ্ঞ। নিজেদের কাজকর্ম্ম নিজেরাই চালান উচিত, এই জ্ঞান লোকের মনে জাগাইবার জন্য পুস্তকগত শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন নাই—মূল ভাবটী লোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই হইল। তাহাদের মনে স্বরাজ লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিলেই যথেষ্ট। এদেশে এমন অনেক নৃপতি সুচারু ভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা লেখাপড়ার ধার আদৌ ধারিতেন না।

কোন কোন ইংরাজ সমালোচক বলেন যে, স্বরাজ লাভের অধিকার ভারতবাসীর নাই; কারণ যাঁহারা স্বরাজ চাহিতেছেন, তাঁহারা বহিঃ শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিতে অপারগ। উক্ত সমালোচকগণ জিজ্ঞাসা করেন,—'ভারত রক্ষার ভার কি ইংরাজের হাতে দিয়া, আপনারা শুধু শাসন ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব করিবেন?' এই প্রশ্ন শুনিয়া হাসি পায়, দুঃখও আইসে। হাসির কারণ এই যে, আমাদের ইংরাজ বন্ধুরা মনে করেন, তাঁহারা যেন আমাদের মধ্যে নহেন। আমরা কিন্তু বৃটিশ সম্পর্ক বজায় রাখিয়াই স্বরাজ লাভ করিতে চাহি। যে সকল ইংরাজ এখানে বসবাস করিয়াছেন, তাঁহারা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, ইহা আমাদের অভিপ্রেত নহে। বরং তাঁহারা আমাদের অর্জ্জিত স্বরাজের সরিক হইবেন। এরূপ অবস্থায় দেশের রক্ষা ভার যদি তাঁহাদের উপর পড়ে, তাহা হইলে অসন্তোষের কারণ কি? তাঁহারা তাড়াতাড়ি এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, তখন হয়ত আমরা দেশরক্ষা কার্য্যে অগ্রসর হইব না। বস্তুত ভারতের জন-

সাধারণ যখন অস্ত্রধারণের প্রয়োজনীয়তা বুঝিবে, তখন তাহারা সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিবে না। অপরকে আঘাত করিতে হইলে মনোবৃত্তি একটু কঠিন করা প্রয়োজন। আমাদের পক্ষে মনকে কঠোর করিয়া তুলিতে বেশী দিন লাগিবে না। আগাছার মত উহা সহজেই মানস-ক্ষেত্রে বাড়িয়া উঠিবে।

এই সমস্যার আর একটা শক্ত দিক্ আছে। তাহা এই যে, গভরমেণ্ট আমাদিগকে এ পর্য্যন্ত সামরিক শিক্ষা লাভে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। তাঁহারা যদি এদেশবাসী জনসাধারণকে সামরিক শিক্ষা দিতেন, তাহা হইলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর হইতে আজ বহু সৈন্য সংগৃহীত হইত। এদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে যুদ্ধে নামেন নাই, সেজন্য গভরমেণ্টই বেশীর ভাগ দোষী। গভরমেণ্ট যদি প্রথম হইতে ভিন্নরূপ ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাদের হাতে অজেয় সৈন্যদল প্রস্তুত থাকিত। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার জন্য কাহারও উপর দোষারোপ করিয়া কাজ নাই। যে সময়ে বৃটিশ রাজত্ব এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তৎকালে এদেশের কোটী কোটী অধিবাসীকে শাসনে রাখিবার জন্য তাহাদের সামরিক শিক্ষা বন্ধ করা গভরমেণ্ট যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন। এখন সে মত সংশোধনের সময় আসিয়াছে—সে ভুল শাসক ও শাসিত, উভয়কেই অবিলম্বে সারিয়া লইতে হইবে।

উল্লিখিত অভিমত প্রকাশ কালে আমি আধুনিক লোকমত সঙ্গত বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছি। কিন্তু আমার মতে ঐ পথ একেবারে অভ্রান্ত নহে। আমাদের আন্দোলন পাশ্চাত্য আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। আমরা যে স্বরাজ চাই, তাহাও পাশ্চাত্য ধরণের। উহার ফলে ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সহিত প্রতিযোগিতায় নামিতে হইবে। অনেকের মতে ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। আমি কিন্তু তাহা মনে করি না।

আমি ইহা বিস্মৃত হইতে পারি না যে, ভারতবর্ষ ইউরোপ নহে—জাপান নহে—চীন নহে। 'পৃথিবীতে একমাত্র ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি, আর সব দেশ ভোগভূমি' এই পবিত্র বাণী আমার মনে সর্ব্বদা জাগ্রত রহিয়াছে। আমার ধারণা ভারতের কর্ত্তব্য অন্যান্য দেশ হইতে স্বতন্ত্র। সারা পৃথিবীর উপর ধর্ম্মাধিপত্য স্থাপন করিতে ভারতবাসীই উপযুক্ত।

এদেশের অধিবাসিগণ স্বেচ্ছায় যেরূপ শুদ্ধি-ক্রিয়ার ক্লেশ সহিয়াছে, সেরূপ আর কোন দেশের লোকে সহে নাই। এদেশ রক্ষার নিমিত্ত লৌহাস্ত্রের প্রয়োজন তেমন নাই। ভারতবাসী আধ্যাত্মিক অস্ত্রে চিরকাল যুঝিয়াছে—আজও যুঝিতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি পাশব বলের পক্ষপাতী। অধুনা ইউরোপ খণ্ডে যে মহাযুদ্ধ চলিয়াছে, তাহা এই সত্যের নিদর্শন। ভারতবাসী আত্মিক-বলে (Soul-force) জগৎ জয় করিতে পারে। আত্মিক বলের নিকট পশুবল যে কিছুই নহে, ইহার শত শত উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। কবিরা একথা মুক্তকণ্ঠে গান করিয়াছেন—সর্ব্বদর্শী ঋষিরা এ সম্বন্ধে নিজেদের অভিজ্ঞতা স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অসুরোপম বীর অশীতিপর বৃদ্ধ পিতার নিকট মেষ শাবকের মত নিরীহ! ইহাই প্রেমের শক্তি। প্রেমই আত্মা—আত্মার ধর্ম্ম প্রেম। আমাদের মনে যদি অটল বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে সারা পৃথিবীর উপর আমরা এই শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিব। অধুনা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া আমরা নঙ্গরহীন তরীর ন্যায় নব্য সভ্যতার ঝঞ্ঝাবাতে বিতাড়িত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছি। এ বিষয়ে ইহাই যথেষ্ট।

উপরে যাহা বলিলাম, তাহা আমার ব্যক্তিগত মত হইলেও, আমি এদেশে স্বরাজ আন্দোলনের পক্ষপাতী; কারণ পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুসারে ভারতবর্ষ এখন শাসিত হইতেছে। এমন কি গভরমেণ্ট পর্য্যন্ত স্বীকার করেন যে, বৃটিশ পার্লামেণ্ট ঐ শাসন-পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এদেশে

পার্লামেণ্টের অনুরূপ শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত না হইলে আমাদের অস্তিত্বই থাকিবে না।

ভারতে দারিদ্র্য দিন দিন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। যে দেশ নিজের কাঁচা মাল বিদেশে চালান দিয়া তজ্জাত শিল্পসম্ভার পুনরায় আমদানি করে—যে দেশে তুলা উৎপন্ন হইলেও বিদেশাগত বস্ত্রের জন্য কোটী কোটী টাকা দিতে হয়—সে দেশের দারিদ্র্য দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হওয়াই স্বাভাবিক। আশ্চর্য্যের বিষয়, এরূপ দরিদ্র দেশের অধিবাসিগণ বিবাহাদি উৎসবে অপরিমিত অর্থব্যয় করে! যে দেশের লোকেরা প্লেগ প্রভৃতি মহামারী দমনের নিমিত্ত স্বাস্থ্যোন্নতি খাতে প্রয়োজনানুরূপ অর্থব্যয় করিতে অপারগ, তাহারা কত দরিদ্র! দেশের উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের বেতন বাবদ বিপুল অর্থ যতদিন বিদেশে চলিয়া যাইবে, ততদিন এদেশের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বাড়িবেই বাড়িবে। ভারতের অধিবাসিগণ যে শীতকালে শরীরের উত্তাপ রক্ষার নিমিত্ত পশমী বস্ত্রের অভাবে কৃষিকার্য্যে ব্যবহারোপযোগী মূল্যবান সার (গোময়) জ্বালাইতে বাধ্য হয়—ইহাতে বুঝা যায়, তাহাদের দারিদ্র্য কিরূপ ভীষণ! সারা ভারত ভ্রমণ কালে আমি একটীও আনন্দোজ্জল মুখ দেখি নাই। মধ্যবিত্ত লোকেরা কঠোর দারিদ্র্যের চাপে 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িয়াছে। নিম্নশ্রেণীর লোকের ত আশাই নাই। তাহাদের জীবনে সচ্ছলতা লাভ, আশার স্বপ্নমাত্র। ভারতের ধনরাশি মাটীর নিম্নে প্রোথিত রহিয়াছে, অথবা অলঙ্কাররূপে আবদ্ধ রহিয়াছে, ইহা গল্পের ন্যায় অলীক। যদি কিছু ধন ঐরূপে সঞ্চিত থাকে, তাহা অতি তুচ্ছ। অধুনা এ জাতির ব্যয় যথেষ্ট বাড়িয়াছে; কিন্তু আয় তদনুপাতে বাড়ে নাই। দেশের এ অবস্থা গভরমেণ্টের ইচ্ছাকৃত নহে। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সৎ, ইহাই আমার ধারণা। তাঁহারা সত্য সত্যই

বিশ্বাস করেন যে, ভারতের উন্নতি উত্তরোত্তর সাধিত হইতেছে। সরকারী 'ব্লু-বুকে' তাঁহাদের বিশ্বাস অটল। একথাও খুব সত্য যে, সরকারী হিসাবপত্র হইতে যে কোন সিদ্ধান্তই প্রমাণিত হইতে পারে। অর্থনীতি-বিদ্‌গণ হিসাবপত্র দেখাইয়া ভারতের উন্নতি সপ্রমাণ করিতেছেন। কিন্তু আমার মত যাঁহারা লোকমতের অনুসৃত পন্থায় হিসাবের তালিকা পরীক্ষা করেন, তাঁহারা ঘাড় নাড়িয়া 'ব্লু-বুকে'র হিসাবে সন্দেহ জানাইবেন। স্বয়ং ভগবান্ আসিয়া যদি বলেন যে, 'ব্লু-বুকে'র হিসাব অভ্রান্ত, তাহা হইলেও আমি মুক্তকণ্ঠে কহিব,—ভারত দিন দিন দরিদ্র হইতেছে।

এরূপ অবস্থায় আমরা পার্লামেণ্ট পাইলে লাভ কি? পার্লামেণ্ট পাইলে এই লাভ হইবে যে, আমরা যেমন ভুল করিব তেমনই তাহা সংশোধনের অধিকার আমাদেরই হাতে আসিবে। প্রথম প্রথম কোন কোন বিষয়ে আমাদের ভুল হইবেই। কিন্তু আমরা এদেশের বাসিন্দা; সুতরাং ভুল শুধরাইতে আমাদের বিলম্ব ঘটিবে না। তখন নিজেদের অভাব মোচনের জন্য আমরা ল্যাঙ্কসায়ারের মুখাপেক্ষী হইব না; দিল্লীতে রাজধানী নির্ম্মাণের নিমিত্ত অপরিমিত অর্থব্যয়েও বাধ্য থাকিব না। তখন কৃষকের কুটীরের সহিত দিল্লীর সাদৃশ্য কতকটা রক্ষিত হইবে—আমাদের পার্লামেণ্ট-গৃহও কুটীরের তুলনায় স্বর্ণসৌধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। অধুনা এ জাতি নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িয়াছে—ভুল করিবারও অধিকার ইহার নাই! যাহার ভুল করিবার অধিকার নাই, সে কখনও অগ্রসর হইতে পারে না। পার্লামেণ্টের কমন্স সভার ইতিহাস শত শত ভুল-চালের ইতিবৃত্তে পরিপূর্ণ। একটী আরবী প্রবাদ-বাক্যের মর্ম্ম এই যে, মানব ভ্রমের প্রতিমূর্ত্তি। ভুল করিবার স্বাধীনতা ও তাহা সংশোধনের অধিকার লইয়াই ত স্বরাজ। পার্লামেণ্ট এই স্বরাজের উদ্ভবক্ষেত্র। তাই আজ আমরা পার্লামেণ্ট চাহিতেছি—আজ আমরা

উহা লাভ করিবার উপযুক্ত হইয়াছি। সুতরাং আমরা উহা চাহিলেই পাইব।

এখন 'আজ' কথাটার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ আমাদিগকেই করিতে হইবে। বৃটিশ সাধারণতন্ত্রের নিকট আবেদন করিলে স্বরাজ লাভ হইবে না; কারণ আমাদের আবেদন ইংরাজ জাতির মর্ম্ম স্পর্শ করিবে না। তাঁহারা বলিবেন,—"আমরা স্বরাজ লাভের জন্য বাহিরের কাহারও সাহায্যপ্রার্থী কখনও হই নাই। নিজেদের যোগ্যতা বলে আমরা উহা লাভ করিয়াছি। আপনারা অযোগ্য বলিয়াই উহা লাভ করিতে পারেন নাই। আপনারা যোগ্য হইলে কেহ আপনাদিগকে স্বরাজে বঞ্চিত রাখিতে পারিবে না।" তবে আমরা কিরূপে স্বরাজ লাভের উপযুক্ত হইব? আমাদিগকে জনসাধারণের নিকট হইতে স্বরাজ চাহিতে হইবে। জনসাধারণের নিকট আমাদের আবেদন দাখিল করিতে হইবে। এদেশের কৃষকেরা যখন বুঝিবে যে স্বরাজ কি, তখন সে দাবী চাপিয়া রাখা চলিবে না। পরলোকগত স্যার উইলিয়ম হাণ্টার বলিয়াছেন যে, বৃটিশ শাসনে যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করাই সাফল্য লাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা। শিক্ষিত ভারতীয়গণ যদি বর্ত্তমান যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমাদের শেষ লক্ষ্য এতদিনে পূরণ হইতই; অধিকন্তু যে ভাবে তাহা মঞ্জুর হইত তাহা অতুলনীয়! আমরা এ কথা প্রায়ই বলি যে, হিন্দুস্থানের বহু সিপাহী ফ্রান্স ও মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। ঐজন্য এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এতটুকু সুখ্যাতি দাবী করিতে পারেন না। সিপাহীরা ত স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যায় নাই। স্বরাজ কি, তাহারা জানে না। যুদ্ধাবসানে তাহারা স্বরাজ-প্রার্থী হইবে না। তাহারা নিমকের মান রাখিবার জন্য যুদ্ধে গিয়াছে। সুতরাং স্বরাজ চাহিবার সময় আমরা সিপাহীদের কর্ম্ম-

কুশলতার কথা উথাপন করিতে পারি না। কিন্তু এইটুকু বলিতে পারি যে, যুদ্ধক্ষেত্রে অসি-সঞ্চালনে অক্ষমতার অপরাধ আমাদের ইচ্ছাকৃত নহে।

যুদ্ধের হাঙ্গামার সময় আমরা রাজভক্ত ছিলাম, ইহাও স্বরাজ লাভের উপযুক্ততার পরিচায়ক নহে। রাজভক্তি একটা যোগ্যতা নয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নাগরিক পদবাচ্য হইতে হইলে রাজভক্ত হওয়া দরকার। রাজভক্তি গুণে স্বরাজ মিলিবে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। আমরা এখন নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে স্বরাজ চাহিতেছি, এবং এদেশে আমলাতন্ত্র সদুদ্দেশ্যে কাজ করিলেও তাঁহাদের যুগ যে কাটিয়া গিয়াছে, এই বিশ্বাস লাভ করিয়াছি—ইহাতেই আমাদের যোগ্যতা প্রতিপন্ন হইবে। এইরূপ যোগ্যতাই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট। স্বরাজ ব্যতীত ভারতে আপাতত শান্তি স্থাপনের আশা বৃথা। কিন্তু স্বরাজ লাভের জন্য আমরা যদি শুধু সভা-সমিতি আর বক্তৃতা করি, তাহা হইলে জাতির অপচয় ঘটিবে। সভা-সমিতি ও বক্তৃতার স্থান এবং কাল স্বতন্ত্র। উহার ফলে কোন জাতি গঠিত হয় না।

স্বরাজ লাভে উদ্বুদ্ধ জাতির সকল বিভাগে জাগরণের সাড়া পরিস্ফুট হইবেই। সর্ব্ব প্রথমে ব্যক্তিগত জীবনে উহার স্ফুরণ অবশ্যম্ভাবী। 'একের পক্ষে যা' বিশ্বের পক্ষেও তা'—এই মহাসত্য সর্ব্বত্র প্রযোজ্য। আমরা যদি আত্মকলহে ছিন্ন ভিন্ন হই—বরাবরই বিপথে চলিতে থাকি—নিজেদের প্রবৃত্তি দমন না করিয়া তাহার বশে পরিচালিত হই, তাহা হইলে স্বরাজ আমাদের নিকট নিরর্থক হইবে। স্বরাজ বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষা আত্ম-শাসন।

তাহার পর পরিবার-পরিজনের কথা। আমাদের সংসারে যদি পরস্পরের মতৈক্য না থাকে—ভাইয়ে ভাইয়ে যদি লাঠালাঠি চলে—গৃহ-বিবাদের

ফলে একপরিবারভুক্ত সংসার-সঙ্ঘ যদি স্বায়ত্ত-শাসনের সুবিধা ছাড়িয়া পৃথকান্ন হয়—এবং আমরা যদি ঐরূপ সীমাবদ্ধ স্বরাজের অনুপযুক্ত হই, তাহা হইলে বৃহত্তর স্বরাজের উপযুক্ত বলিয়া কিরূপে প্রতিপন্ন হইব ?

অতঃপর জাতির কথা। একই জাতির অন্তর্ভুক্ত লোকেরা যদি পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করে—জাতিসমূহ যদি নিজেদের ঘরোয়া ব্যাপার সুশৃঙ্খলভাবে সমাধান করিতে না পারে—উচ্চতর জাতিরা যদি সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের মুঠার মধ্যে রাখিতে উদ্যত হয়—জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ যদি এমনই স্ব-স্ব প্রধান হইয়া উঠে যে, তাহাদিগকে লইয়া জাতিগত স্বায়ত্ত-শাসন নির্ব্বাহ অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্ত-শাসন চলিবে কিরূপে ?

জাতির পর নাগরিক-জীবনের কথা উল্লেখযোগ্য। আমরা যদি সহরের কাজকর্ম্ম নিজেরা চালাইতে না পারি—রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকে—বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া পড়ে—রাজপথ বাঁকাচোরা হয়—সহরের-কার্য্য-প্রণালী পরিচালনের নিমিত্ত কোন স্বার্থত্যাগী নাগরিকের সহায়তা না পাই—পরন্তু যাঁহাদের হাতে ঐ ভার ন্যস্ত রহিয়াছে তাঁহারা যদি স্বার্থপর বা অমনোযোগী হন, তাহা হইলে অধিকতর ক্ষমতা লাভের দাবী আমরা কিরূপে করিতে পারি ? সহরের কাজকর্ম্ম পরিচালনে যোগ্যতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয় জীবন গঠিত হইবে। অতএব এ বিষয়ে আরও কিছু বলা প্রয়োজন।

প্লেগ ভারতে মৌরসি-পাট্টা লইয়াছে। কলেরার ত কথাই নাই। ম্যালেরিয়ায় হাজার হাজার ভারতবাসী প্রতিবর্ষে প্রাণত্যাগ করিতেছে। ওদিকে পৃথিবীর অন্যান্য স্থান হইতে প্লেগ একেবারে বিদূরিত হইয়াছে। গ্লাসগো সহরে প্লেগ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে উহা বিতাড়িত হয়। জোহানেস্-বার্গে একবার মাত্র প্লেগ দেখা দিয়াছিল। তত্রত্য মিউনিসিপালিটীর

কর্ত্তারা প্রভৃত চেষ্টায় এক মাসের মধ্যে ঐ রোগ নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। এখানে কিন্তু আমরা কিছুতেই প্লেগ নিবারণ করিতে পারিতেছি না। এজন্য গভরমেণ্টকে দোষ দেওয়া চলে না। আমাদের দারিদ্র্যও ইহার হেতু নহে। প্লেগের প্রতিষেধকল্পে আমরা যে কোন উপায়ই অবলম্বন করি না কেন, তাহাতে কেহ বাধা দিবে না। আমেদাবাদের অধিবাসিগণ দারিদ্র্যের অজুহাতে কর্ত্তব্যের দায় হইতে রেহাই পাইবেন না। আমার ধারণা, প্লেগ সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্বই আমাদের উপর বর্ত্তিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্লেগের প্রকোপে যখন পল্লীগ্রামসমূহ উৎসন্ন যাইতেছিল, সে সময়ে গোরা-বারিকে একজনও প্লেগাক্রান্ত হয় নাই। ইহার হেতু সুপ্রত্যক্ষ। গোরা-বারিকের বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধ, গৃহাবলী ঘন সন্নিবিষ্ট নহে, রাজপথ প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন এবং অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য-নীতি সংক্রান্ত অভ্যাস অতি উত্তম। পক্ষান্তরে আমাদের আব্‌হাওয়া, ঘরবাড়ী, রাজ-পথ প্রভৃতি নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। আমাদের পায়খানাগুলি অত্যন্ত জঘন্য ও অপরিষ্কার। এদেশে শতকরা ৯০ জন লোক পাদুকা ব্যবহার করে না। তাহারা যেখানে-সেখানে থুথু ফেলে—যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে; কাজেই ঐরূপ ময়লা' পথে যাতায়াত করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং প্লেগ যে এদেশে বাসা লইয়াছে, ইহা আদৌ বিস্ময়ের বিষয় নহে।

আমরা যদি সহরের অবস্থা পরিবর্ত্তন না করি—অপরিচ্ছন্নতার অভ্যাস ছাড়িয়া না দিই—এবং নিজেদের মধ্যে জাতি-সংস্কারে প্রবৃত্ত না হই, তাহা হইলে শুধু স্বরাজ লাভ করিয়া আমাদের কোন উপকার হইবে না।

এখানে তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতি সম্বন্ধে কিছু বলিলে, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সমাজের অন্তর্ভুক্ত এক শ্রেণীর হিতৈষী লোককে অস্পৃশ্য

বলিয়া ঘৃণা করার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, আমরা তাহাদিগকে শৌচাগারের একটা অংশ মাত্র পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত রাখিয়াছি। উহার বাকী অংশটী ধর্ম্মের অজুহাতে নিজেরাও পরিষ্কার করি না—পরিষ্কার করিলে পাছে অপবিত্র হই! সুতরাং ব্যক্তিগত পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত আমরা স্ব স্ব আবাস গৃহের একটী অংশ, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ময়লা করিয়া রাখি। ইহার ফলে রোগাণু পরিপ্লুত বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আমরা পরিবর্দ্ধিত হই। যতদিন পল্লীঅঞ্চলে বাস করিতাম, ততদিন নিরাপদ ছিলাম; কিন্তু সহরে আসিয়া নিজেদের অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস বশে নিয়ত আত্মহত্যা করিতেছি।

যেখানে বহু লোকের অকাল মৃত্যু ঘটে, সেখানকার অধিবাসিগণ খুব সম্ভবতঃ ধর্ম্মভ্রষ্ট—আচারভ্রষ্ট। এদেশ হইতে প্লেগ দূর করা, আমাদের সাধ্যাতীত না হওয়াই উচিত—ইহাই আমার ধারণা। ঐ কার্য্যে সক্ষম হইলে আমাদের পক্ষে স্বরাজ লাভের যে যোগ্যতা বাড়িত, তাহা অতিবড় আন্দোলনেও পূরণ হইবে না। এ বিষয়টি ডাক্তার-বৈদ্যদের বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

ভগবান্ ডাকোরজীর মন্দির আমাদের বাড়ীর পার্শ্বেই অবস্থিত। ঐ তীর্থ আমি পরিদর্শন করিয়াছি। তথায় অবিশুদ্ধতার অন্ত নাই। আমি নিজে একজন একনিষ্ঠ বৈষ্ণব। সুতরাং ডাকোরজী মন্দিরের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার অধিকার আমার আছে। ঐ স্থানটী এতই অস্বাস্থ্যকর যে, স্বাস্থ্যকর স্থানে যাঁহারা চলাফেরা করেন তাঁহাদের পক্ষে তথায় চব্বিশ ঘণ্টা কাটাইবার কষ্ট অসহনীয়! তীর্থযাত্রিগণকে পথ ও পুষ্করিণী যথেচ্ছ অপরিষ্কার করিতে দেওয়া হয়। মন্দিরের পাণ্ডারা পরস্পর বিবাদনিরত। কাজেই ডাকোরজীর অলঙ্কারাদি বহুমূল্য বেশভূষা রক্ষার জন্য একজন রিসিভার নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহা যেমন ক্ষতিকর তেমনই অপমানজনক।

এ দোষ আমাদিগকে শুধরাইতেই হইবে। আমরা যদি নিজের ঘর সাফ্ রাখিতে না পারি, তাহা হইলে স্বরাজ চাহিব কিরূপে?

সহরে শিক্ষার অবস্থা দেখিয়াও হতাশ হইতে হয়। বে-সরকারী চেষ্টায় জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা গভরমেণ্টের দিকে তাকাইয়া আছি; এদিকে আমাদের ছেলেপুলেরা শিক্ষাভাবে শুকাইয়া মরিতেছে।

সহরে মদ্যপান দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। চা'র দোকান গলিতে গলিতে দেখা দিতেছে। নানা স্থানে জুয়াখেলার আড্ডা বসিতেছে! এই সকল কুপ্রথা যদি আমরা দমন করিতে না পারি, তাহা হইলে স্বরাজ পাইব কিরূপে? স্বরাজের অর্থ ত আত্মশাসন। দিনকাল এমন পড়িয়াছে যে, দুধ মিলা দুষ্কর। গুজরাটে গোশালাগুলি আমাদের যথেষ্ট অপকার করিতেছে। তাহারা প্রায় সমস্ত দুধ বাজার হইতে ক্রয় করিয়া তজ্জাত মাখম, পনীর প্রভৃতি বিদেশে বিক্রয় করে। যে জাতির দুধই একমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য, তাহারা ইহা সহ্য করিবে কিরূপে? জাতির স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করিয়া শুধু অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত উল্লিখিত উপায়ে দুধের অপব্যবহার করা কি ভাল? দুধ ও তজ্জাত খাদ্যচয় আমাদের পক্ষে এমনই অপরিহার্য্য যে, তাহার ক্রয়-বিক্রয়ের উপর স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সে পক্ষে আমরা কি করিতেছি?

সম্প্রতি এক বকরিদ্ হাঙ্গামার ঘটনাস্থলে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, অতি তুচ্ছ কারণে হিন্দু মুসলমানে বিবাদ বাধিয়াছে। দুষ্ট লোকে সেই সুবিধায় আগুন জ্বালাইতে ক্রটী করে নাই। ফলে, আমরা নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িলাম। শেষে গভরমেণ্টের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্য-

স্তর দেখিলাম না। এই ঘটনায় আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, দেশের প্রকৃত অবস্থা কি!

প্রাগুক্ত সমস্যাসমূহের মধ্যে অধিকাংশই মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষের আয়ত্তাধীন। সুতরাং বলিতে পারি যে, সহরের কার্য্যপ্রণালী পরিচালন করিতে পারিলে, তবে আমরা জাতীয় গভরমেণ্ট লাভে অধিকারী হইব।

একথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, স্বদেশী-আন্দোলন এখনও অজ্ঞান অবস্থায় নিপতিত। স্বরাজ যে স্বদেশীর ভিতর দিয়াই প্রায় সম্পূর্ণরূপে লাভ করা যাইবে, ইহা আমরা আজও অনুভব করি না। আমরা যদি মাতৃভাষার প্রতি আস্থাবান না হই—নিজেদের কাপড়-চোপড় অপছন্দ করি—জাতীয় পরিচ্ছদে বীতশ্রদ্ধ হই—সুপবিত্র শিখা ধারণে লজ্জাবোধ করি—এবং মনে করি যে, আমাদের দেশীয় খাদ্য তেমন রুচিকর নহে, স্বদেশের জল-হাওয়া স্বাস্থ্যপ্রদ নহে, স্বদেশবাসী জনসাধারণ অসভ্য ও মিলামিশার অনুপযুক্ত, আমাদের সভ্যতা দোষান্বিত এবং বৈদেশিক সভ্যতা চিত্তাকর্ষক—মোটের উপর দেশের সকল জিনিষই মন্দ আর বিদেশের সব জিনিষই ভাল—এই ভাব যদি হৃদয়ে জাগে, তাহা হইলে স্বরাজ বলিতে আমরা কি বুঝিব, বলিতে পারি না। বিদেশের সকল জিনিষ যদি গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে বিদেশীর শিক্ষাধীনে বহুদিন থাকিতে হইবে; কারণ জনসাধারণের মধ্যে বৈদেশিক সভ্যতা এখনও প্রবেশ করে নাই। আমার মতে স্বরাজের মর্ম্ম অনুধাবনের পূর্ব্বে আমাদিগকে স্বদেশের প্রতি মমতা—শুধু মমতা নহে—আগ্রহ পোষণ করিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেক কার্য্যে স্বদেশীর ছাপ থাকা চাই। যাহা জাতীয় পদবাচ্য তাহার অধিকাংশই দোষহীন, এইরূপ সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে, তবে তাহার উপর স্বরাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এই অভিমত অভ্রান্ত হইলে স্বদেশী আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে

চালান উচিত। যে কোন দেশ স্বরাজ-আন্দোলন চালাইয়াছে, তাহারাই স্বদেশীর মর্ম্ম অগ্রে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে।

স্কচ্ হাইল্যাণ্ডারেরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও ফতুয়া ব্যবহার বজায় রাখিয়াছে। আমরা তাহাদিগকে রহস্য করিয়া 'ফতুয়া পল্টন' বলি। কিন্তু তাহাদের ফতুয়ার পশ্চাতে যে এক বিরাট শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহা সারা পৃথিবী স্বীকার করে। ঐরূপ ফতুয়া পরিধান করা অসুবিধাজনক এবং উহা শত্রুর পক্ষে বন্দুকের লক্ষ্য নির্দ্দেশে সহায়ক জানিয়াও স্কটল্যাণ্ডবাসী হাইল্যাণ্ডারেরা উহা ত্যাগ করে নাই।

উল্লিখিত যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা আমি একথা বলিতেছি না যে, আমাদের দোষগুলি সব বজায় রাখিতেই হইবে। তবে যাহা জাতীয় পদবাচ্য তাহা একটু-আধটু অসুবিধাজনক হইলেও বর্জ্জন করা বাঞ্ছনীয় নহে—বিদেশী জিনিষ তদপেক্ষা মনোরম হইলেও পরিত্যজ্য। আমাদের যাহা ত্রুটী, তাহা নিজেদের চেষ্টা দ্বারা পূরণ করিতে হইবে। আশা করি, এই সভার প্রত্যেক সদস্য স্বদেশীভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন এবং বহুল বিপদ ও অসুবিধা সহ্য করিয়াও স্বদেশীব্রত পালনে অবহিত হইবেন। তাহা হইলে স্বরাজ সহজে আয়ত্ত হইবে।

সমাপ্ত।

এই পুস্তক সম্বন্ধে—

সংবাদ-পত্রের অভিমত।

"This is a nice Bengali treatise on the life and teachings of Mr. M. K. Gandhi whose personality does require no introduction. The book under review is couched in a chaste flowing language and reflects great credit on the compiler, Babu Joges Ch. Mukerjee."

The A. B. Patrika—4th Nov. 1918.

"The author has succeeded in his self-imposed task in delineating the noble character of his hero in simple but vigorous and chaste Bengali and holds up to his readers' eyes the example of a great soul working in favour of his country's good. The work itself is comparatively small as regards its volume, but so far as its merit is concerned it is worth its weight in gold."

The Telegraph—16th Nov. 1918.

"The skilful manner of presentation rivets the interest of the reader throughout and the history of the struggle of the Indian settlers in South Africa led by Mr. Gandhi reads like a chapter of romance."

The Bengalee—17th Nov. 1918.

"শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু এই মহাত্মার জীবন-কথা বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, আমাদিগকেও ধন্য করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর অতুলনীয় জীবন-কথা ঘরে ঘরে পঠিত হওয়া উচিত; প্রত্যেক বালক, প্রত্যেক যুবকের হস্তে এই পুস্তক আমরা দেখিতে চাই।"

ভারতবর্ষ—মাঘ, ১৩২৫।

মহাত্মা গান্ধী।

"ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে ছাড়া যায় না, একটার পর একটা ঘটনা রোমাঞ্চকর sensational উপন্যাসের মতন মনে হয়। এই জীবনী পাঠে মনে বল সঞ্চার হয়, ভীরু ব্যক্তি সাহস পায়, অন্যায় অবিচার অত্যাচার প্রতিরোধ করিবার মহদ্‌দৃষ্টান্তে চিত্ত অশান্বিত হইয়া উঠে। এই পুণ্য অবদান প্রত্যেক নরনারী আবাল বৃদ্ধ সকলের বারংবার পাঠ করিয়া অন্তরকে ঐ ভাবে ভাবিত করিয়া তোলা উচিত।"

প্রবাসী—অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

"মহাত্মা গান্ধীর অমিত তেজ, অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ, অলৌকিক নিঃস্বার্থ পরার্থপরতা এবং দৃঢ় ও অটল সত্যনিষ্ঠা কিরূপ তাহা গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই পাঠকগণ হৃদয়ঙ্গম করিবেন। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা নীরব কর্ম্মবীর মহাপ্রাণ গান্ধীর জীবন-চরিত পাঠ করিয়া আমরা একান্তই মুগ্ধ ও উপকৃত হইয়াছি। এই পবিত্র জীবন-কাহিনী প্রত্যেক নরনারীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করা উচিত।"

মানসী ও মর্ম্মবাণী—পৌষ, ১৩২৫।

"মহাত্মা গান্ধী এদেশের আদর্শ পুরুষ। এরূপ নিষ্কাম যোগী, নীরব দেশ-নায়ক এদেশে দ্বিতীয় আছে কি না, জানি না। গ্রন্থকার এই মহাপুরুষের জীবনাদর্শ বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিয়া অতি মহৎ কার্য্য করিয়াছেন। জীবিতকালে কাহারও জীবন-চরিত প্রকাশ করিতে হয়, আমরা তাহা ভাল মনে করি না; কিন্তু এই সাধক সে নিয়মের অতীত। যখন কথার প্রচার এদেশে খুব হইতেছে এবং প্রকৃত চরিত্র এবং কাজ ডুবিয়া যাইতেছে, তখন এহেন আদর্শ লোকের সজীব কথা এদেশে নবযুগ আনয়ন করিতে পারে বলিয়া গান্ধীর জীবন-কাহিনী প্রচারের আমরা পক্ষপাতী।"

নব্য ভারত—মাঘ, ১৩২৫।

সংবাদ-পত্রের অভিমত

"গ্রন্থের ভাষা পাকা হাতের লেখা ও প্রাঞ্জল। জীবন-চরিত রচনায় যে উপাদান ও শক্তি আবশ্যক, লেখকের তাহা যথেষ্ট আছে। এই স্বনামধন্য মহাত্মার জীবন-কাহিনী ও উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।"

অর্চ্চনা—ফাল্গুন, ১৩২৫।

"গ্রন্থখানি এমনই উপভোগ্য হইয়াছে যে, উপন্যাস ফেলিয়া পড়িতে ইচ্ছা হয়। গ্রন্থের পাতায় পাতায় গান্ধীর অসাধারণ মহত্ত্বের মহিমাময় ছবি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে গান্ধীর বহু বাণীও সংগৃহীত হইয়াছে। সেগুলির মূল্য মণি-মাণিক্যের চেয়েও বেশী। বাণীগুলি স্বতন্ত্র কার্ডে লিখিয়া ঘরে দুয়ারে ছবির মত ঝুলাইয়া রাখিবার যোগ্য! এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজ করুক। বাঙ্গালীর ছেলেরা এ গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠা মুখস্থ করিয়া মজ্জাগত করিয়া ফেলুক। গান্ধীর গুণের সুবাসে তাহাদের নব মুকুলিত চিত্ত আমোদিত হোক, পরিপূর্ণ হোক—ইহার চেয়ে বড় কামনা এ যুগে বাঙ্গালীর আর থাকিতে পারে না। এই সদ্‌গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থকার দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন—নিঃস্বার্থ মনুষ্যত্বের ছবি আঁকিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমলঙ্কৃত করিয়াছেন; তিনি আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন।"

ভারতী—চৈত্র, ১৩২৫।

"মহাত্মা গান্ধীর জীবনী হইতে বহু শিক্ষা লাভ করা যায়। এমন স্বদেশপ্রাণ, করুণহৃদয়, ন্যায়পরায়ণ, নিঃস্বার্থ বন্ধুর কার্য্য ও জীবনী পাঠ করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। পুস্তকের ভাব সুন্দর, ভাষা প্রাঞ্জল, ছাপাও পরিষ্কার।"

মোসলেম হিতৈষী—১৬ই ফাল্গুন, ১৩২৫।

মহাত্মা গান্ধী

"মহাত্মা গান্ধী পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। লেখক অল্প পরিসরে মহাত্মা গান্ধীর জীবনের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন, তাঁহার কর্ম্মযোগের পরিচয় দিয়াছেন। আশাকরি এ গ্রন্থ সমাদর লাভ করিবে।"

বসুমতী—৬ই পৌষ, ১৩২৫।

"মহাত্মা গান্ধী এক অসাধারণ পুরুষ। তাঁহার জীবন অপূর্ব্ব পুণ্যময়। যোগেশবাবু আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। তিনি বাঙ্গালীদের নিকট এই অদ্ভুত কর্ম্মীপুরুষের জীবনালেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন। এই পুস্তক যে পাঠ করিবে, সেই উদারহৃদয় ও বিশ্বপ্রেমিক, আত্মত্যাগী ও মহাসংযমী হইবার প্রলোভন এড়াইতে পারিবে না।"

সঞ্জীবনী—২রা মাঘ ১৩২৫।

"যোগেশবাবু এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া দেশবাসীর বিশেষতঃ বাঙ্গালী পাঠকের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। যাঁহারা জন্মভূমির সেবা করিতে চাহেন, অথচ কি করিলে যে জন্মভূমির প্রকৃত সেবা করা হয় তাহা স্থির করিতে পারেন না, তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর জীবনী পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।"

হিতবাদী—২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

"ভাষার দীপ্তরাগে, বর্ণনার কলাকৌশলে গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে গান্ধীর অদ্ভুত চরিত্র-মাহাত্ম্যের ও দেশাত্মবোধের একখানি নিখুঁত চিত্র পূর্ণভাবে চিত্তপটে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গ্রন্থকার গান্ধীর জন্মকথা হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত তাঁহার কৃত কার্য্যাবলীর যে ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার লিপি-নিপুণতার পরিচয় পদে পদে প্রতিভাত। পড়িতে পড়িতে উৎসাহে আগ্রহে সঙ্গে সঙ্গে আদর্শানুকরণের একটা প্রবৃত্তি ফুটিয়া উঠে।"

বঙ্গবাসী—২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।